নিষিদ্ধ পত্র

প্রবীর মাশচরক

: পরিবেশক :

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

॥ প্রকাশক ॥
সরোজিনী গ্রন্থাগারের পক্ষে
শোভনা দেবী মাশ্চরক
২২০, নেতাজী কলোনী
কলিকাতা-৯০

॥ প্রকাশ কাল ॥
অগ্রহায়ণ, ১৩৬৯

॥ প্রচ্ছদ ॥
পরিকল্পনা ঃ লেখক
অলংকরণ ঃ দেবদত্ত নন্দী

॥ মুদ্রক ॥
বি. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

বাঙলা সাহিত্য
পাঠক-পাঠিকাদের
হাতে দিলুম

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা নং	কত লাইনে (উপর থেকে নীচের দিকে)	কত নং শব্দ শব্দ নং	কী হয়েছে ? (ভুল)	কি হতো ! (শুদ্ধ)
৪	২৮ লা	শেষ শব্দ	সুখের	মুখের
৫	১৪ লা	শেষ দিকে	কি	কী
১১	২৬ লা	নবম	বরে	করে
১৫	১৭ লা	শেষ শব্দ	ঘৃনাক্ষরে	ঘুণাক্ষরে
১৬	৫ লা	৭ম	ভ্যারী	ভারী
২৮	১১ লা	৫ম	গাছের	গঙ্গার
৩০	৯ লা	৩য়	বিনুদি	চিনুদি
৩০	৩১ লা	৯ম	”	”
৩১	১৩ লা	৯ম	”	”
৩২	৪ লা	১২শ	”	”
৩২	৫ লা	৮ম	”	”
৩৬	৮ লা	৪র্থ	সিড়ি	সিঁড়ি
৩৬	৯ লা	৬ষ্ঠ	সন্দে	সন্ধে
৩৭	২ লা	৫ম	”	”
৩৭	২০ লা	৩য়	পত্রিকা	পৈতৃক
৩৭	৩১ লা	২য়	তিনটেয়	তিনটে
৪০	২৫ লা	২য়	ভেবেছিলাম	জেনেছিলাম
৪০	২৭ লা	২য়	বরন	বরণ
৪১	৫ লা	১০ম	হবেন	হলো
৪১	১৮ লা	১২শ	(কিছু নাই)	জন্য’
৪২	৯ লা	৫ম	ছিলাম	তাড়িয়েছিলো
৪৩	৪ লা	২য়	বরন	বরণ
৪৩	১০ম লা	৪র্থ	বরন	বরণ
৪৫	১৫শ লা	৩য়	আকাল	আকাশ
৪৫	৯ লা	৪র্থ	পাহার	পাহাড়
৪৬	১৭ লা	৩য়	তার	তাঁর
৪৮	৫ লা	৪র্থ	বিবাহিত	বিবাহিতা
৪৮	৬ লা	৭ম	ধর্বাত্র	ধরিত্রী
৯০	২১ লা	শেষ শব্দ	হয়তো	হাতের
৯৩	১৮ লা	২য়	মৌল	মৌন
৯৫	২৩ লা	শেষ শব্দ	মুখস্মৃতি	সুখস্মৃতি
৭৮	৩৪ নং	১ নং		যাব
১০৩	২ লা	শেষ শব্দ	কাটা	কাটাকাটি
১০৯	১১ লা	৭ম	না	নয়
১৩৬	৩১ লা	৩য় শব্দ	থেকে	ঢেকে
১৩৯	১১ নং	৭ নং		নয়

[লেখিকার নিষেধ ছিল যে, তিনি কিংবা তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর পূর্বে এই চিঠিখানি যেন প্রকাশ করা না হয়, আমরা তাঁহার নিষেধ অমান্য করি নাই এই জন্য যে, তিনি কিংবা তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর পূর্বে উহা প্রকাশ করিলে এক বেদনাদায়ক ঘটনার জন্য আমরাই দায়ী হইতাম। এই প্রসঙ্গে আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাইতেছি যে, পত্র লেখিকা আর ইহজগতে নাই। একজন নবাগতা লেখিকার—যাঁহার লেখা ইতিমধ্যেই খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল—তাঁহার শেষ লেখাটি—যাহা পত্রাকারে আমাদের কাছে একশত নব্বই দিন মজুত ছিল, তাহা প্রকাশ করার লোভ সামলাইতে না পারিয়া তাঁহার প্রিয় পাঠক-পাঠিকাদের কাছে উপহার দিলাম। — সম্পাদক।]

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

আপনার সব ক'খানা চিঠি পেয়েছি। আপনি লিখেছেন যে, কাগজে আর লেখা পাঠাচ্ছি না কেন? ভেবেছিলাম, জবাব দেব না। কিন্তু আপনার তাগাদায় আর নীরব থাকা গেল না। ইচ্ছে হয়েছিল সোজা জবাব দিয়ে দিই, আমার লেখার আর 'স্টক' নেই। বা আমি আর লিখি না। কিন্তু মিথ্যে কথাটা বলতে যেমন বাধছিল, তেমনি আপনার সঙ্গে আর কাগজের মাধ্যমে আমার প্রিয় পাঠক-পাঠিকাদের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা চুকিয়ে দেবার পূর্বে এই লেখার মাধ্যমে তাঁদের কয়েকটা কথা বলে যেতে চাই! এমন ইচ্ছাও ছিল—কথাগুলো এই জন্যই বলে যেতে চাই যে, ভবিষ্যতে কেউ যেন আর আমার মতো মারাত্মক ভুল না করেন। অবশ্যই প্রসঙ্গত আপনাকে এই অনুরোধ করব যে, আমি কিংবা আমার স্বামীর মৃত্যুর পূর্বে যেন ইহা প্রকাশ করা না হয়!

আমার বয়স যখন ষোল, তখনই তাড়াহুড়ো ক'রে আমার বিয়ে দেওয়া হয়। পাড়াগাঁয়ে মা-বাবার কঠোর বিধি-নিষেধের মধ্যেই এই ষোলটি বছর কাটিয়েছি। এই ষোল বছরের জীবন বলতে গেলে, নির্বোধের জীবনই ছিল। যে চেতনা ষোল বছরের যৌবনকে দীপ্ত করে তোলে, ভোগ ও কামনার নেশায় উদ্বেল হয়ে ওঠে আমার মধ্যে তা বিন্দুমাত্রও ছিল না। আমি নাকি আমার ভাইবোনদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী ছিলাম। শুধু তাই নয়, আমার গড়ন ছিল বাড়ন্ত, কাজেই আমাকে নিয়ে মা-বাবার উদ্বেগের সীমা ছিল না। ওঁরা আমাকে সব সময় চোখে চোখে রাখতেন। আমোদ-প্রমোদ দূরে থাক, স্কুল পর্যন্ত যেতে দিতেন না।

বাড়িতে মাঝে মাঝে লেখাপড়া করতুম। বর্ণবোধ, সহজপাঠ আমার কবেই শেখা হয়েছিল। আর ঠাকুমার কাছে গল্প শুনতে শুনতে একসময় পরী আর রাজকুমারদের দেশে চলে যেতাম। সারাদিন ঘর-সংসারের কাজ করে রাতের বেলায় ঠাকুমার বুকের উপরে মাথা রেখে গল্প শোনা এই ছিল আমার প্রাত্যহিক জীবনের

রুটিন। ছেলেদের সংস্পর্শে আসবার কোন সুযোগই ছিল না আমাদের সংসারে। সমবয়সীদের সাথে আড্ডা দেওয়া, গল্প বলা দূরে থাক, গল্পের বই পড়া ছিল নিষিদ্ধ। এই কঠোরতার জন্য কোন অস্বস্তি লাগত না; কারণ মানুষের জীবনে যে আরো স্বাদ-আহ্লাদ আছে তখন সেই অনুভূতিও ছিল না বোধ হয়।

চৌদ্দ বছর বয়স থেকে একটা অহেতুক লজ্জা আর পুরুষ সম্বন্ধে একটা অজানা ভয় ও কৌতুকও যে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ছিল। তবু ফাগুন চৈত্রের হাওয়া লেগে মনটা যেন কেমন উদাস হয়ে যেত। আমি যেন কোথাও হারিয়ে যেতাম। কী যেন পাওয়ার জন্য একটা অজ্ঞাত আকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যে অস্পষ্ট হয়ে ঘুরে বেড়াত। দৈনন্দিন কাজকর্ম কোন কিছুই ভালো লাগত না। মনের এই অস্পষ্টতা যেন নতুন কিছুকে খুঁজত। গাছ, লতা-পাতা, জল, আকাশ, জ্যোৎস্নারাত, রাতের অন্ধকার, পাখিদের ডানামেলা—উড়ন্ত জীবন যেন আমাকে টেনে টেনে নিয়ে যেত কোন অজানা রাজ্যে।

বাবা গরীব ছিলেন। সেইজন্য তিনি হয়তো আমাকে ভাল জামা-কাপড় প্রসাধনী জিনিসপত্র কিনে দিতে পারতেন না। কিন্তু তারজন্য আমার মনে ক্ষোভ ছিল না।

এমনি এক সময়ে জানতে পারলাম, আমার বিয়ের দিন ধার্য হয়ে গেছে, পাত্র কলকাতায় থাকেন। তিনি নাকি সত্যিই সুপাত্র, কিন্তু আমাদের মতোই গরীব। গরীবের মেয়ে গরীবের সাথে বিয়ে হবে, এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে। কিন্তু আশ্চর্য হবার এইটুকুই আছে তিনি সুপাত্র, শিক্ষিত। তার সঙ্গে আমার মতো একটা নিরেট মূর্খ মেয়ের বিয়ে হবে এটা অবশ্য আমার কাছে কম সৌভাগ্যের কথা নয়। অবশ্য বিয়ের ব্যাপারে আমার মতামতের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

বিয়ে হয়ে গেল। গ্রামে দু'একটা বিয়ে দেখেছি, আমার বিয়েও তেমনি ভাবে হয়ে গেল। বিয়ের রাতে মালা বদলের সময় স্বামীর দিকে লজ্জায় তাকাতে পারলাম না। একটা কানাঘুষা শুনতে পেলাম—এই বয়সেই চুল পেকে ঝরঝরে হয়ে গেছে। যদিও তা সত্যি নয়, দু'চারটেই পেকেছিল, তবে নাক-মুখ, চোখ, গায়ের রঙ খুব খারাপ নয়। মনটা কেমন হয়ে গেল। ঠাকুরমার মুখে শোনা—গল্পের রাজপুত্তুরের সঙ্গে তার কোনই মিল নেই। পরদিন ঠাকুরমার কাছে যেতেই তিনি কেঁদে আছড়ে পড়লেন। আমার বাবার নাম ধরে চিৎকার করে বললেন—'ওরে হতভাগা এ তুই কি করলি রে! আমার সোনার টুকরোকে কোথায় ফেলে দিলি রে' ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি ভয়ে লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ বাদে সম্বিত ফিরে এলে বললাম—'ঠাকুমা তুমি কি করছ? ও ঘর থেকে উনি শুনতে পাবেন যে!' ঠাকুমা থামল, কিন্তু আমার কপালে আগুন জেলে থামল। উনি ও ঘর থেকে সব শুনেছেন।

তারপর স্বামীর ঘর করতে শ্বশুরবাড়ি এলাম। দিনের পর দিন যেতে লাগল। কিন্তু স্বামী কি বস্তু, তার স্বাদ বুঝতে পারলাম না। তিনি সযত্নে নিজেকে দূরে

সরিয়ে রাখলেন। লোকনিন্দার ভয়ে একঘরে শুতেন, কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদাভাবে। কখনো বড়ো একটা কথা বলতেন না। একগ্লাস জলের দরকার হলে নিজেই নিয়ে নিতেন। তাঁর কোন প্রয়োজনেই আমি লাগতে পারছি না, এটা যে নারীর পক্ষে কতটা অগৌরবের সেদিন না বুঝলেও পরে বুঝেছিলাম।

সারাদিন বাইরে কাটিয়ে এগারোটা বারোটায় বাড়ি ফিরতেন তিনি। তারপর শুরু হতো তাঁর লেখাপড়া। ঘরের দরজা খোলাই থাকত। তিনি এসে জামাকাপড় ছেড়ে তাঁর মাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করতেন, আমি খেয়েছি কিনা! তাই শুনে আমি ঘরের মেঝেতে বিছানা পেতে ঘুমিয়ে পড়তাম।

যেদিন জেগে থাকতাম, সেদিনই ঐ কথা শুনতে পেতাম। শুনে আমার ভীষণ কান্না পেত। বালিশে মুখ গুঁজে গোপনে খুব কাঁদতাম। ঢাকা দেওয়া খাবার অমনিই পড়ে থাকত। কোনোদিন চোখের জল মুছে, উঠে, একসাথে খেতে বসলে খেতেন, নইলে অমনি উপোসে রাত কেটে যেত। তাঁর লেখাপড়ার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক ছিল না তাই ভালো লাগত না। কিন্তু ইচ্ছে হত তাঁর কাছে গিয়ে বসি, কথা বলি, কিন্তু সে সাহস আমার ছিল না। অনেকক্ষণ হয়তো কাছে গিয়ে বিছানায় বসে থাকতাম, তিনি ভ্রূক্ষেপও করতেন না। তাঁর যখন শোবার সময় হতো, রাত যখন দুটো আড়াইটা বেজে যেত, যদি তখনও জেগে থাকতাম, বলতেন—'এখনো জেগে বসে আছো কেন? ঘুমিয়ে পড়!' কি মিষ্টি লাগত তাঁর কথা। ইচ্ছে হত বলি তুমি এত রাত জাগো কেন? কিন্তু বলতে পারতাম না।

বিয়ের আগে কারো কারো মুখে শুনেছিলাম পাত্র বিশেষ লেখাপড়া জানেন না, অর্থাৎ এম. এ-বি. এ পাশ নয়। অথচ তিনি শিক্ষিত; তবে খুব ভাল ছেলে। যাকে বলে উদ্যোগী পুরুষ, এইটুকুই ছিল সান্ত্বনা। হিন্দুর ঘরের মেয়ে, স্বামীকে দেবতা জ্ঞান করব—এ শিক্ষাই তো পেয়ে এসেছি, তা তিনি তো আর যা তা নন, সত্যিই দেবতা। তাঁর আচার-আচরণে কোথাও বৈপরীত্যের লক্ষণ আমার চোখে পড়েনি। শাশুড়ী, স্বামী নিয়ে সংসার। শাশুড়ীর আঁচলের ধনের মতো জড়িয়ে থাকতাম বলে স্বামীর অবহেলা বেশী বোধ করতাম না। আমাকে তিনি ভালো না বাসলেও স্নেহ করতেন। কাপড়, তেল, সাবান ইত্যাদি কোন অভাব রাখতেন না তিনি। শুধু কি তাই? মাঝে মাঝে দেখেছি প্রচণ্ড গ্রীষ্মে হয়তো ঘেমে নেয়ে উঠেছি, তিনি হয়তো বাইরে থেকে এসেছেন, ঘামে ভিজে গেছি বলে হাতপাখা দিয়ে বাতাস দিচ্ছেন। যখন জাগতাম, লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে যেতাম। আমি জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাড়াতাড়ি পাখা ফেলে উঠে যেতেন।

কলকাতার উপকণ্ঠে শ্বশুরের ভিটে। সারাদিন কি করতেন, সংসার খরচ ক করে যোগাতেন, কিছুই বুঝতাম না। বাইরে ওনার কিসের আকর্ষণ? কি কাজ? এ সব জানবার কৌতূহলও ছিল না। শুধু একটা কথাই বুঝেছিলাম আমাকে তার প্রয়োজন নেই। দিন যেতে লাগল, ক্রমেই বুঝতে পারলাম, তাঁর সঙ্গে বিয়েটা একেবারেই মানানসই হয়নি। বিয়ের রাত্রে চার চোখের মিলন হলো না। শুভরাত্রির

'দন তিনি কোথায় বাইরে গিয়ে কারফ্যুতে আটকেছেন। জীবনের শুভরাত্রি এমনি করেই ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। আমার ভাগ্য-বিধাতা বিমুখ। নইলে কোনও মেয়ের জীবনে এমন একটা ঘটনা কি ঘটে?

ষোল বছরের পর সতেরোয় পা দিলাম। আমার মনের অজ্ঞাতে মনের মধ্যে বসন্তবাহারের সুর শুনতে পেলাম। উপছে পড়া ঝর্ণার মতো সুর। মন থেকে দেহ থেকে, দেহের সকল সীমান্তে যেন উচ্ছল তরঙ্গের মতো ফুলেফেঁপে উঠল। মনে হলো স্বামী বৃদ্ধ নয়। তার মধ্যে যৌবনের দীপ্তি এখনো ফুরিয়ে যায়নি। তাঁর স্পর্শ পাওয়ার জন্য মনের মধ্যে একটা দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল। কারণে অকারণে তাঁর সান্নিধ্যে যেতে ইচ্ছা হত, কিন্তু তিনি এমনভাবে এড়িয়ে যেতেন যে, তাঁকে দোষ দেবার কিছু ছিল না।

পার্টির ছেলেরা-মেয়েরা আসত, তাদের নিয়ে গল্প করতেন, তারপর বেরিয়ে যেতেন, তাদের সঙ্গে অনেক কথা, অনেক কাজ। কোথাও কুণ্ঠা নেই, জড়তা নেই। আমি শুধু অপাংক্তেয় হয়ে পড়ে রইলাম। তাঁর পার্টি, রাজনীতি কিছুই বুঝতাম না বুঝতে ইচ্ছাও হতো না। তবে তাঁর পার্টি, রাজনীতি না বুঝলেও এটুকু বুঝেছিলাম যে, তিনি ধনিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে কাজ করতেন। কতদিন তাঁকে দলের ছেলেমেয়েদের সামনে শোষণ আর নির্যাতনের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয়ে কথা বলতে শুনেছি।

বিয়ের বছরেই একবার বাপের বাড়ি গিয়েছিলাম, সেখানে কিছুদিন থাকার পর শ্বশুর বাড়ি থেকে নিয়ে যাবার ডাক এলো না দেখে মনটা একেবারে দমে গিয়েছিল। মেয়েরা বাপের বাড়ি গেলে স্বামীর ঘর থেকে যদি ডাক না আসে, তবে তা যে কতবড় অপমানের ঘৃণার কথা, তা আর বলে শেষ করা যায় না। গ্রামময় ছিঃ ছিঃ রটে যায়। গ্রামের মেয়েদের মধ্যে আমি খুব সুন্দরী ছিলাম বলেই হোক, অথবা বাবার প্রতি গ্রামের লোকেদের বিশেষ করে শ্রদ্ধা বা সহানুভূতি ছিল বলেই হোক, আমাকে নিয়ে মেয়ে মহলে কৌতূহল ও আলোচনার অন্ত ছিল না। বাপের বাড়িতে পা দিতেই পাড়ার লোকেরা ভেঙে পড়েছিল, তাদের হাজার জনের হাজার প্রশ্ন। শ্বশুর বাড়ির কে কি দিয়েছে, কি রকম ব্যবহার করেন, ভাল বাসেন কি না, শাশুড়ী-স্বামী কেমন হয়েছে ইত্যাদি আরো কত কি। সকলের প্রশ্নের জবাবে একটা কথাই বলেছিলাম 'আমি যা পেয়েছি, তার তুলনা নাই। কিন্তু দু মাসের মধ্যেও যখন একখানি চিঠিও এলো না তখন আর লজ্জা ও ক্ষোভের সীমা রইল না। বাবা-মায়ের সুখের মধ্যে শংকার ছায়া। আমি বিষণ্ণ মনে ঘরের মধ্যে ঘুর্ ঘুর্ করতাম। একদিন সংসারের কাজে বাবার হাতবাক্স থেকে সংসারের টাকা বার করতে গিয়ে দেখি, এক কোণে একখানি চিঠি। চিঠিখানি স্বামীর হাতের লেখার মতো দেখে কৌতূহল হলো। খুলে পড়লাম। পড়ে মনে একটা সুখ অনুভব করলাম। গভীর স্নেহ আর ভালবাসা দিয়ে আমাকে কল্পনা করেছেন আমার স্বামী, আমার বিয়ের আগেই।

আমার জ্যাঠতুতো ভাইয়ের সঙ্গে ছিল তার বন্ধুত্ব। আমার সেই ভাই-ই এই বিয়ের ঘটকালি করেছিল। তাঁর কাছেই তিনি শুনেছেন আমার গুণের কথা

আর রূপ গুণের কথা শোনার পরই কল্পনা করেছেন আমাকে। সে কল্পনার মধ্যে কামনা ছিল, বাসনা ছিল। ছিল আকাঙ্ক্ষা, ভালবাসা। আমার মতো গেঁয়ো মেয়ের কাছে তিনি সর্বস্বাকে খুঁজে পেয়েছেন ইত্যাদি। কিন্তু কি আশ্চর্য বাস্তবে আমি তাঁর অযোগ্যা। প্রয়োজনীয় নই, অস্পৃশ্যাও বটে। এ যে কতবড় দুঃখ, কতবড় গ্লানি, তা আপনাকে কি করে বোঝাবো? দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে এসেছিল সেদিন। স্বামীর ঘর সম্বন্ধে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তাতে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, তাঁর ভালবাসার মানুষ আমি নই। তিনি আমাকে স্নেহ করেন বালিকা বলে। স্নেহের দান আমি সবই পেয়েছি—অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়— সব!

নারীর প্রতি পুরুষের যে স্বাভাবিক আকর্ষণ—যার প্রকাশ ঘটে আদর-সোহাগ-ভালবাসায়; সতেরো বছরের রূপবতী স্ত্রী হয়েও আমি তা পেলাম না। আমার এ দুঃখের কথা শোনার কেউ ছিল না। আজ আপনাকে যে শোনাচ্ছি, তা করুণা পাবার প্রত্যাশা না রেখেই।

এমনি করেই আরো চার বছর চলে গেল। ইতিমধ্যে স্বর্গতা হয়েছেন শাশুড়ী। লোকে জানে আমরা স্বামী-স্ত্রী। কিন্তু আমরা জানি আমরা কি। চোখের উপর দেখেছি—লোকে বিয়ে করে—তাদের কত আনন্দ; কত হাসে, গান গায়, বেড়ায়, খেলে, সিনেমা দেখে, থিয়েটার দেখে। কলকাতায় যত দেখবার জিনিস আছে নবদম্পতিরা সব ঘুরে ঘুরে দেখে, আমার কপালে এসব কিছুই নেই! সংসারে পাঁচজন নেই যে, তাদের নিয়ে মেতে থাকব! প্রতিবেশীর দুটো মেয়ে আছে তারা আমার কাছে আসে, তাই রক্ষে! নইলে জীবনটা জেলখানার বন্দীর মতো কাটাতে হতো।

শাশুড়ী না থাকায় মধ্যস্থতার কেউ রইল না। রাঁধি বাড়ি, খাই-দাই, তাঁর খাবার ঢাকা দেওয়া থাকে, যখন খুশী আসেন, কোনদিন আমাকে পাশে রেখে ঢাকনা খুলে খেতে বসেন। এমন এক বিচ্ছিন্ন জীবন, যা সইতে পারা যায় না, কোন মতেই। ভগবান আমাকে সইবার ক্ষমতা দিয়েছেন তাই সইতে পেরেছি। বেশ ছিলাম। অনভ্যাসেই হোক, আর বাধ্যতামূলক সংযমেই হোক, স্বামী সম্বন্ধে আর কোন কৌতূহল রইল না। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে আর কোন কৌতূহল নেই, একথা বললে ভুল হবে। নিজের সম্বন্ধে কৌতূহল এতটুকু কমেনি। বরং দিন দিন দেহের কানায় যৌবনের লাবণ্য ভাদ্রের ভরা নদীর মতো যখন টল্‌টল্‌ করছিল তখন মনে মনে আশ্চর্য হয়ে যেতাম। দেওয়ালে তিন ফুট লম্বা আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে কতদিন নিজের বাড়ন্ত লাবণ্যময়ী দেহটাকে দেখেছি। আর কত যে চোখের জল ফেলেছি, তার সীমা-পরিসীমা নেই।

একদিন দুপুরবেলা শ্রাবণের ধারা ঝরে পড়ছে। কোন কাজ নেই। ভাবলাম, বেশ করে ঘুম দেব, বিছানায় শুয়ে রইলাম, ঘুম এলো না কিন্তু! হঠাৎ কি মনে হলো,—অনাবৃত দেহটা নিয়ে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। লিখতে ভীষণ লজ্জা করছে, জানি এ লজ্জা ঢাকবার দায়িত্ব আপনি নেবেন। বাংলা দেশের মেয়েরা এতবড় নির্লজ্জ স্বামীর কাছেও হতে পারে না। যারা একাকী অন্ধকারে উলঙ্গ হতেও লজ্জা

পায়, সেই দেশের মেয়ে আমি একেবারে নির্লজ্জ হয়ে গেলাম। চারিদিকের জানালার পর্দাগুলো ভালো করে টেনে দিয়ে ফিরে এসে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অন্তর্বাসটাও খুলে ফেললাম। মাথার ঢেউ খেলানো কালো চুলগুলো গলার দুপাশ দিয়ে স্তনের বোঁটার উপর দিয়ে দুপাশে ছড়িয়ে দিলাম। আমার রঙ ছিল কাঁচা সোনার মতই, তার উপর কুচকুচে কালো চুলের গোছা দুটো সাপের লেজের মতো দুলছিল। আমি বিস্ময়ে অবাক হয়ে নিজেকে দেখলাম। ভাবলাম, হায়রে, ফুলের মতো প্রস্ফুটিত দেহটা কোন পুজোয় লাগল না। মনের দুঃখটাকে চাপতে গিয়ে ক্ষোভের সীমা রইল না। মনে হলো কেরোসিন ঢেলে দিই আগুন লাগিয়ে। নিজেকে এমনিভাবে দেখার মধ্যে কি কারণ থাকতে পারে জানি না। বোধ হয় দেহের ক্ষুধার তীব্রতা আমাকে পাগল করে তুলেছিল। নির্লজ্জ বেহায়া হয়ে বাইরেটাকেই দেখলাম। অন্তরটা দেখতে চাইলাম না। পুরুষকে প্রলুব্ধ করার সব কিছুই আমার আছে; তবুও কেন দীর্ঘ চার বছর বঞ্চনা করে গেছি নিজেকে?

স্বামী বলে যাকে ব্রাহ্মণ সাক্ষী, অগ্নি সাক্ষী করে বরণ করে নিলাম, তাকে অঞ্জলি দিতে কোথায় আমার কুণ্ঠা, কিছুতেই তা মাথায় এলো না। ছিঃ, ধিক্কার দিলাম মনকে। মাতৃত্বের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা যে আমাকে পেয়ে বসেছিল, তা আমি ঘুনাক্ষরেও জানতে পেলাম না। কেবলই মনে হতে লাগল—এ ক্ষুধা দেহের, মনের নয়। বাদল-ঝরা বেলায় ঘরের দরজা, জানালা, পর্দায় ঢাকা থাকা অবস্থায় আলোয় নিজের দেহের অনাবৃত সমস্তটাই দেখতে পেয়েছিলাম। সুইজ টিপে আলো জেলে দিতেই রাজ্যের লজ্জা এসে জড়িয়ে ধরল। তাড়াতাড়ি কাপড়টা গায়ে জড়িয়ে বিছানায় বসে কাঁদতে লাগলাম। 'দেখতে দেখতে চোখের উপর দিয়ে আরো একটা গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ-হেমন্ত-শীত চলে গেল। জীবনকে আস্বাদ করতে পারলাম না। পুরুষের নিষ্ঠুর উপেক্ষাকে বুক পেতে সহ্য করে গেলাম।

মাঝে মাঝে মনে হতো তাঁর হৃদয়টা বোধহয় পাথর দিয়ে তৈরী। করুণার বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই। অথচ এই মানুষটিই দেশের সকলকে ভালবাসে, সকলের জন্য তাঁর দরদ উথলে পড়ে।

সময়টা ছিল চৈত্রের শেষ সকাল। চা দিতে গিয়ে দেখি তার টেবিলের ফুলদানিটায় একগোছা রজনীগন্ধা। দেখে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলাম। কোনদিন দেখিনি তাঁকে এমন করে ফুলদানিতে ফুল তুলে সাজিয়ে রাখতে। মনে মনে ভাবলাম, যাক, এটাও একটা মন্দের ভালো। মন্দের ভালো যে সত্যি সেদিন রাত্রে সকাল সকাল বাড়ি ফিরলেন। সেদিন যেন তাঁর চিরাচরিত গাম্ভীর্যটা হঠাৎ শিথিল হয়ে গেল। গায়ে পড়ে আমার সঙ্গে বার কয়েক কথা বললেন। কে কে এসেছিল, কে কে আসেনি ইত্যাদি অনাবশ্যক কথা। আমি ভেতরে ভেতরে অবাক না হয়ে পারলাম না। আরো অবাক হলাম, তিনি আমাকে কাছে ডেকে প্রায় কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, 'আজ পূর্ণিমা, ছাতের উপর বিছানা কর। আপনারা বিশ্বাস করবেন না। সেদিন আমার কি আনন্দ। তার স্পর্শে এত তড়িৎ আছে, আগে তা জানতাম না। মনে মনে ভাবলাম, অহল্যার

বোধহয় শাপমোচন হলো! কথাটা বলে তিনি বার কয়েক আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। সে চোখে কি মায়া, কি আকর্ষণ! অন্যদিন গতানুগতিকভাবে কাজ করে যেতাম, আজ যেন সমস্ত কাজই মুহূর্তের মধ্যে হয়ে যাচ্ছে। খাওয়া-দাওয়ার পাট সকাল সকাল চুকে গেল। তিনি তার টেবিলের কাছে বসলেন। আমি বিছানাপত্তর নিয়ে ছাদে বিছানা করতে গিয়ে দেখি, জ্যোৎস্নায় সমস্ত পৃথিবী ভরে গেছে। বিছানা পাততে পাততে একসময় নিজের কথা নিজে মনে করলাম। যদি এই জ্যোৎস্নায় আমিও শুতে পারতাম!……

পরক্ষণেই প্রায় নিজের অজ্ঞাতেই জিভ কাটলাম। ছিঃ, দরিদ্রের কু-আশা ভালো নয়!

ছাদের এককোণে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। নীল আকাশে কয়েকটা তারা ও চাঁদ। বসন্তের মাতাল হাওয়া আমার খোলা চুলগুলো নিয়ে লুকোচুরি খেলছিল। রাত প্রায় দশটা। চারিদিক নিঝুম হয়ে এসেছিল। অকস্মাৎ ধবধবে বিছানাটার ওপর চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম, মনে হল ঐ বিছানাটা আমার জন্যই পেতেছি। স্বামীকে নিয়ে ওটায় আমি এক্ষুণি তো শুতে যাব। ছিঃ ছিঃ, এ আমি কী ভবছি? কী জঘন্য আমার লোভ! ধবধবে সাদা চাদর আর বাঁধ ভাঙা চাঁদের আলো কী জানি আমার নিরাসক্ত মনটাকে আসক্ত করে তুলতে লাগল কেন একথা ভেবে পেলাম না। ইচ্ছে হচ্ছিল ঐখানে গিয়ে একটু শুয়ে থাকি। কিন্তু পরক্ষণেই মনটাকে ঝাঁটা মেরে ফিরিয়ে দিলাম।

সিঁড়ি বেয়ে নীচে চলে আসছিলাম, তিনি উপরে উঠছিলেন, সিঁড়ির মাঝামাঝি তাঁকে একপাশে রেখে থমকে দাঁড়ালাম। ভীত চোখে সেই আলোআঁধারীর মধ্যে ঘোমটার ভিতর থেকে তাঁকে দেখছিলাম। ঐ এক মুহূর্তে তাকে অপরূপ লাগছিল। মনে হচ্ছিল তাঁর সমস্তটাই ভালোবাসা দিয়ে গড়া। কিন্তু একি! হঠাৎ তিনি আমার হাত ধরে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, 'যাচ্ছো কোথায়? উপরে চল আজ ছাদেই শোবে' ব'লে প্রায় টানতে টানতে আমাকে উপরে নিয়ে এলেন। আপনারা বিশ্বাস করবেন না যে তখন আমার বুকের ভিতরটা ধড়াস ধড়াস করছিল। খুব আস্তে আস্তে বললাম, 'ছিঃ, চারিদিক খোলা, পাশের বাড়ির জানালা দিয়ে সব দেখা যায়।'

—'কেউ দেখবে না, সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। আর দেখলেই বা, আমরা তো চুরি ক'রে কিছু করছি না' বলে তিনি হাতটা ছেড়ে দিলেন। আমি নীচের দিকে পা বাড়াতেই তিনি বলে উঠলেন, 'আবার যাচ্ছো কোথায়?' বললাম—

—'আমার বিছানার কিছু আনতে হবে তো।' আমার কথা শুনে তিনি যেন অবাক হয়ে গেলেন—বললেন, 'আর বিছানা দিয়ে কী হবে?'

'জানি না।' বলে ছুটে নীচে চলে আসি। বিয়ের আগে যেমন প্রসাধন ব্যবহারের প্রয়োজন হয়নি, পরেও না। আমাদের মতো অতি সাধারণ ঘরের মেয়েরা সাধারণতঃ কোথাও যেতে আসতে স্নো ক্রীম মাখে, আমার সে বালাইও ছিল না, কাজেই ওসব ব্যবহার করতাম না, এমনি পড়ে থাকতো।

আজ তার প্রয়োজন বড়ো অনুভব করলাম। পায়ে আলতা পরলাম ক্রীমের কৌটো খুলে দেখি ওটা শুকিয়ে গেছে, তবু নখ দিয়ে খুঁটে খুঁটে একটু বার ক'রে দুহাতে তালুতে ঘষে তাই মুখে মাখলাম। জিনিষটা ভালো জাতের ছিল তাই তার গন্ধটা এখনও যায়নি। জানি, ভালো কাপড় পরার কোনো মানেই হয় না তবুও ট্রাঙ্ক খুলে একটা বুঁটি করা দামী শাড়ি পরলাম। তুলে রাখা গয়না-গুলো পরলাম, গন্ধ তেল মাথার চুলে একটু বুলিয়ে নিলাম, তারপর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চোখের কোণে কাজল, কপালে সিঁদুরের টিপ, দুগালে একটু রোজ লাগিয়ে তাকিয়ে থাকলাম। 'কেমন লাগছে?' নিজেকে নিজে প্রশ্ন করলাম। আমার ঠোঁট দুটো বরাববই লাল টুকটুকে। পান চিবিয়ে লাল করতে হয় না। কেমন লাগছে, খুব সুন্দর। সত্যি আমাকে সেদিন খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল, আর বেশ ভালোও লাগছিল বাসর সাজ। হ্যাঁ বাসর সাজই বটে। সেদিনের সেই শুভ রাত্রির ব্যর্থতা ঢাকবার জন্যই বোধহয় আমার এই আদিখ্যেতা। একবারও ভাবতে চেষ্টা করলাম না যে, বিয়ের চার বছর পরে এইসব হ্যাংলাপনা তিনি কী চোখে দেখবেন! একবারও লজ্জা হল না, যে পুরুষ তার স্ত্রীকে ভালোবাসে না তাকে ভোলাবার জন্যই বসন ভূষণ পরে সাজ সজ্জা করে তাকে আরো নিবিড় ক'রে কাছে পাওয়ার জন্য এত রূপের ডালি নিয়ে তাঁর সামনে যেতে হবে—যার চরণখানি পর্যন্ত স্পর্শ করার সুযোগ ঘটেনি কোনদিন, তাঁকে ভোলাবার জন্য আজকের এই নির্লজ্জতা। মনকে একবারও ধিক্কার দিলাম না। কী দৈন্যতা আমাকে পেয়ে বসেছিল দেখুন। একবারও মনে পড়ল না যে, একদিন এক দূর-সম্পর্কীয় বোনের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম বলে এবং ফিরতে একটু বেশী রাত হওয়ায় তিনি তাঁর ঘরের দুয়ার বন্ধ করে রেখেছিলেন। কতবার তাঁকে ডেকেছি, কেঁদেছি কিন্তু তবু দরজা খোলেননি তিনি। শীতের মধ্যে বাইরে আড়ষ্ট হ'য়ে দরজার কাছে সারারাত উপুড় হ'য়ে পড়ে রইলাম তবু তাঁর করুণা হলো না! তিনি অকরুণ হয়েই রইলেন। মনে পড়ে সকাল বেলায় আমার আড়ষ্ট দেহটাকে নিঃশব্দে ডিঙিয়ে ঘরের বার হয়েছিলেন তিনি। তবু একটু 'আহা' করেননি। সেদিন তাকে মনে করেছিলাম কী নিষ্ঠুর তিনি।

সেদিনের সেকথা মনে করেও আজ তাঁর এই অযাচিত আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করতে পারলাম না। একবারও মনে করতে পারলম না যিনি অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান দিয়ে আমার মতো মেয়ে মানুষকে ঢের ঢের কৃপা ক'রেছেন তাঁর কাছে তার চেয়ে বেশী কিছু প্রাপ্য নেই। হায়রে মেয়ে মানুষ! তোর লোভ আর লালসার শেষ নেই—সীমা নেই। এতবড় অবজ্ঞা, এতবড় অনাদর, এতবড় তাচ্ছিল্য পেয়েও তোর লজ্জা হয়নি, ব্রাহ্মণ সাক্ষী রেখে অগ্নি সাক্ষী রেখে অন্তরীক্ষের দেবতাদের সাক্ষী রেখে যাকে স্ত্রী বলে সহধর্মিনী বলে ঘরে এনে একবারও মর্যাদা দিলেন না, আজ তার একটুখানি চোখের ইসারাতেই একেবারে গলে গেলাম, হায়রে মেয়ে মানুষ! কিন্তু কুড়িটা বসন্ত যার চোখের উপর দিয়ে চলে গেল তার কী একবারও বসন্তবাহারের জন্যে মনের আকুলতা থাকতে পারে না? আজ হঠাৎ আকাশ বাতাস স্থল জল প্রকৃতির সব কিছুই

আশ্চর্য ভাবেই ভালো লাগছে কেন? এই কেনর জবাব ইচ্ছে করেই দিলাম না। প্রসাধন সেরে বাসর জাগতে গেলাম, লজ্জা-সরমের মুখে ছাই দিয়ে রজনীগন্ধার দুটো কলি খোঁপায় গুঁজে দিলাম। ভালোবাসা কথাটার মানে না বুঝেও ভালোবাসা যায় যদি বুঝতে পারা যায় যে, আকাঙ্ক্ষিত মানুষটি হৃদয়বান। তাঁর নিষ্ঠুরতার মধ্যেও আমি যেন হৃদয়ের স্পর্শ পেয়েছিলাম।

—ছাদে গিয়ে দেখি ছাদের এক কোণে দাঁড়িয়ে রবীঠাকুরের 'ও রজনী গন্ধা তোমার গন্ধা সুধা ঢালো' গাইছেন। খুব আস্তে আস্তে গাইছেন। আপনারা তো বিশ্বাস করবেন না সেদিন আমার বুকের মধ্যে কি হচ্ছিল। ভুক্তভোগী ছাড়া এ অবস্থা কেউ বুঝতে পারে না। ভালোবাসার যে অশরীরী রূপ, কেবল সে-ই তা বুঝতে পারবে, যে আমার মতো মরুতৃষ্ণা সয়ে দীর্ঘবিরহে দিন কাটিয়েছে।

পূর্ণ জ্যোৎস্নায় স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে নির্মল আকাশের দিকে চেয়ে বুঝলাম আমি আর একা নেই! দুই দেহে একআত্মায় হ'য়ে গেছি লীন, এই তো জীবন! একটা অপূর্ব অনাস্বাদিত অনুভূতিতে আমার ভরা ভাদর হিল্লোলিত হ'য়ে উঠলো। মনে হচ্ছিল বুকের মধ্যে জ্যোৎস্নার ঢেউ বয়ে যাচ্ছিল।

তার পাশে চুপিচুপি দাঁড়িয়েছিলাম বোধকরি তিনি আমাকে দেখেননি, আপন মনে আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে গাইছিলেন 'চাঁদের আলোর বাধ ভেঙেছে উছলে পড়ে আলো' আমার আর দিকবিদিক জ্ঞান নেই। লজ্জার মাথা খেয়ে তাঁর একটা হাত মুঠির মধ্যে তুলে নিলাম। তারপর তাঁর হাতের মুঠি গালের মধ্যে চেপে ধরলাম। চারিদিকে প্রতিবেশীদের দ্বিতল ত্রিতল বাড়ির জানালা দিয়ে ভেতর বাড়ির সব দেখা যাচ্ছে। ছিঃ ছিঃ কী করলাম! কেউ কি দেখেনি?

আমাদের ছাদের রেলিংটা ছিল প্রায় দেওয়ালের মতো বুক সমান উঁচু। বিছানায় বসে যদি কাজটি করতাম তাহলে পরদিন বোধ হয় কারো কাছে লজ্জা পেতে হতো না। কিন্তু হৃদয় যখন জাগে, তখন কি আর হিসেব ক'রে জাগে? কুড়ি বছরের অভুক্ত হৃদয় উত্তাল তরঙ্গের মতো আছড়ে পড়তে চায় পাড়ের 'পর। বসন্ত পূর্ণিমার রাত। তাঁর দিকে চাইলাম, তিনি আমার দিকে চাইলেন। আমার মনে হল আমরা আর অপূর্ণ নই ঐ যে প্রশস্ত বক্ষ ঐ তো আমার স্থান। এতদিন শুধু মূর্খের মতো দূরে দূরে থেকে বৃথাই কেঁদে মরেছি। তিনি ডাকেননি, কিন্তু আমি কি গিয়েছি তাঁর কাছে? অভিমান করে করে তাঁকে নিষ্ঠুর নীরস ভেবে দূরে দূরে থেকেছি। সে পুরুষ, তার কত আছে। বাইরের জগতে সর্বত্র সে। তার অভাব কিসে? আমার চেয়ে ঢের গুণী সুন্দরী মেয়ে তার পায়ে পায়ে আমারই সম্মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কৈ তাদের কাউকেই তো আঁকড়ে ধরেননি। আমি অভিমানে বৃথাই কেঁদেছি। চার বছর আগের সেই বিভীষিকাময় দিনগুলোর কথা ভুলে গেলাম। সেদিনের শুভদৃষ্টি শুভরাত্রি আজ হবে—নতুন করে জীবনকে জানবো। দুজনে দুজনকে বুঝবো। 'হৃদয়ে হৃদয়ে জানি গো।'

উছলে পরা আলোকে, বাসন্ত পূর্ণিমার ভরা জ্যোৎস্নায় তার চৌত্রিশ বছরের

যৌবনকে মনে হ'লো তারুণ্য'ময় চব্বিশ বছর। বন্ধনহীন মুক্তিপাগল এক যোদ্ধাকে –যার সমস্ত গৌরবকে আমার হাতের মুঠির মধ্যে পেয়ে গেছি। এ আমার অহংকার। আর ছাড়া নয়, আর ক্রন্দন নয়, আজ জীবনকে আস্বাদ করবো। আমার মধ্যে উপনিষদের লোভাতুর সুশোভনার আত্মাকে অনুভব করলাম। একটু অপেক্ষা করার ধৈর্য আমার নেই। তাঁর বুকের মধ্যে মাথা রেখে খোঁপার রজনীগন্ধার কলি দুটোর মতো হায় তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। তিনিও আমার সূর্যমুখীর মতো তোলা মুখের পানে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন।

আমরা দুজনে অনন্ত আকাশের নীচে বিছানায় এসে বসলাম। চারিদিকে জ্যোৎস্না গলে পড়ছিল। মনে হচ্ছিল যেন সমুদ্রের ঢেউয়ের মধ্যে জ্যোৎস্নার ঢেউ বইছে। আমি কুমুদিনী, তিনি যেন চাঁদ। আমি যেন গন্ধ, তিনি যেন বাতাস। আমি সঙ্গীত, তিনি সুর। আমি নদী, তিনি সমুদ্র। আমি চাতক, তিনি মেঘ। আমি ধরিত্রী, তিনি যেন সূর্য। আমি সুন্দর, তিনি সত্যম্ শিবম। তিনি নইলে আমি—আমরা বৃথা। তিনি নইলে আমরা সম্পূর্ণ নই। মুখোমুখি হয়ে বসে তিনি বললেন—'আমার সৃষ্টির মধ্যেই আমি বেঁচে থাকতে চাই।' সেদিন রাত্রে ঐ কথার অর্থ বুঝিনি।

দশমাস বাদে আমার মেয়ে হলো। সে এল তাঁর ও আমার মতো রূপলাবণ্য নিয়ে। আমি মা হলাম। আমি একদিনের জন্য প্রিয়া হলাম। তারপর থেকে গিন্নী। সেদিন তাঁকে পেয়ে হৃদয়ের সবচেয়ে নিরাপদ, সবচেয়ে সুন্দর, কুসুমাবৃত, সবচেয়ে নিভৃততম স্থানে গোপনে লুকিয়ে রাখবার জন্য কী আকুলতাই না হয়েছিল, কিন্তু পারিনি। একমুহূর্ত ধরা দিয়েই কোথায় পালিয়ে গেল জানি না। তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছি, পাইনি,—পাইনি তাকে প্রেমিক হিসেবে, ভালবাসার আধার হিসাবে। পাইনি তার সমুদ্র-পিপাসার পুরুষ-বাসনাকে, পাইনি স্বামী বলে, নারী জীবনের সার্থকতার চরম বলে যা পাওয়া—আমার ন্যায়ত, ধর্মত, অবশ্যম্ভাবী ছিল, তা আর পাইনি। তারপর আজ আরো ছ'টি বছর একসঙ্গে বাস করেও খুঁজে পাইনি তাঁকে।

বলতে পারেন কি নিয়ে আমি বেঁচে আছি? কিছুদিন আগে আমাদের পাশের বাড়ির একটা বৌ গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে। একদিন বৌটা আমাকে বলেছিল, 'স্বামীর ভালবাসা পেলাম না তো দিদি। তাই আঁর কিছু ভাল লাগছে না। কিছুই না, বছর বছর ছেলেগুলো হচ্ছে, কিন্তু তাতে কোন জীবনের আস্বাদ নেই।' সত্যি আস্বাদ নেই। যে জীবনের আস্বাদ নেই, যে জীবনের নব নব আবিষ্কারে আনন্দ নেই, যে জীবন সৃষ্টির নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে না, যে জীবন বৈচিত্র্যহীন, যেখানে বিকশিত হবার রৌদ্রোজ্জ্বল দিবস নেই সেখানে, শুধু আহার নিদ্রায় উপদ্রবহীন বিপুল সময় নষ্ট, বিপুল সময় অপচয় প্রবাহমাত্র—সেখানে সেই জীবন আমার কাছে মৃত।

মৃত হয়ে বেঁচে থাকতে চাই না। তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে বেঁচে থাকতে

চেয়েছেন। আমি তাঁর সৃষ্টির আধার? হঠাৎ কি যেন কি হলো! একদিন তিনি রাজনীতি, পার্টি ছেড়ে দিলেন। দলের ছেলেরা এলো—তাঁদের তিনি বলে দিলেন, দলের নেতারা আদর্শচ্যুত। আমি আর লক্ষ্যভ্রষ্টের দলে থেকে লক্ষ্যভ্রষ্টের মতো ছুটবো না। যে আদর্শের জন্য আমার মতো হাজার হাজার ছেলে জীবনের স্বর্ণময় মুহূর্তগুলো নষ্ট করেছে, তারা তার জন্য শুধু দুঃখবোধই করছে না, আমারই মতো বিক্ষুব্ধ। যদি কোনদিন এই সমাজ ব্যবস্থা পাল্টাবার ডাক আসে, যদি কোনদিন সর্বাত্মক বিপ্লবের ডাক আসে, সেদিন সে ডাকে সাড়া দেবই। আমি দরজার পাশে আড়ালে থেকে তাঁর এই কথাগুলো শুনেছিলাম। যাক্ বাঁচা গেল! এখন হয়তো পুরোপুরি পাওয়া যাবে! যারা রাজনীতি করে, তারা আর যাই করুক, গৃহনীতি করে না, এই সত্যতা আমি স্বামীর আচরণে বুঝেছিলাম, তাঁর আজ রাজনীতির সংস্রব ত্যাগে তাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচতে চাইলাম। কিন্তু কে জানত যে বিধাতা আমার অদৃষ্টে দুঃখই লিখে রেখেছেন।

সেই দুঃখের কাহিনীই আপনাকে শোনাবো বলে এই চিঠি। অবশ্য সবই দুঃখের কাহিনী নয়। যেমন আঁধার আছে, কিছু আলোও আছে। কেউ তারে বাইরে দেখবে কেউ ভেতরেও দেখতে পারে,—সেই আশাতেই এত কথা বলতে যাচ্ছি। কেন যাচ্ছি জানেন? আপনি তো একজন পুরুষ! শ্রীল—শ্রীযুক্ত। সসাগরা ধরণীটা আপনাদের জন্যই। মনুষ্য জীবনের সুখ ও দুঃখের মালিক আপনারাই।

আমাদের শাস্ত্রকার বিবাহ অনুষ্ঠানে শুভদৃষ্টি শুভরাত্রির জন্যে একই সময় নির্দেশ করেছিলেন—তার যথার্থ প্রতিপালনে বর-কনের জীবনে হয় তো শুভ ফলই ফলে। আমার কপালে শুভদৃষ্টি শুভরাত্রি কোনোটাই ঘটেনি বলে আমার জীবনে যে কোনও শুভফলই ফলবে না সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত ছিলাম। কিন্তু বিয়ের চার বছর পর যখন স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হয়ে তাঁর ভালোবাসায় আমি প্লাবিত হয়ে গেলাম; তখন মনে হয়েছিল আমাদের শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তগুলো শুধু অপ্রয়োজনীয় নয়—অবাঞ্ছনীয়ও বটে, আজ কিন্তু সেদিনের আমার সেই ধারণাটাই পাল্টে গেছে। শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তগুলোর একটা মূল্য আছে বইকি! সেদিন সেই পূর্ণিমা রাত্রে যে মানুষটি একটি প্রস্ফুটিত ফুলকে দলে মুচড়ে নিংড়ে ছোবড়া করে দিলো, তার পরেই সে তাকে কী করে বিমুখ করতে পারে সে কথাটাও আপনার কাছে আমার জিজ্ঞাস্য। কারণ আপনারাই ধরণীর অধিশ্বর। আপনারা সব পারেন। কি করে পারেন সেই কথাই বলবো এই পত্রে। পত্রটি হয়তো একটু দীর্ঘ হবে। অনুরোধ দয়া করে পড়বেন।

যে কলম নিয়ে মাঝে-সাজে খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখতেন সেই কলমই হলো এখন তাঁর নিত্য সঙ্গী। দিনরাত কাব্য আর সাহিত্যে ডুবে রইলেন। তাঁর আর্থিক চিন্তা একেবারেই গৌণ হয়ে গেলো। সংসারের নিত্যদিনের বস্তুর কথা, পোষাক-পরিচ্ছদের কথা, দেহ ও চুল দাড়ির কথাও ভুলে গেলেন। সম্ভবত মান আর হুঁসও রইলো না। দু'চারজন খুচরো পাওনাদার এসে তাগাদা দিলেও যখন তাঁর হুঁশ

হয় না—তখন মনে হতো তিনি আর মানুষ নেই। জড়ভরত হয়ে গেছেন। লিখে চললেন গল্প-কবিতা-উপন্যাস। লেখার স্তূপ জমে উঠলো টেবিলে। মাঝে মধ্যে আমি গিয়ে লেখার স্তূপ ভাগে ভাগে রেখে দিতুম খাটের নিচে একটা ভাঙা বাক্সের ভেতর। বলে বলে দাঁড়িটাও কাটাতে পারতুম না—এমনি উদাসীন আত্মভোলা হয়ে আমার দুঃখের কপাল জুড়ে বসলেন। কিন্তু আমিও ঐ উদাসীন মানুষটার প্রতি বিশেষ সজাগ ছিলুম না। তাঁর ভিতর জগতের খোঁজ-খবর একেবারেই অপ্রয়োজন মনে হতো। কাজেই তার ঘরে এখনো যে সব ছেলে-মেয়েরা আসে, তাদের আমি কখনো চা খাইয়েই কর্তব্য শেষ করেছি। ঐ ঘরে আরো কিছু হচ্ছে কি না তা নিয়েও আমার মাথাব্যথা ছিল না।

একদিন ওর ঘর থেকে একটি মেয়ে এ ঘরে এসে আমার সঙ্গে গায়ে পড়ে ভাব জমাতে লাগলো। মেয়েটি প্রায় আমার সমবয়সীই হবে। তাকে আগেও যে দেখিনি তা নয়। ও ঘরে বসে বসে অনেকদিন অনেকক্ষণ তাঁর সঙ্গে গল্প করতে দেখতুম। হঠাৎ আমার সঙ্গে ভাব জমাতে আসায় একটু অবাক হয়েছিলাম বই কি? কিন্তু ওর সচ্ছন্দ চলা-ফেরা ও সহজ কথাবার্তা আমার বেশ ভালো লেগেছিল।

তিনি যতই উদাসীন হয়ে পড়লেন আমি যেন ততই অজ্ঞাতসারে সংসারটাকে আঁকড়ে ধরলাম। পাড়ার ছেলেদের বলে কয়ে বাজার-হাট করাতে লাগলাম। তিনি যে শুধু উদাসীন অকর্মণ্য হয়ে পড়ছিলেন তাই নয়, নেশার মাত্রাও আরো বেড়ে উঠলো। সিগ্রেট আগেও খেতেন, এখন যেন একটার পর একটা না হলে চলে না। তাঁর সিগ্রেটের দাম মেটাতে আমার প্রাণ বেরিয়ে যেতো। সন্ধের পর ঘণ্টাখানেকেব জন্য বাইরে যেতেন,—ফিরতেন উগ্র নেশা করে। তারপর ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে চলতো নাকি সাহিত্য সাধনা। হায়রে সাহিত্য সাধনা! জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এ কোন্ সাহিত্য সাধনা। জানি না। আমার কথা না হয় বাদই দিলাম শিশুকন্যাটির কথাও যেন তিনি ভুলে গেছেন। দিন কয়েক বাদে ঐ ঘরেই শোবার ব্যবস্থা করলেন। সংসার থেকে একেবারে নির্লিপ্ত হয়ে থাকতে চাইলেন তিনি, সংসারের ঘরে-বাইরে কোন কিছুর মধ্যেই রইলেন না। ভেবে দেখুন আমার অবস্থা। আমি সাধারণ সামান্য মেয়ে মানুষ কি দিয়ে কি করি!

আমি যেন নিশ্চিত বুঝতে পেরেছিলাম আমার মাথায় বাজ ভেঙে পড়বে। একটা আতংকে আমার বুকের ভেতর কাঁপন শুরু হয়ে গেল। সাত তাড়াতাড়ি "যেন-তেন-প্রকারেণ" আমাকে পাত্রস্থ করায়, বাবা মায়ের প্রতি যে আমার মনের মধ্যে গোপনে একটা ক্ষুব্দ অভিমান সঙ্কুচিত ছিল; যেন তাও এই মুহূর্তে প্রকট হয়ে আরো বেশী মূর্ত হয়ে উঠলো। দিনকে দিন পৃথিবীটা বিস্বাদ বোধ হতে লাগলো। এমন কেউ নেই যে তার কাছে আমার এই উপেক্ষিত জীবনের বেদনার ইতিহাস বলে একটু হাল্কা হই। জানেন! সেই সময় আমার প্রতিক্ষণই মনে হতো এই উপেক্ষিত জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার কোন প্রয়োজন নেই। বাচ্চা মেয়েটা হচ্ছে 'কাল', নইলে কোনদিন কেরোসিন ঢেলে আগুনে জ্বালা জুড়াতাম।

—'কি করছো দিদি !' সেই মেয়েটি। ও ঘরে না গিয়ে সোজা এঘরে এসে বোনের মতোই দিদি বলে ডাকলো। ভারি মিষ্টি লাগলো তার ডাক! ঘরের সঙ্গে লাগোয়া রান্নাঘরে আমি তখন তাঁর জন্যে জলখাবার তৈরী করছিলুম। আমার মেয়েটা দাওয়ায় বসে পা ছড়িয়ে চেঁচাচ্ছিল। সে ওকে কোলে তুলে আদর দিয়ে চোখ মুছিয়ে রান্নাঘরে আমার কাছে এসে বসলো। লুচি বেলতে বেলতেই আগুন্তিকার প্রশ্নের জবাব দিলুম, 'বাইরে বেড়াতে যাবে যে, এখন কিছু না খেলে হয়তো আর খাওয়াই হবে না।' আগুন্তিকার কোলে তখনো আমার মেয়েটি কাঁদছিল, বোধহয় খিদে পেয়েছিল। ওকে আমার কোলে দিয়ে আগুন্তিকা নিজেই লুচি করতে বসলো। বললে 'দিদি ওর খিদে পেয়েছে।' আমি মেয়েকে খাইয়ে এসে দেখি লুচি বেগুনভাজা শেষ। তিনটে রেকাবিতে লুচি বেগুনভাজা সাজিয়ে বললে, ওঘরে দিয়ে এসো, তিনজন আছে দেখলুম।

আমার ভালো লাগলো মেয়েটিকে। আমার কষ্টের ভাগ নিতে এসেছে ও। সংসারে কষ্টের ভাগ কেউ নিতে চায় না। যে চায় সে সত্যিকারের আপনজন। তাকে দূরে ঠেলে দেওয়া যায় না। তার দায়িত্ববোধ যখন আমার দায়িত্বের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়, অজ্ঞাতেই তার ওপর একটু নির্ভরতাও এসে যায়। তার এই সামান্য কাজটাকে তখন আমার কাছে অসামান্যই মনে হয়েছিল। স্বামীর কাছে কত লোক—কত ছেলেমেয়েই তো আসে, কাউকে কিছু করে দিতে না বললে গায়ে পড়ে কেউ কিছু করে না। ওর অযাচিত সাহায্য পেয়ে মনটা ভরে গেলো। সঙ্গী-সাথীহীনা একাকী জীবন কী যে দুর্বিষহ একথা আপনাকে কেমন করে বোঝাবো। তবু একটু ভদ্রতার অভিনয় করলাম—'ওমা, তুমি এতো করতে গেলে কেন?' সে তার বড় বড় চোখ দুটো তুলে সমস্ত মুখে নিঃশব্দ হাসি ছড়িয়ে বললে—'কেন? হয়নি?'

—'বাঃ, হবে না কেন! বেশ হয়েছে, সুন্দর হয়েছে—তা' ভাই তোমার নামটাতো জানলুম না, সে উঠে দাঁড়িয়েছিল—পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে লজ্জাবতী মেয়ের মতো মেঝেতে ঘসতে ঘসতে বললো, 'যমুনা'। সঙ্গে সঙ্গে আমি খুশী হয়ে বলে ফেললাম—'বাঃ কী মিল।' সে অবাক হতেই পুনরায় বললাম। আমার বাপের বাড়ির নাম গঙ্গা! গঙ্গা যমুনা দুই বোন, মিল হলো না? যমুনার মুখ মিষ্টি হাসিতে ভরে গেলো।

এমনি করেই সে আমাদের ক্ষুদ্র সংসারটার মধ্যে একটু একটু করে স্থান করে নিতে লাগলো। তখন কি জানতাম—গঙ্গার ঘোলাজল আর যমুনার কালো নীল জল কোনদিন এক সঙ্গে মিশবে না?

এতদিন ওকে মাঝে মাঝে আসতে দেখলেও এখন সে রোজই আসে। খানিক ওঘর, খানিক এঘর। দু'হাতে সব কাজ করে দেয়। ওকে সবচেয়ে ভালো লাগে-যখন সে আপনা থেকে সব কাজ করে দেয়। আবার সন্ধে হতে না হতেই চলে যায়। একদিন তাকে জিগ্যেস করে জানলাম, তাদের বাড়ি বেশ দূরে। ট্রেনে যেতে হয়—ঘণ্টাখানেক সময় লাগে। গ্রামের বাড়ি। ষ্টেশন থেকে বেশ খানিকটা দূরে। হেঁটে গেলে আধঘণ্টা তো লাগেই। রিক্‌শায় গেলে পাঁচ সাত মিনিট। কিন্তু ও রোজ এতটা পথবেয়ে

আসে কেন—? এ প্রশ্ন আগে মনে হয়নি। যত দিন যাচ্ছে, ও আরো কাছাকাছি আসছে ততই প্রশ্নটা মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল। কিন্তু সরাসরি যমুনাকে এ প্রশ্ন করতে সাহস পেতেম না। কী জানি ও কি মনে করবে,—যদি মনে মনে কোন কিছু ভাবে। যদি আসাটা বন্ধ করে দেয়? এখন ও আগের মতো বিকেলে আসে না। দেড়টা-দুটোর আগেই এসে পড়ে। এসেই কাজের লোকের মত কাজে হাত দেয়। কোনদিন হয়তো ওবারের বিছানাও তোলা হয় না—এসেই তার পরা শাড়ি ছেড়ে আমার একটা পুরনো শাড়ি পরে কাজে হাত লাগায়। তারপর বসে মেয়েকে নিয়ে তাকে বর্ণপরিচয়,—এক দুই তিন,—ওয়ান টু থ্রী সব শেখায়। সেদিন তো সকাল ছটায়ই এসে পড়েছিল—কাচাকুচি ছিল, আমি বাইরে কলতলায় কাচাকুচি করছিলুম। ও ঘরের রান্না থেকে সব। তারপর তাকে কেমন করে বলি তুমি আস কেন?

মনের ভেতর তার সম্বন্ধে সংশয় থাকলেও বাইরে তা' প্রকাশ করার উপায় নেই। বলার মতো কোনও কারণ নেই। ওবরে স্বামীর কাছে যে আড্ডামারে সে কথাও বলতে পারি না। যেটা বলতে পারি—তা হচ্ছে সব কাজই তুমি আমার চেয়ে ভাল পারো। কিন্তু বলিনি। তবে বললাম, দায়িত্ব নিয়ে ওকে দেখাশোনা করো। ভাবলাম তার অনুশাসনে যদি চুল দাড়ি কাটেন আমার পতিদেবতা। আর খাবো না বলে খাবার ঠেলেও না দেয় সেই আমার ভাগ্য। মাঝে মাঝে বেশ ভদ্রলোকের মতো তিনি আমাদের সঙ্গে কথাও বলেন। আমার মনে হলো,—যমুনার জন্যই আবার সাংসারিক মানুষে ফিরে আসছেন। যমুনা তার সিগ্রেট খাওয়াও কমিয়ে দিয়েছে। পাওনাদারদের সোজাসুজি তাঁর কাছে হাজির না করেও তাদের উপস্থিতি শুনিয়ে বলতো 'কবে আসতে বলবো' হয়তো তিনি কথা দিতেন। আর সে কথা রাখবার জন্যেই হয়তো আবার স্কুল কলেজের নোট লিখতে শুরু করেছিলেন। আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি, তারপর কোন পাওনাদারই তারিখ মতো এসে আর শূন্য হাতে ফিরে যায়নি। পাবলিশারের কাছ থেকে টাকা না এলেও যমুনাই এ টাকা মিটিয়ে দিয়েছে। পাপ আমার মধ্যে কেমন করে বাসা বেঁধেছিল শুনুন! ও যে আমার সংসারের জন্য মাঝে মাঝে টাকা খরচ করতো তা আমি দেখেও দেখতুম না। জেনেও জানতুম না। অপরে আমার চোখের সামনে আমার পাওনাদারের দেনা মেটাবে,-এটা ওটার জন্যে গাঁটের পয়সা খরচ করবে, আমি বাধা দেবো না;-আপত্তি করবো না। এটা হতে পারে না। তার চেয়ে 'আমি জানি না' এভাবে-আত্মরক্ষার পক্ষে এ ঢের ভালো। কিন্তু এই আত্মরক্ষার প্রয়াস যে আত্মহননের চেয়ে আরো সর্বনাশা একথা সেদিন এতটুকু বুঝিনি।

—যমুনার নিত্যদিন আসা-যাওয়ায় আমারই যেন অসুবিধা হচ্ছিল তাই একদিন সাত পাঁচ না ভেবেই বললাম, 'রোজ রোজ তোমার বাড়ি না গেলে কি চলে না?' সে হাসলো। তারপর হাসি মুখেই বললো, 'তা কি করে হয়।' সত্যিই তো, তা কী করে হয়। অনূঢা-'অবিয়েতা' মেয়ে রাত্রি করে বাইরে থাকবে, মা বাবা রাজি হবে কেন? আর

আমরা তো তাদের আত্মীয় নই স্বজনও নই। কী বলে থাকবে? এখনো এদেশে কুমারীদের বাইরে রাত কাটানো চল হয়নি। যতদিন না কুমারীদের কুমারীপনা ঘোচানর দায়িত্ব নিজেদের হাতে বর্তাবে ততদিন কুমারীদের মা, বাবা বা অভিভাবকদের অনুমতি ছাড়া বাইরে রাত কাটানো সম্ভব নয়। তাই 'তা কি করে হয়!' কিন্তু সে যে এমন একটা প্রশ্নের জন্যেই এতদিন অপেক্ষা করছিল তা' আমি কী করে বুঝবো! আমার কথাটা যে একেবারে যুক্তিহীন অবুঝের মতো নয় তা প্রমাণ করার জন্য বললাম —হয়। তুমি যদি মা বাবাকে বোঝাতে পারো, এখানে তোমার মাস্টার মশাইয়ের বাড়িতে থাকা তোমার পক্ষে নিরাপদ—তবে তারা অমত নাও করতে পারেন। —'কি করে বোঝাবো' তার আগ্রহটা অনেক পষ্ট হয়ে এলো। বললাম 'তোমার মা,—বাবা, কাউকে একদিন নিয়ে এসো। দেখলে—কথা বললে আর অমত করবেন না।' যমুনা যেন উপায় খুঁজে পেলো—বললে 'তাই ভালো। আরো ভালো হয় তুমি আমার কথা লিখে অর্থাৎ থাকার কথা—যদি একটি চিঠি দাও তা' হ'লে বোধ হয় আর কোনো আপত্তি করবেন না।' হায় আমি কি জানতাম—সে পৌরাণিক কাহিনীর সুশোভনার মতো স্বৈরিণী! তার সূক্ষ্ম চালে—আমি ভোঁতা হয়ে গেলাম। আমার হাতের লেখা ভালো নয়। ওকে বললাম, 'তুমি লিখে নাও আমি সই করে দিচ্ছি।' সে রাজি হলো না। বললে—'না। এটা ঠিক হবে না।' পাকা মাথার মতো কথা। আমার হাতের লেখা যে একদিন প্রামাণ্য দলিল হিসেবে দাখিল করতে পারবে সে কথা ঘুনাক্ষরেও ভাবিনি। লিখে দিলাম। চিঠিখানি তার ব্লাউজের ভিতর মানি ব্যাগে রেখে হাসতে হাসতে বললে—'মাষ্টার মশাই আমাকে অনেকদিন আগেই বলেছিলেন—'

—'কই, সে কথা আগে বলোনি তো! তা' তিনি যখন বলেছেন তখন আর বাধা কোথায়। আগেই তো আসতে পারতে। খামোকা এতোটা কষ্ট করতে হতো না রোজ রোজ।'

যমুনা একটু তীক্ষ্নস্বরে বলেছিল—'উনি বললেই হবে! পুরুষ মানুষরা অনেক কথাই বলে। তা ছাড়া, মাষ্টার মশাইতো সংসার সম্বন্ধে একেবারেই অনভিজ্ঞ।' সেদিন আমি বুঝেছিলাম মাষ্টার মশাইকে সে খুব বেশী মূল্য দেয় না। আমি মূর্খ হই, গেঁয়ো হই সংসারের কর্ত্রী হিসেবে যমুনা আমাকেই মূল্য দেয়। পুরুষের কাছে নারীর মূল্য যা-ই হোক না কেন—সংসার যদি তাকে কর্ত্রী হিসেবে মূল্য দেয়— এটা তার কাছে কম কথা নয়। যমুনার প্রতি আমার মনটা শ্রদ্ধায় পূর্ণ হয়ে গেলো।

চিঠি লেখার পর আরো সাত আটদিন চলে গেলো—কিন্তু যমুনা থাকার মতো করে তখনো আসেনি। যেমন আসতো-যেতো তেমনি চলছিল। ভেবেছিলাম, ও যখন তার মাষ্টার মশাইকে সিগ্রেট খাওয়া কমিয়েছে—চুলদাড়ি কাটাতে পেরেছে,— বলে কয়ে একটু ভদ্রস্থ করতে পেরেছে এখানে থাকলে সন্ধের পর গলায় ঢালার নেশাটাও কমাতে পারবে। তাই তাকে তাগাদা দিয়ে বললাম—কি হলো বাড়ি থেকে মত পাওনি?' অর্থাৎ এখানে এতদিন যে, মাষ্টার মশাইয়ের ঘরে বসে গল্প করে নিজের

ভিত পাকা করেছে—এমন কথা আমি যেন ভাবতেও না পারি। সেজন্যেই আমার গরজটাকে সে টেনে বাইরে এনে দাঁড় করালো। ক্ষুর হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরু হচ্ছে—এমন কথা কেউ বলুক এমন উপায় আর রইলো না। ফেব্রুয়ারী মাস পড়তেই 'সুপ্রভাত দিদি' বলে যমুনা এলো। সঙ্গে তার একটা ষ্টিলের স্যুটকেস। সে বাড়িতে ঢুকতেই পেছনে পেছনে রিকশাঅলা দু'হাতে দুটো ভ্যারী চটের ব্যাগ বয়ে বারান্দা পর্যন্ত পেঁৗছে দিয়ে চলে গেলো! ব্যাগ ভর্তি কী জানতে কৌতুহল ছিল,—তাড়াতাড়ি গিয়ে ব্যাগের মুখ ফাঁক করে দেখলুম না—না দেখেই বললাম আবার এতোসব কি নিয়ে এসেছো।' 'না এনে কি পারি? মা ছাড়বে কেন। বলে তোর জমির ফসল তুই না খেলে খাবে কে? সংসারে তো দাদা-বৌদি মা-বাবা। ক্ষেতের ফসল বাগানের ফল পুকুরের মাছ'—বলতে বলতে সেই ব্যাগ দুটো যমুনাই রান্নাঘরে বয়ে নিয়ে গেলো। তারপর স্যুটকেশ খুলে একটা আটপৌরে শাড়ি পরে এসে ব্যাগের ভেতর থেকে বার করলো টমেটো থেকে শুরু করে কড়াইশুটি সহ শীতের নানা ফসল। মটর শাক, কলাই শাকও বাদ যায়নি। সব শেষে সেরখানেক ওজনের একটা রুই ও কিছু বাটা মাছ। মাছগুলো বোধ হয় ভোর রাতে ধরা। একদম টাট্‌কা। মাছ দেখে আমার মেয়ে তার অবাক চোখ মেলে আর আঙুল তুলে জু জু বলে আনন্দে উল্লাস করছিল। আরেকটা ব্যাগ থেকে বার করলো চারটে খোসাছাড়ানো নারকেল, দু'টো কচি লাউ, দুটো কুমড়ো। দেখে আমার কি আনন্দ হচ্ছিল না! হচ্ছিল। তবু কোথায় যেন কাঁটার মতো খচ্ খচ্ করছিল। এযেন বাপের ঘর থেকে স্বামীর ঘরে বয়ে নিয়ে আসা। দেশে-গাঁয়ে এমনটা এখনো চলে।

আমার মুখের ভাবটা জোর করে হাসি খুশি রাখতে চেষ্টা করলেও যমুনার মুখের পানে চোখ পড়তেই তার আত্মতুষ্টি ভাবটাকে প্রচ্ছন্ন আশংকায় এমন একটা রূপ নিয়েছে যাকে আর আত্মতুষ্টির পরিতৃপ্তি বলে ভাবতে পারলাম না। তার ব্যাগের সম্পদ বের করে দেখিয়ে বুঝিয়ে দিল, সে একটা কেউকেটা যে—সে কথা অস্বীকার করার উপায় আছে কি? মজার কথা কি জানেন!—সেদিন আমি অত কথা ভাবিনি সাদা মনেই ক্ষেতের ফসলের মতোই তাকেও গ্রহণ করেছিলাম।

শুরু হয়ে গেলো যমুনার নিত্য কাজ। সে আমার সংসারের সমস্ত কাজেই হাত ছোঁয়ালো। তার কথাবার্তা কাজ-কর্মে কোন ফাঁকি আমার চোখে পড়লো না। সহজেই তার সঙ্গে আমার একটা অকৃত্রিম নৈকট্য গড়ে উঠলো। স্বামীর সেবার ভারট আমার চোখের সামনেই আমার অজ্ঞাতে তার হাতে চলে গেলো। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত সে ওঁর ঘরে হাজার বার যেতো। আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ হতো না। খাওয়া দাওয়া শেষ হলে সে-ও ঘরে গিয়ে বসতো। গল্প করতো, গল্প শুনতো। আমি মেয়ে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়তাম। যমুনা আমাকে তাঁর লেখা গল্প শোনার জন্যে ডাকতো—আমি যেতুম না। বরং ঘন্টাখানেক বিশ্রাম করার পর তিনটে না বাজতেই চা করে ওঘরে দিয়ে আসতাম। কোনো কোনওদিন ওরা এতো নিবিষ্ট হয়ে গল্প করতো যে, আমার উপস্থিতিটাও টের পেতো না। কোনো কোনো দিন যমুনাই

। আমার আঁচল ধরে টেনে বলতো—বসো না একটু, ও তো ঘুমোচ্ছে। আমি জোর করে চলে আসতুম। আমার কান্না পেতো, যার ডাকের জন্যে আমি উন্মুখ হয়ে থাকি—সে ডাকে না। অন্যের ডাকে যাবো কেন? অভিমানে বুক ফেটে যেতো। কিন্তু সে কান্নার কথা আমি ছাড়া কেউ জানে না। আর আজ জানলেন আপনি। যদি এ পত্র প্রকাশ করেন জানবেন পাঠক-পাঠিকাগণও।

একদিন কথাচ্ছলে সেকথা বলেও ফেল্লাম—তোমরা গল্পে এমন তন্ময় হয়ে থাকো যে, আমার উপস্থিতিটা তো বটেই—টেবিলে কাপ্‌ডিস্‌ রাখার শব্দটাও শুনতে পাও না! গল্পটা এতই ভালো যে সব ভুলে যাও! যমুনা তার বড় বড় চোখ দুটো যতটা পারে মেলে ধরে বলতো সত্যি দিদি তুমি না শুনলে বিশ্বেস করবে না। তার মুখে স্বামীর প্রশংসায় আমার অভিমানক্ষুব্ধ মনটা কিছুক্ষণের জন্যে হলেও বিমুগ্ধ হয়ে যেতো।

যমুনা প্রথম প্রথম তার মাস্টারমশায়কে আপনি করেই বলতো, কিছুদিন বাদে আপনিটা চলে গিয়ে তুমি হয়ে গেলো।

প্রথমে আমার আড়ালে তারপর আমার সামনেই। 'তুমি'টা তো কাছের ধন। যার মধ্যে আমার স্বপ্নের অনন্ত খনি চরম কৌতূহলে পরম কাম্য হয়ে বসে আছে—সেই 'তুমি' বাংলা ভাষার অনন্য শব্দ। 'তুমি'কে কাছে পাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট সীমায় আপনি ও তুই-এর সমদূরত্বে অবস্থান। 'তুই' হচ্ছে আত্মজ। সেখানে কৌতূহল নাই। আর 'আপনি' হচ্ছে—দূরত্ব বজায় রেখে ভদ্রতার আবরণে শ্রদ্ধাভক্তি জানানোর উপায়। 'আপনি ও তুই'-এর মাঝখানে 'তুমি' এক বিস্ময়মাখা আশ্চর্য সুন্দর। এখানে শিব-দুর্গা এক, পুরুষ-প্রকৃতি এক, সত্য-সুন্দর এক, রাধা-কৃষ্ণ এক, আলো-আঁধার এক। মমত্ব-ভালোবাসা—প্রেমের ত্যাগ পূর্ণতা প্রাপ্তির আস্বাদনের আশ্চর্য অনুভূতিময় 'তুমি'।

যমুনা সেই 'তুমি'কে দু'দিনেই আয়ত্ত করে ফেলেছে দেখে আমার যেমন বিস্ময়ের সীমা ছিল না তেমনি একটা অব্যক্ত যন্ত্রণার জ্বালাও কম বোধ করিনি। আমি তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী হয়েও তাঁকে 'তুমি' বলার অধিকার অর্জন করতে পারিনি। এটা আমারই অক্ষমতার লজ্জা। এ লজ্জা আমার সৌন্দর্যে কি শ্রীবৃদ্ধি করেছিল? আমি জানি না। আমি তার জবাব দিতে পারি না।

আমার গ্রাম্য জীবনের যে বাধো বাধো কুণ্ঠা,—পুরুষের কণ্ঠলগ্না হয়ে প্রগলভার মতো 'আমি তোমায় ভালোবাসি' বলতে পারি না বলে কি আমার মধ্যে সত্যিই এতটুকুও ভালোবাসা নেই? এতটুকুও সত্যি নেই? এতটুকুও সৌন্দর্য নেই? গ্রাম্য সারল্য কি শুধু মূর্খতাতেই পূর্ণ?

আমার এ প্রশ্নের জবাব দেবে কে? আপনি পুরুষ মানুষ—এর জবাব আপনারাই দিতে পারেন। কবি সাহিত্যিক শিল্পী এঁরা কি কেউ গ্রাম্য মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে জীবন-সঙ্গিনীর মর্যাদা দিয়েছে? তাঁর সাধনার সিদ্ধিপথের সহযাত্রিণী

করেছে? নাকি সেবাদাসীর বদলে নারীত্বের মর্যাদা দিয়ে নিজের মর্যাদার গৌরব বৃদ্ধি করেছে?

যমুনা যে তাঁকে শুধু তুমি বলতো তাই-ই নয়। মাঝে মাঝে শাসনও করতো। না—এতো নেশা করা চলবে না। নেশা না করলে কি লেখা বার হবে না? না আমাকে ছোঁবে না। আগে আমাকে ছুঁয়ে বলো আর এসব খাবে না। বলো। জড়ানো গলায় জবাব দিতেন স্বামী—'না-না-না। নেশাই আমার সব। নেশা না করলে আমি বাঁচবো না।' তারপর একটু ধস্তাধস্তির শব্দ, তারপর আবার সেই জড়ানো গলায় আক্ষেপ অভিযোগ। 'আমার মনের দুঃখ তোমরা কেউ বুঝবে না, কেউ না—কেউ না' তারপর যন্ত্রণাদগ্ধ মানুষের মতো ভেঙে পড়ার কান্না।

আমি রাতের অন্ধকারে উঠোনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসব শুনতাম। তাঁর এসব কথা শুনে আমার খুব কষ্ট হতো। ভাবতাম থাক্ থাক্, যমুনা যদি তাকে একটু ভালো করতে পারে করুক। একটু তৃপ্ত করতে পারে করুক। আমি বাধা দেবো না। ছুটে গিয়ে বলবো না 'স্বামীকে আমিই ভালো করবো! তুমি কে? সরে যাও এখান থেকে।' না এসব আমি কিছু করিনি। যমুনার হাতে নিঃসংশয়ে তাঁকে সঁপে দিয়ে চলে আসতুম।

একদিন দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে পান মুখে দিয়ে খাটের ওপর মেয়ের পাশে এসে বসলাম। মেয়েটা ঘুমোচ্ছিল। তার মাথার কাছে বালিশে হেলান দিয়ে যমুনা একটা মাসিক পত্রিকা পড়ছিল। আমি গিয়ে বসতেই সে হঠাৎ মুখ তুলে আমার মুখের পানে নিবিষ্ট হয়ে চেয়ে রইল। তার অমনি তাকানো দেখে আমার হাসি পেলো। কী দেখছে ও আমার মধ্যে? পুরুষ মানুষ হ'লে কথা ছিল। একটা মেয়ে আরেকটা মেয়ের মুখের পানে অমনি করে তাকিয়ে কি দেখতে পারে? আমার প্রশ্ন করার আগেই সে বললো, 'ইস্, তুমি কি সুন্দর দিদি! ঠিক যেন লক্ষ্মী ঠাকরুণ। পান খেলে তোমাকে অদ্ভুত সুন্দর লাগে।' আমাকে তার ভালো লাগায়—আমার মুখে তৃপ্তির ছবি ফুটে উঠেছিল হয়তো? 'অদ্ভুত সুন্দর লাগে' কথাটা শুনে লজ্জায় কুণ্ঠিত হয়ে মুখ নামিয়ে বললাম—'সুন্দর না ছাই! এ সব মিছে কথা।' যমুনা থাকতে পারলো না। উঠে এসে আমার মাথাসহ সমস্ত মুখটা তার সুউচ্চ বুকের মাঝখানে চেপে ধরে ভালোবাসা ও স্নেহের আবেগে বললে, 'না না, তুমি সত্যি সুন্দর দিদি। বিশ্বাস কর। আমি একটুকু মিথ্যে বলছিনে। শুধু সুন্দর-ই নও তুমি ফুলের পাপড়ির মতো নরমও।' বলে আমার থুতনি সহ গালে হাতের চেটোতে চেপে ধরে একটা অদ্ভুত যৌন তৃপ্তি পেয়ে যেন ছেড়ে দিয়ে সরে গেলো।

আমি তার এই অদ্ভুত অস্বাভাবিক আচরণে যেন বিহ্বল হয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ সময় গেলো আমার উদ্দাম রক্তস্রোতকে স্বাভাবিক করতে। যমুনার জবরদস্ত উষ্ণ আলিঙ্গনে আমার কি একটা অন্য অনুভূতি হয়েছিল? হয়েছিল বোধ হয়। তা-ই বুকের ভেতর একটা ধপ্ ধপ্ আওয়াজ অনুভব করছিলাম। তাই সময় লাগলো প্রকৃতিস্থ হতে।

ও ঘরে তিনি ঘুমিয়ে না জেগে আছেন জানি না। তবু সাবধানে গলা নামিয়ে যমুনাকে বললাম—তোমার মাস্টারমশাইকে জিগ্যেস করো তো যমুনা—কিসের জন্য তিনি এতো নেশা করেন ?

—এ আর জিগ্যেস করার কি আছে দিদি। পুরুষ মানুষ মেয়ে মানুষের কাছ থেকে বড় দুঃখ না পেলে সহজে নেশা করে না। বলে আমার মুখের পানে বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে মুখ নামিয়ে নিল যমুনা। যমুনার এই তাকানোর অর্থ আমি বুঝতে পেরেছিলাম—আমিই যে এ জন্যে দায়ী। আমার কাছ থেকেই তিনি আঘাত পেয়েছেন। বিয়ের আগে নাকি তিনি কোনদিন মদ স্পর্শও করেননি। যে সময়ে যে বয়সে পুরুষরা অধঃপাতে যায়—সে সময় তিনি নাকি দেবতুল্য চরিত্রের মানুষ। বিয়ের কিছুকাল পর থেকেই নাকি তাঁর অধঃপাত শুরু হয়েছে—কাজেই এ জন্যে আমিই দায়ী। যমুনা এমন কথা কথাচ্ছলে অনেকদিন ঠারে ঠোরে শুনিয়েছে। কিন্তু অভিযোগ করেনি। আজ তার অকস্মাৎ ভাবাবেগ ও এই মুহূর্তের চাহনি সামঞ্জস্যহীন হলেও আমি নিঃসন্দেহ যে সে বলতে চাইছে আমি ই দায়ি।

কিন্তু কেন আমি দায়ী! ভগবান সাক্ষী—কোনদিন আমি তাঁকে কোন রূঢ়কথা বলিনি। বরং তাঁর সমস্ত অনাসৃষ্টি তো আমি মুখ বুজে সয়ে গিয়েছি। তাঁর তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য খামখেয়ালিপনা কোনও কিছুরই প্রতিবাদ করিনি।

হ্যাঁ প্রতিবাদ করেছিলাম একবার। কিন্তু সে প্রতিবাদ বাঙালি বধূর প্রতিবাদ। বিয়ের পর তিনি যখন তাঁর আকাশ-কুসুম রচনার জন্যে আমাকে নিয়ে তাঁর মা-বাবা-ভাইদের থেকে আলাদা হয়ে থাকার কথা জানালেন, সেদিন বলেছিলাম, 'আমার মাথায় কলঙ্কের বোঝা না চাপালে কি চলে না।' তিনি আমার কথা গ্রাহ্য করলেন না। তারপর একদিন বাড়ি ছেড়ে আত্মীয়-স্বজন থেকে সরে এসে গঙ্গার ধারে ভাড়া নিলেন দোতলার এক ফ্ল্যাট। সেই ফ্ল্যাটে চাঁদের হাট বসালেন। সেই হাটের চা জলখাবারের চাহিদা মেটাতে আমি প্রাণান্ত। পয়সার অভাব তখন বড় একটা ছিল না, শিক্ষকতা করেন কলকাতার কোন কলেজে। তা ছাড়া নানা কাগজে লিখেও বেশ দু'পয়সা আয় করেন। কলেজের কাজে অনেক সুবিধে। সময় থাকে ঢের। বছরের বেশীর ভাগ সময়ই তো চলে যেতো পার্টি রাজনীতির চর্চা ও সাহিত্য করে। সকালটায় বড় আড্ডা জমতো ছেলেদের। মেয়েরাও আসতো। কলেজ থাকলে বিকেলে বাড়ি ফিরতেন সাতটা আটটায়। সঙ্গে দু'চারজন ছাত্র-ছাত্রীও থাকতো। তাদের নিয়ে কি পড়াতেন জানি না। তবে ইংরেজী ও বাংলা কবিতা আবৃত্তি শুনতাম পাশের ঘর থেকেই। অনেকদিন ছেলেরা চলে গেলেও মেয়েদের কেউ কেউ থেকে যেতো ন'টা সাড়ে ন'টা পর্যন্ত। আমার খুব দুঃখ হতো—মেয়েদের কেউ আমাকে সাহায্য করা দূরে থাক কথা বলতেও আসতো না। ওদের মুখ দেখতাম শুধু চা জলখাবার অর্ডার জারি করার সময়।

কিন্তু যমুনার অভিযোগটা কোনো মতেই মেনে নিতে পারছিলাম না। তবে এই অপবাদের আঘাতটা আমাকে বেদনাই দেয়নি—তীরবিদ্ধ যন্ত্রণাও দিয়েছে। পুরুষ নারীর কাছে কী চায়—এ প্রশ্নের গভীরে কোনোদিন যেতে চাইনি, উলটে আমার মধ্যে কি আমার অনন্য রূপের জন্য একটা অহংকার প্রচ্ছন্ন ছিল না? যার দরুন আমার মনের অনুসন্ধিৎসু চোখের ওপরে অন্ধত্বের ঠুলি চেপেছিল? পুরুষের মধ্যে নারীর কোন্ কামনার ধন লুকিয়ে আছে তাও কি আমি খোঁজ করেছি কোনোদিন? যে সত্য ও সুন্দরকে উদ্ঘাটিত করে জীবনে প্রতিষ্ঠা করার জন্য মানুষ যুগ যুগ ধরে প্রয়াসী হয়েছে, আমি তার বিন্দুমাত্রও খবর রাখিনি। শুধু নিজের রূপের ডালি তাঁর কাছে উপেক্ষিত বলে মিছে অভিমানে কেঁদেছি।

যমুনা আজ আমার চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল সেই অজ্ঞাত ত্রুটিটা। কিন্তু তা যতই আমার কাছে অস্পষ্ট হোক ওখানেই যে কোন সত্য নিহিত রয়েছে সেকথা যেন ক্রমেই বিশ্বাস হ'তে লাগলো। তার এই উপকারের কথা আমি কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করে একদিকে যেমন নিজের ত্রুটি অনুসন্ধানে আগ্রহী হয়ে উঠলাম। অপরদিকে তাকে আরো গভীর বিশ্বাসে স্বামীর দিকে—বলতে গেলে অসতর্ক হয়েই ঠেলে দিয়েছিলাম। সে তাকে শোধন করুক। সেদিন কি জানতাম কবি সাহিত্যিক শিল্পীদের মনের রাজ্যের রাণী হওয়া কোনো মানবীর পক্ষেই সম্ভব নয়। ওঁরা যে শত সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নারীর অংশ নিয়ে তৈরী করেন তাঁদের পিয়াসী প্রিয়াকে। সে কথা আমার জানার উপায় ছিল না কোনো মতেই। কিন্তু সে কথা থাক। যা বলছিলাম—সেই ফ্ল্যাটের কথা। সেই চাঁদের হাটে একদিন হাজির হলেন চিন্ময়ীদেবী, যিনি তাঁর বিপ্লবী জীবনের অজ্ঞাতবাসের আশ্রয়দায়িনী। চিন্ময়ীদেবীকে দেখে আমার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠলো। কড়া নাড়া শুনে আমিই গিয়ে দরজা খুলে দিলুম। আমাদের বড় ঘরটায় তখন ছেলে-মেয়েতে আট দশজন। সেদিন লুচি নয়—মাংস পরোটা। মাংস রান্না হয়ে গেছে। পেঁপের চাট্নি চাপিয়ে নিঃশ্বাস নিচ্ছিলুম। নিচের ফ্ল্যাটের কাজল আমাকে সাহায্য করতে এসে ময়দা চালছে—ঠিক সেই সময়ই কড়া নাড়ার শব্দ পেয়ে ছুটে গিয়েছিলাম। নিশ্চিতভাবেই আমার চোখে-মুখে রাঁধুনির ছাপ ছিল। চিন্ময়ী বললেন তোমাদের বাবু বাড়ি আছেন। আমি তাঁর প্রশ্ন শুনে বিস্মিত হইনি। কারণ পরনের আধময়লা আটপৌরে শাড়ি আর আগুনের তাপে ঘাম কালিতে ঝলসে যাওয়া মুখ, অবিন্যস্ত চুল ও নিরাভরণ দেহ দেখে নিশ্চয়ই আমাকে নীলাঞ্জন চৌধুরীর স্ত্রী মনে করা যায় না। মাথা নেড়ে বললাম—'আছেন কিন্তু' বলে থেমে গিয়েছিলাম। আমি জানতুম—এ সময় তাঁকে ডাকলে তিনি বিরক্তবোধ করেন।

চিন্ময়ীদেবীকে কোনোদিন দেখিনি। নাম যেন কোথাও শুনেছি শুনেছি মনে হলো কিন্তু তাঁর দীর্ঘ বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারা দেখে না করতে পারলাম না। যদিও স্বামীর স্পষ্ট নিষেধ আছে—খুব চেনা-জানা লোক না হলে সাফ কথা 'বাড়ি

নেই' বলে বিদেয় করে দেওয়া। দিই-ও। কিন্তু চিন্ময়ীকে পারলাম না। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার ভেতরটা শুধু কেঁপেই ওঠেনি,—আমি যেন কেমন আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম। মিথ্যে কিছুতেই মুখ দিয়ে বার হয়নি। বলতে পারলাম না তিনি বাড়ি নেই। তাই কথাটা বলে 'কিন্তু' বলে থেমে গেছলাম।

ফ্ল্যাটে ঢুকেই ডান পাশের মাঝারি সাইজের ঘরখানি বৈঠকখানা। বৈঠকখানা আর পাঁচজনের যেমন থাকে তেমন নয়। জানালা দরজায় কোনো পর্দা নেই তবে জানালাগুলোতে সার্সি আছে। মাঝখানে ডিনার টেবিলের মতো বড় গোল একটি টেবিল আর তার চারপাশে পায়ায় খিল আঁটা হাতলছাড়া গোটা দশেক চেয়ার। দক্ষিণের জানালার পাশে একখানি সতরঞ্চিতে ঢাকা সিঙ্গেল সাইজের একখানি তক্তাপোষ। দেয়ালে দেশ-বিদেশের বীরপুরুষদের ছবি—তাও আট দশটা। উত্তর দিকের কোণে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে কেরাণীদের ব্যবহৃত একখানি পাইন কাঠের কাচ-বিহীন বন্ধ দরজার আলমারি। যুদ্ধের শেষে নিলামে কেনা মাল। এখন ওটাতে স্বামীর স্বরচিত পাণ্ডুলিপি। সর্বক্ষণ তালা লাগানো থাকে। দেখলেই বোঝা যায় এটা একটা আড্ডা দেওয়ার ঘর। অথচ আজ এঘরে আড্ডা নেই। বৈঠকখানা ঘরের দুই পাশেই লনের মতো ফাঁকা জায়গা। প্রয়োজন হলে আড্ডা-ঘর থেকে বের হয়ে এসে রেলিংয়ের গায়ে হেলান দিয়ে দু'জনে মিলে পরামর্শ করা যায়। আর বাঁদিকের লন পেরিয়ে গেলেই বাথরুম ইত্যাদি। তারপর তথাকথিত কিচেনরুম—আমার ভাষায় রন্ধনশালা। কাঁচা ঘর হলে বলতাম রান্নাঘর। ফ্ল্যাট বাড়ি কিনা, তাই কিচেনরুম—রন্ধনশালা।

বৈঠকখানার পাশের – মানে পরের ঘরটা ড্রইংরুম। সেটা পার হলে আমাদের শোবার ঘর। বেশ বড়। দু'পাশে দু'টো খাট। দেয়ালে দু'একটা উর্বশীজাতীয় মহিলার ছবি আর ক্যালেণ্ডার। এক পাশে দুটো সেগুন কাঠের রুচিশীল আলমারী বই, জামাকাপড় ও খেলনায় ঠাসা। সাজানো ঘরের মেঝেতে কয়েকখানা পাটি পেতে বসেছেন কবি আর হবু কবি-কবিনীদের আসর। সেই আসরের মধ্য-মণি আমার পতি পরমগুরু শ্রীযুক্ত নীলাঞ্জন চৌধুরী। নিচেতলার সুমথবাবুর মাতৃহারা কাজলকালো ভাগনি আর আমি ওদের পরিচারিকা।

আমি বলতে যাচ্ছিলাম ডেকে দেবো? কিন্তু তিনি আর অপেক্ষা না করেই আমাকে পাশ কাটিয়ে চেনাজানা মানুষের মতো ঢুকে বৈঠকখানায় উঁকি দিয়ে ফাঁকা দেখে—বোধহয় ভেতরের কলবল শব্দ শুনে কড়িডোর দিয়ে তরতর করে একেবারে আড্ডাখানায় গিয়ে হাজির হলেন। আমি নিজেকে আড়াল রেখে পিছু পিছু গিয়ে-ছিলাম। দেখলাম—এদিকে মুখ করে বসা মালতী ও লাবণ্যর চোখ বিহ্বলতার ছাপ নিয়ে নিঃশব্দে নিষ্পলক হয়ে তাকিয়ে আছে চিন্ময়ীকে দেখে। আমি চিন্ময়দেবীর পেছনে দরজার পর্দার আড়ালে—কাজেই তাঁর চোখে মুখে কী প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল জানি না। তবে মালতী ও লাবণ্যকে অনুসরণ করে অজয় ও অনুরাধাও নির্বাক হয়ে

গেল। পাশবালিশে হেলান দিয়ে সুপ্রকাশ ও অরুণ বোধ হয় আলোচনার গভীরে ডুবে গিয়ে ঘুমিয়েই পড়েছিল। ওদের বয়স কম না হলে হয়তো কাব্য সাহিত্যে ফ্রয়েডের প্রভাব-এর মতো এমন একটা রসাল বিষয়ে আলোচনার আসরে ঘুমিয়ে পড়তো না। কিন্তু শ্রোতাদের কেউ কেউ প্রেতদর্শনের মতো চেতনাহীন হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে আমার স্বামীদেবতা পেছনে ঘাড় ফিরিয়ে এক ঝটকায় হবু কবিনী তৃপ্তিসেনের আলুলায়িত কেশদামসহ মাথাটি নিজের জানু থেকে দ্রুত সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে চিন্ময়ীদেবীর পানে একপলক তাকিয়ে বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন, 'দিদি আপনি?'

—'হ্যাঁ আমি-ই!' চিন্ময়ীদিদির মুখ দেখতে পাইনি কিন্তু শুনতে পেলাম তাঁর দৃঢ় কণ্ঠের উক্তি।

স্বামী কাচুমাচু হয়ে বললেন, 'কী করে আমার ঠিকানা জানলেন। আগে যদি··'

'আগে চিঠি দিইনি, যে ভাবে বিশ বছর আগে আদর্শ অনুসারি ছিলে,—প্রফেসর হয়ে কলেজে মাস্টারী করেও তার বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন ঘটেনি এই খবর পেয়েছিলাম বলেই।' চিন্ময়ীদেবী পরক্ষণেই পুনরায় বললেন, 'তোমার কি খুব অসুবিধা হলো?' আমার পতি পরম গুরু বশংবদ-এর মতো হাত কচলিয়ে অপরাধীর মতো প্রায় অস্ফুট ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন—'না না, অ-সু-বি···।' ইতব্যসরে আসরের তৃপ্তিসেন ছাড়া আর সবাই একে একে চুপি চুপি উধাও হয়ে গেলো।

ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে এখানে উঠে আসার পর তৃপ্তির ঘনিষ্ঠতা অতিমাত্রায় বেড়ে গিয়েছিল। তিনি যতক্ষণ বাড়ি থাকতেন ততক্ষণ তো বটেই কোনো কোনও দিন তারপরও থেকে যেতো। আমাকে দিয়ে বলতে গেলে সমস্ত ফ্ল্যাটটি ধোয়া মোছা করিয়ে নিতো। বালিশের আর বিছানার চাদর—মানে ফরাসটাও মাঝে মাঝে কাচিয়ে নিত। আমি যেন বাড়ির ঝি। তৃপ্তিই গিন্নি। কবি-সোহাগিনী। ভাগ্য ভালো সে খুব বড়লোকের মেয়ে ছিল না। তাই অর্থ দিয়ে বশীভূত করতে পারেনি। কিন্তু রূপের বাহার ছিল। দেখতে অনেকটা শুক্লপক্ষের চতুর্দশী চাঁদের মতো অস্ফুট। চোখে মাদকতা আছে। নিচের ঠোঁটের বাঁপাশে একটা কালো তিল। ঠোঁটের দু'পাশের কোণ কামিনীফুলের পাপড়ির মতো বাঁকা। পুরুষকে বধ করার সব অস্ত্র নিয়েই যেন জন্মেছে সে? রবীন্দ্রনাথের কবিতা অনর্গল আবৃত্তি করতে পারে। গান গাইতেও জানে। সে নাকি একসময় বেথুনে পড়েছিল। একথাও শুনেছি আর্টসের প্রফেসর ছাড়া কাউকে বিয়ে করবে না। কিন্তু একজন অধ্যাপকের বাজারদর তো কম নয়। তৃপ্তির বাপ ভাই নাকি অত দর দিয়ে বর খরিদের ক্ষমতা রাখে না। তাই বোধ হয় সে দুধের সাধ ঘোলে মেটায়।

চিন্ময়ীদেবীর বয়স কত বলতে পারবো না। তিনি সমস্ত ঘরখানি এক নজর দেখে নিয়ে ধীরে ধীরে মেঝেতে ঢালাও বিছানার পাশে চেয়ারে গিয়ে বসলেন এবং আমার স্বামীকেও পাশের চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করলেন। কাজল অবশ্য এরই মধ্যে

এক ফাঁকে চা-মামলেট খাওয়া এঁটো বাসনগুলি দ্রুত সরিয়ে নিয়েছে। চিন্ময়ীদেবী বসে একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে চেপে ত্যাগ করলেন। তিনি সহজে কথা বলছেন না দেখে—বিশ্বাস করুন আমারও ভয় করছিল। কি জানি কে এ মহিলা। তিনিই যে চিন্ময়ীদেবী মনে হলেও এ কথা তখনো জানতাম না। স্বামীর কাছে গল্পছলে যাঁর কথা শুনেছি, তাঁর বয়স ও রূপের কথা কখনো শুনিনি। গুণের কথা কিছু কিছু শুনেছিলাম মাত্র। শ্যামাকালীর মতো রূপ, সুঠাম দেহের গঠন। মাথার বিনুনীটা খুলে দিলে বোধ হয় শ্যামাকালীর মতোই দেখাবে। পরনে চকোলেট রংয়ের চওড়া-পাড় সাদা খোলের তাঁতের শাড়ি। সাদা ব্লাউজ। ঐ সামান্য পোশাকে তাঁকে অসমান্য দেখাচ্ছিল। টেবিলের গোছানো কাগজপত্রগুলো নেড়েচেড়ে আবার গোছাচ্ছিল তৃপ্তি। চিন্ময়ী এক পলক ওর দিকে তাকিয়ে স্বামীকে প্রশ্ন করলেন—এটি কে নীলাঞ্জন।

—'আমার ছাত্রী', উত্তরটার জন্যে তৈরী ছিলেন না স্বামী—তাই একটু থতমত খাওয়ার মতো করে জবাব দিলেন।

—ও। আর যারা চলে গেলো ?

এরাও আমার ছাত্রছাত্রী। এবার আমার স্বামী অনেকটা সহজভাবে জবাব দিলেন।

—ও বুঝি এখানে থাকে ? তোমার বৌ কোথায় ? বৌ বুঝি বাপের বাড়ি ?—একসঙ্গে তিনটি প্রশ্নের জবাব দিতে আমার স্বামী হিমসিম খেয়ে গেলেন।

একসঙ্গে তিনটি প্রশ্নের জবাব তিনিও প্রায় এক সঙ্গেই দিলেন—না না। ও তো এখানেই আছে। দাঁড়ান আমি ডেকে দিচ্ছি বলে তৃপ্তিকে বললেন, তোমার বৌদিকে ডেকে নিয়ে আসো তো। আমি সরতে পারলাম না। পর্দার আড়াল থেকে কপাটের আড়ালে যেতে পারলাম না। কারণ কপাট তো ঘরের ভিতর। আড়িপাতা ভীষণ অপরাধ। একথা জেনেও আমি আড়িপেতে সব শুনেছি। আর আর গেঁয়ো মেয়েদের মতো এ অপরাধ আমিও করি, কিন্তু চোর ধরার মতো সোরগোল করি না। এমনকি প্রতিপক্ষকে জানতেও দিই না যে আমি সব শুনেছি। সব জেনেছি। অর্থাৎ আমি যে প্রয়োজন হলে গোয়েন্দাগিরি করতে পারি একথা প্রতিপক্ষকে ভাবতেও সুযোগ দিই না। আমার আড়িপাতা শুধু নিজেকে বিপদমুক্ত রাখার কাজেই ব্যবহার করি। এ কথা বলতে পারেন—আপনাদের সভ্য শিক্ষিত সাহেব চালাক লোকদের হাত থেকে গেঁয়ো অশিক্ষিত মেয়ের আত্মরক্ষার এ একটা কৌশল মাত্র। কিন্তু তাও বোধহয় হলো না। ধরা বুঝি পড়েই গেলাম। ভাগ্যিস তৃপ্তি আমাকে খুঁজতে প্রায় উর্ধ্বশ্বাসেই ছুটছিল। আমি সেই লহমায় পর্দার অর্ধেকটা টেনে নিজেকে ঢেকে ফেলেছিলাম। ও রান্নাঘরের দিকে চলে গেলে আমি ডানপাশ দিয়ে বৈঠকখানা ঘরের দক্ষিণের রেলিং ধরে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম। তৃপ্তি প্রায় হন্তদন্ত হয়ে এদিক ওদিক খুঁজতে খুঁজতে বৈঠকখানার জানালা দিয়ে আমাকে দেখে অনীচু কণ্ঠে অথচ মুখ খিঁচিয়ে বললে—ওমা—বৌদি তুমি এখানে ? শিগগির এসো তোমাকে ডাকচেন ওঘরে।

আমার আতঙ্ক উপস্থিত হয়েছিল আগেই। সেটাকে চেপে হাঁদারামের মতো বললাম, 'আমাকে ?'

'হ্যাঁ তোমাকে।' বলে তৃপ্তি আমাকে না ছুঁয়ে আমার কাঁধের কাপড়টা ধরে টেনে বললে, 'চলো চলো।'

সত্যি কথা বলতে কি এভাবে এ নোংরা অবস্থায় ওঁদের সামনে যেতে আমার নিজেরই নিজের ওপর ঘেন্না হচ্ছিল। সারা গায়ে প্যাচ্ প্যাচ করছে ঘাম, ময়লা আটপৌরে শাড়ি। মাথায় চিরুনি পড়ে নাই তিন চারদিন। সিঁথিতে সিঁদুর না থাকার মতো। দেখলে বলতেই হবে এটা নীলাঞ্জন চৌধুরীর স্ত্রী নয়—ঝি। উপায় নেই। গেলাম ঐ ভাবেই। তৃপ্তি আমাকে টানতে টানতে নিয়ে গেলো।

ঘরে গিয়েই স্বামীর চোখে চোখ পড়লো। আমার মনে হলো তিনি আমার উপর ভীষণ অসন্তুষ্ট। সম্ভবত আমার পোশাক আশাক দেখেই।

স্বামী আমাকে চিন্ময়ী দেবীর সঙ্গে পরিচয় করে দিয়ে বললেন—এই আমার চিন্ময়ীদি। যিনি আমাকে বহু বিপদ থেকে বাঁচিয়েছেন। ওঁর কথা তোমাকে অনেক 'দিন বলেছি'—। চিন্ময়ীদি আমার দিকে এক পলক তাকিয়ে বললেন রান্না করছিলে বুঝি ? আমি নিঃশব্দে তার পায়ের ধুলো নিতে গেলাম কিন্তু তিনি তা দিলেন না। আমাকে দু'হাতে দুই বাহুমূলে ধরে তুলে নিয়ে টেনে বুকের মধ্যে চেপে রাখলেন।

আপনি কি বুঝতে পারছেন তখন আমার কী অবস্থা ? বুঝতে পারবেন না। আপনারা পুরুষ মানুষ। নারীর মতো দুঃখ-বেদনা-অপমান কোনো পুরুষ মানুষই কোনদিনই বুঝতে পারবেন না। কারণ এমন অভিজ্ঞতা পুরুষের জীবনে কোনোদিনই আসবে না। আপনি হয়তো বলবেন এটা আমার হীনমন্যতাবোধ। আমি বলবো—না কিছুতেই না। আপনি বলবেন—এটা যুগযুগান্তরের সংস্কার। জগতের আরো পাঁচটা বস্তু ও প্রাণী যেমন মানুষভোগ্য—সংসারে স্ত্রীজাতিও তেমনি পুরুষভোগ্য এমন একটা ধারণা নিয়েই জগতের সমস্ত নারী জন্ম নিয়ে বড় হয়ে ওঠে। তার সারাটা জীবনই যায় পুরুষকে তৃপ্ত করতে। বলবেন, তার জন্যই তার সৌন্দর্য চর্চা। পুরুষ ছাড়া নারী নিরর্থক। আপনি একথাও বলতে পারেন—পুরুষের হাতে আর্থিক ক্ষমতা থাকার ফলেই মেয়েদের মনে এমন একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে। আপনার এসব যুক্তি আংশিক সত্য হলেও এজন্য পুরুষই দায়ী। গায়ের জোরে সমাজ বিন্যাস করতে গিয়ে নারীকে সে কোনোদিনই ভোগ্যবস্তুর চেয়ে বেশী মর্যাদা দেয়নি। যখন যেটুকু দিয়েছে তা তার নিজের মর্যাদাবৃদ্ধি বা রক্ষার জন্যই দিয়েছে। আপনি কি আমার এই যুক্তি অস্বীকার করবেন ? কিন্তু সেকথা থাক। যা বলছিলাম—চিন্ময়ীদির বুকের মধ্যে চেপে থাকার সময় আমার যেন মনে হয়েছিল—আমার আর ভয় নেই আমার সমস্ত বিপদ কেটে গেছে। তিনি আর আমাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করবেন না। কিন্তু আমার রান্না কালিঝুলি মাখা ঘামে ভেজা শরীরটা

চিন্ময়ীদির ধবধবে সাদা শাড়িটায় চেপে থাকায় আমারই লজ্জার সীমা ছিল না। ছেড়ে দিলেই দেখা যাবে ঘাম ও কালি লেগেছে তাঁর কাপড়ে। ছাড়া পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে পালাচ্ছিলাম—কিন্তু পালাতে পারলাম না। চিন্ময়ীদি খপ করে হাতটা ধরে বললেন, 'পালাচ্ছো কেন—দাঁড়াও।' আমি মাথা নিচু করেই রইলাম। তিনি তার ব্যাগ খুলে একটা বেশ মোটা ধরনের লকেট সুদ্ধ নেকলেস গলায় পরিয়ে দিয়ে আমার চিবুক ধরে তার মুখের পানে তুলে বললেন—'দ্যাখো নিলু কি সুন্দর ও।' স্বামী হার মানলেন না। বললেন—'হলে হবে কি থাকে তো নোংরা ভাবে।' আমি বক্তার দিকে তাকাতে চেষ্টা করেছিলাম। দেখলাম, তিনি তৃপ্তিকে ইশারা করে সরে যেতে বলছেন। আমার তাকানোর মধ্যে যে তার কথার প্রতিবাদ ছিল তা কাজে লাগলো না। কিন্তু ততক্ষণে বোধ হয় দিদির সোহাগে আমার অভিমানের পাথরটা কোথাও ভেঙে গিয়ে থাকবে—এবং তার ভাঙা ফাঁক দিয়ে অবরুদ্ধ অশ্রুধারা চুঁইয়ে চুঁইয়ে দুচোখের কোণ বয়ে বেরিয়ে আসছিল। চিন্ময়ীদি আঁচলে চোখ মুছিয়ে দিয়ে অবোধ বালিকাকে প্রবোধ দেওয়ার মতো করে বললেন—'সেকথা তো ঠিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকাটা তোমার নিজের ব্যাপার। পুরুষ মানুষ কি এসে তোমাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দেবে?' আমার প্রতিবাদ উপস্থিত না থাকায় স্বামীর প্রচ্ছন্ন তিরস্কার চিন্ময়ীদির মুখ দিয়ে সস্নেহ শাসনের সুরে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। আমি বলতে পারলাম না—এ জন্য আমিই পুরোপুরি দায়ী নই। বলতে পারলাম না, বাপের বাড়ি থেকে যতদিন তেল-সাবান-সিঁদুর-আলতা এসেছিল ততদিন আমি এমনটা থাকতুম না। বলতে পারলুম না, একান্নভুক্ত পরিবারে যতদিন ছিলুম, এসবের বড় একটা অভাব হতো না। মাথায় তেল সিঁদুর না পরলে শাশুড়ী বকতেন। না থাকলে ছেলেদের দিয়েই কিনিয়ে দিতেন। বলতে পারলুম না—যেদিন আত্মসুখের নেশায় যৌথ পরিবার দায়-দায়িত্ব এড়িয়ে আমাকে নিয়ে সরে এসে এখানে বাসা বাঁধলেন—সেই দিনই আমি বুঝতে পারলাম আমি আর চৌধুরী বাড়ির বৌ রইলাম না। ঝিয়ের জীবন শুরু হয়েছে। চিন্ময়ীদি বললেন—'যাও। তোমার রান্নাবান্না শেষ করে ভালো কাপড় জামা পরে এসো। আমি ততক্ষণ ওর সঙ্গে কথা বলছি।'

আমি চলে এলাম।

রান্না ঘরে এসে দেখি কাজল চলে গেছে, তার বদলে তৃপ্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে তাড়াতাড়ি কাছে এসে বললে দেখি দেখি কেমন জিনিসটা পেলে। খুলে দিলে বেশ করে দেখে ফিরিয়ে দিয়ে বললে—বেশ হয়েছে। আড়াই ভরি হবে। মেয়েদের খালি গলায় একদম মানায় না। সত্যি বৌদি তোমার কী ভাগ্য। জবাবে আমি বলেছিলাম—এখন আবার বাঁদরের গলায় মুক্তার মালা বলবে না তো?

আজ বলতে যখন বসেছি তখন সব কথাই বলি একটু ধৈর্য ধরে শুনুন।

আমার বিয়ের দেড় দু'বছরের ঘটনাটা আপনাকে আগে ভাগেই জানানো উচিত

ছিল ; জানাইনি কেন জানেন ? সে এক ঘেন্নার জীবন। এসব জানিয়ে কী লাভ।' আমাদের যৌথ পরিবারগুলো কেমন করে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো, আপনারা সবাই জানেন—কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল এ-এক সর্বনাশের ব্যাপার। প্রায় প্রতিটি যৌথ পরিবারই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে—এই বিশ শতকের মধ্যভাগে এসে আমাদের দেশের সমাজের মানুষেরা যেন নিশ্চিতভাবে জেনেও মনুষ্যত্ব হারানোর প্রতিযোগিতায় উঠে প'রে লেগে গেছে। আর এই মনুষ্যত্ববোধের অভাবেই যেন সমস্ত সমাজটা প্রচণ্ডভাবে ভাঙনের মুখে এগিয়ে চলেছে। মানুষ যেন আর মানুষের ওপর বিশ্বাস রাখতে পারছে না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধই কি বিশ্বমানবতার বিশ্বাসের মূলে ফাটল ধরিয়ে গেল ? অতি সামান্য তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করেই মানুষ যেন পশুর মতো কামড়া-কামড়ি মারামারি খুনোখুনিতে মেতে উঠতে এতটুকু ভাবে না ! চারিদিকে এসব দেখে শুনে আমি শুধু ভীত হতুমই না, বিস্মিতও হতুম।

একদিন দেখলাম আমার বাক্স থেকে আমার বাপের বাড়ি থেকে দেওয়া গয়নাগুলো উধাও হয়ে গেছে। কথাটা আমি কাউকেই বলতে পারলাম না শুধু শাশুড়ীকেই চুপি চুপি বললাম। শাশুড়ী একে একে সবাইকে, তাঁর সব ছেলেকেই বললেন। ব্যস্, আর যায় কোথা—বাড়িটা যেন গোমড়ামুখো হ'য়ে উঠলো। কেউ আর হেসে কথা বলে না। সবাই যেন সবাইকে সন্দেহ করছে অথচ মুখে কেউ কিছু বলছে না—মনে হলো কথাটা বলে আমি প্রচণ্ড অন্যায় করেছি। এ অন্যায়ের ক্ষমা নেই। একটা অবিশ্বাস যেন সমস্ত বাড়িটাকে তিলে তিলে গিলে খাচ্ছে। অভাব অনটনের মধ্যেও আমার শ্বশুরবাড়ি অন্যদের মতো গতানুগতিক ছিল না। নিচের তলায় বৈঠকখানায় প্রায় সব সময়ই তো লোকজনে গম গম করতো। দলের ছেলেরা মেয়েরা ছাড়া—তাঁদের শ্বশুরবাড়ির কত যে চেনা-জানা লোক আছে বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন আছে সে হিসেব দেবার ক্ষমতা আমার সেদিনও ছিল না, আজও না। তার বোধ হয় একটিই কারণ,—এবাড়িতে কারুর জন্যে কোনও স্বতন্ত্র ব্যবস্থা, কোনো বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না। এই অভিন্নতায় আমি মুগ্ধ হয়ে গেছলুম। আমার মনে হতো এই জন্যই পরিবারটিকে সবাই ভালোবাসে। এঁদের কারো মনে কোনো অভিসন্ধি নেই। সমাজ সাহিত্য রাজনীতি ইতিহাস এ বাড়ির সবার যেন অধীত, প্রিয় বস্তু। বামুন কায়েতের যেমন ভেদাভেদ নেই, তেমনি হিন্দু মুসলমানেরও আপ্যায়নে পার্থক্য ছিল না। বাড়ির ছেলেমেয়ে সবাই সহজ সরল। আমার শাশুড়ি তো কট্টর ব্রাহ্মণ বিধবা ছিলেন ; তাঁকেও দেখেছি হিন্দু মুসলমানের রায়টের সময়ও আশ্রিত মুসলমান ছেলেকে তাঁর নিজের ছেলেদের মতো যত্ন নিতে। গীতা, উপনিষদ-এ আসক্ত ঢাকার শাহআলমকে। আমার স্বামী ও দেওরদের পাশে বসিয়ে সস্নেহে খাওয়াতেন শাশুড়ী নিজে। এ বাড়ির শিক্ষাই ছিল বিশ্বাস ও ভালোবাসা। আমার খোয়া যাওয়া জিনিসের কথা বলতেই যেন বিশ্বাস ও ভালোবাসার মূলে কুঠারাঘাত পড়েছে। এজন্যে নিজেকেই অপরাধী ভেবেছিলাম।

একদিন আমি স্বামীর সামনে পড়তেই তিনি গম্ভীরভাবে বললেন—তোমার নাকি গয়নাগাটি চুরি গেছে? আমি মাথা নীচু করে পাশেই দাঁড়িয়েছিলাম। মাথা নেড়ে জানালাম, 'হ্যাঁ।'

—'বাক্স কোথায় ছিল?'

—'আলমারীতে।' এবার কথা বললাম—এবং তাঁর চোখের ভাব বোঝার জন্য একবার মুখ তুলে দেখেও নিলাম।

—'বাক্সে তালা থাকে না?'

—'না।'

তিনি জানেন আলমারি সবাই প্রয়োজন হলে খোলে। দেয়ালেই একটা পেরেকের মাথায় চাবি ছড়া ঝুলানো থাকে। এ বাড়িতে এই ঢের। এর চেয়ে বেশি সাবধানতার প্রয়োজন এতোকাল পড়েনি। সত্যিই তো এ বাড়িতে আমি এসেছি এক বছর। এর মধ্যে কোনোদিন কোন কিছু খোয়া যেতে শুনিনি। টাকা-পয়সা, গয়না-গাঁটি, বাসন-কোশন সবই এমনি খোলা পড়ে থাকে। ঐ ঘরে যে শাশুড়ীর সিন্দুক তাও তো এমনি খোলাই থাকে। ইঁদুর-উই পোকার ভয় ছাড়া এ বাড়ির কেউ চুরির কথা ভুলেও ভাবে না।

—'তোমার কাকে সন্দেহ হয়?' প্রশ্ন শুনে মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি তিনি আমার দিকে তাকিয়ে নেই। বাইরের দিকে তাকিয়ে আছেন। চোখে মুখে কোনো কৌতুহল নেই—যেন জিজ্ঞাসা করা নিয়ম; তাই করছেন। মনটা বিষিয়ে উঠেছিল—। এখানেও উপেক্ষা! সাগ্রহ বাস্তবতা নেই। ক্ষোভে দুঃখে 'কাউকেও নয়' বলে দ্রুতপায়ে সিঁড়ি বয়ে নীচে নেমে এলাম। আমার বাপের দেওয়া কিছু এবাড়ি থেকে খোয়া গেলে এ বাড়িরই দুর্নাম—এটা আমি বুঝেছিলাম বলেই গোপনে শাশুড়ীর কাছে বলেছিলাম। শাশুড়ী কথাটা একে একে সকলকে বলে কিছু ভুল করেননি। কারণ তিনিও তো জানেন—মেয়েরা অলংকার পরতে কী ভালোবাসে। তিনি আমার দুঃখ বুঝেছিলেন। আমি এই নিয়ে চিৎকার চেঁচামেচি না করলেও ভীষণ কষ্ট পাচ্ছিলাম। আর তিনি এটাও জানেন, ঐ উপরের ঘরে বাইরের কেউ কখনো আসে না, বসে না। বাড়ির ছেলে-মেয়েরাই যাওয়া-আসা করে। কাজেই তিনি তাঁর ছেলেদের জিজ্ঞেস করে ভুল করেছেন মনে করতে পারি না। বিশেষত যে দিন তাঁর কাছে চুরির ঘটনা বলি সেদিনই বিকেলে ঐ গহনার বাকসে—এখান থেকে আশীর্বাদ করার কানের দুলজোড়া ফেরত পাই। আমি যথেষ্ট অবাক হলেও আমার বুঝতে একটুও অসুবিধা হয়নি যে এটা আমাকে বোকা বানিয়ে ফেলার নির্বোধ প্রয়াস। কিন্তু যাই হোক, তক্ষুণিই আমি ছুটে গিয়ে বাসন ও দুলজোড়া শাশুড়ীকে জমা দিয়ে আসি। সেই থেকেই আমি অলংকারবিহীন নিঃস্ব। মাঝে মাঝে অলংকারগুলো যে ফিরে পাবো—এমন আশা আমার মনে জেগেছে। কিন্তু যেদিন ঐ অলংকার চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে নিঃশব্দে একটা স্নায়ুযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে এবং তার ক্রমবিস্তারের ফলে এই বৌদ্ধ

পরিবারটির ভাঙন সম্ভাবনা অনিবার্য হয়ে উঠেছে সেদিন আমার বাপমায়ের দেওয়া হারানো সম্পদ ফিরে পাওয়ার আশা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো। বলুন এত কথা কি তৃপ্তিকে বলতে পারি, না বলা উচিত। এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন—একান্নভুক্ত পরিবার থেকে সরে আসার দায়টা আমার ঘাড়েই তো পড়লো। আমি অপরাধ না করেও অপরাধী হয়ে রইলাম। আমার প্রাপ্য বা অধিকার নিয়ে কারো কাছে নালিশ করার বিন্দুমাত্র স্পৃহাও নেই।

আগে মাঝে মাঝে অলংকারগুলোর জন্য কান্না আসতো। বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাঁদতামও। এখন কাঁদি না।

তারপরের ঘটনাটা শুনুন। দিনকয়েক বাদে ঐ ফ্ল্যাট বাড়িতে চিন্ময়ীদি আরেকদিন আসেন। সেদিন শিব চতুর্দশী। সন্ধ্যে হয়ে গেছে বেশ অনেকক্ষণ। আমি দক্ষিণের লনে দাঁড়িয়ে গাছের এপাড়ে ওপাড়ে আলোর চুমকি পরা অন্ধকার দেখছিলুম। দুরন্ত বাতাস আমার মাথার কাপড় গা থেকে শাড়ির আঁচল অনেকক্ষণ খুলে নিয়েছিল। এখন পাটের গোছার মতো লম্বা চুল নিয়ে মেতে উঠেছে। আমি খানিক কেয়ারফুল কেয়ারলেসের মতো ঔদাসীন্য প্রকাশ করে বিমুগ্ধের মতো তাকিয়ে ছিলাম। হঠাৎ কাঁধে কার হাতের স্পর্শ পেয়ে তাকিয়ে দেখি কাজল। আমাকে চুপিচুপি বললে—তোমার সেই দিদি এসেছেন।

কোন্ দিদি! চিন্ময়ীদি! কই—কোথায়?

—'তাঁকে ওপরে উঠতে দেখে আমি পিছু পিছু এলাম। তোমাদের বৈঠকখানা ঘর ফাঁকা দেখে বড় ঘরে ওকে দিয়ে চলে এলাম। তিনি ওঘরেই গেছেন।' কাজলের কথা শুনে আমার ব্রহ্মতালু অব্দি শুকিয়ে গেলো। 'এ্যাঁ বলিস কি?' বলে তাড়াতাড়ি ওঘরে ছুটে গেলাম। চিন্ময়ীদি একটা অজানা অভাবনীয় দৃশ্য দেখে নিঃস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি টেবিলের ওপর থেকে একটা খালি ও একটা অর্ধেক খাওয়া বিলেতী মদের বোতল নামাতে গেলে চিন্ময়ীদি আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—থাক্, ওসব সরাতে হবে না। যেমন আছে তেমন থাক।

সোফার ওপর কাত হয়ে পড়ে থাকা—মদে আকণ্ঠ নিমজ্জিত স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন ওকেও ডাকতে হবে না। তুমি অন্য ঘরে নিয়ে চল আমাকে। কাজলকে সিঁড়ির দরজাটা এঁটে দিয়ে আসতে বলে চিন্ময়ীদিকে নিয়ে বৈঠকখানা ঘরে বসে আলো জেলে পাখা চালিয়ে তার কাছে এসে প্রণাম করে বসলাম। দিদির চোখে মুখে ঘৃণার ভাব কতকটা—তা আন্দাজ করার জন্যে তাঁর মুখের দিকে তাকাতেই তিনি মৃদু হেসে বললেন—'সেদিন তোমার নাম জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছলুম।'

আমি অস্ফুট স্বরে নাম বলে মাথা নিচু করে রইলাম।

তিনি আমার মাথাটা তুলে নিয়ে বললেন—'তুমি খুব বিব্রত হয়ে পড়েছো না?

আমার মনে আছে আমি হাসতে চেষ্টা করেছিলাম। পারিনি। বোধ হয় শুকনো হাসিতে বলেছিলাম—'না।'

—'না—নয়, সত্যি বল তো কি হয়েছে ?' চিন্ময়ীদিকে মিথ্যে বলতে পারলাম না। বললাম—'আমাকে বলেছিলেন সিঁড়ির দরজা বন্ধ রাখতে। কেউ এলে তাঁকে না জানিয়ে যেন কাউকে আসতে না দিই।' চিন্ময়ীদি কথা শুনে হো হো করে হাসলেন। আচ্ছা, তোমাকে 'আমিই বারণ করেছি বলে দেবো' বলে তিনি পরমুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে যান এবং আমাকে বলেন এ অবস্থা কবে থেকে চলছে লিপিকা ?

—আগে এ সব দেখিনি—এখানে এই ফ্ল্যাট বাড়িতে এসেই এসব শুরু করেছেন।

—তুমি বাধা দাওনি ?

আমি দিদির দিকে মুখ তুলে তাকাতেই তিনি বোধ হয় বুঝেছিলেন বাধা দেওয়ার শক্তি আমার নেই। তাই উত্তরের অপেক্ষা না করেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—'ঠিক আছে!' তারপরও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তিনি আমার কাছ থেকে অনেক কথা জানলেন—তৃপ্তি, লিলিরা কতরাত অবধি থাকে ইত্যাদি। প্রসঙ্গত দিদির কাছ থেকে আমিও জানলাম– আমার গহনা চুরি ব্যাপারটা কেন্দ্র করে নাকি ভাতৃবিরোধ চরমতম হয়ে এলে তিনি তার বাড়ির অংশটি প্রতিবেশী গাঙ্গুলীদের কাছে "বিক্রি কবলা" দিয়ে অগ্রিম পঁচিশ হাজার টাকা নিয়ে এসে ঐ ফ্ল্যাট নিয়ে পড়ে আছেন। কলেজ চাকরি-টাকরি কিছু নয়। চাকরি অনেক দিন আগেই ছেড়ে দিয়েছেন। বাড়ির বিক্রী টাকা ভেঙেই এখানে এই নবাবী চলছে।

সেদিন সন্ধ্যায় দিদির কাছে স্বামীর কীর্তিকথা শুনে যতটা লজ্জা পেয়েছিলাম তার চেয়ে ঢের বেশী শঙ্কিত হয়েছিলাম—সত্যি সত্যি ভিখারিনী হলাম বলে। পায়ের তলায় আর একরত্তি মাটিও নিজের বলে রইল না। নিখিল বিশ্বে একা। কিছুদিন আগে শাশুড়ী গত হয়েছেন দেওররা পৈত্রিক বাড়ি ছেড়ে যে-যার কার্যস্থলে চলে গেছে। অতবড় বাড়িটায় এখন আর কেউ নেই, শুধু সেই ফুলওয়ালী, নিচের একটা খুপড়িতে আগের মতোই আছে। ভোর রাতে ফুল তুলতে চলে যায় সে, আর ফিরে আসে সেই সন্ধ্যারতি সেরে রাধাগোবিন্দকে ঘুম পারিয়ে। সে রাধা গোবিন্দের আশ্রমেই নিত্য প্রসাদ পায়। সেই মুহূর্তে আমার মনে হয়েছিল শেষ বয়সে ঐ ফুল-ওয়ালীর মতো কি একটুকু নিশ্চিন্ত আশ্রয় পাবো না ? এ শঙ্কা আমার কেন হয়েছিল—সে কথাটা আপনাকে জানিয়েই নি—আমি শুনেছিলাম যারা খুব বেশী মদ খায় তাদের বুক ফেটে রক্তবমি হতে হতে মৃত্যু ঘটে। আমাদের গাঁয়ের রেবতী দারোগা তো মদ খেয়েই মরলেন। ভগবান না, করুন—তিনি যেভাবে আকণ্ঠ পান করতে শুরু করেছেন—কী জানি কী হয়।

কাজল চিন্ময়ীদির জন্যে চা নিয়ে এলো—কিন্তু তিনি খেলেন না। বললেন, 'আমি এসব কিছুই খাই না। দিনে একবার। বিধবাদের জন্য যা বিধান দিয়ে গেছেন শাস্ত্রকারগণ তার বেশী কিছুই না। রাত্রে ঠাকুরের চরণামৃতেই আমার সব পিপাসা মিটে।'

বসে বসে তাঁর কাছে পুরণো দিনের অনেক কথা শুনলাম—কি করে তাঁর সঙ্গে আমার স্বামীর পরিচয় ঘটেছিল সে সব কথা। তারপর এক টুকরো কাগজে দু'লাইন লিখে বললেন—'ওকে আমি ডাকবো না—ভীষণ লজ্জা পাবে। তুমি চিঠিখানি একসময় দিও। যদি পারি আর একদিন আসবো।' আমি প্রণাম করে সি'ড়ির গোড়া পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসেছিলাম। আমার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, 'তুমি কিছু ভেবো না, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

তিনি চলে গেলে আমি যেন ভারশূন্য হয়ে হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে ওপরে চলে এলাম।

তারপর একদিন বিনুদিই সেই তাসের ঘরের চাঁদের হাট ভেঙে দিলেন, বললেন, 'পৈতৃক ভিটেতে ফিরে যেতে হবে নীলাঞ্জন। দু'বছর সময় দিয়েছেন ও'রা। ধারের টাকা শোধ করতে পারলে তোমার বাড়ি তোমার হবে—অন্যথায় ও'রা আরো কিছু টাকা দেবেন—সে টাকা নিয়ে তোমায় চলে আসতে হবে—দলিল রেজিস্টারী করে দিয়ে।' পুনর্মূষিকো ভব। ফিরে এলাম পৈত্রিক ভিটেয়। কিন্তু সারা বাড়িটা আর এ বংশের রইল না। ভাইয়েদের অংশ ভাইয়েরা বিক্রী করে যে যার নতুন বাড়িতে চলে গিয়েছিলেন আগেই। এখন আমরা একা, ফুলওয়ালী ছাড়া এতবড় বাড়িটাই ফাঁকা। শুধু কবির ঘরটাতেই যা লোকজন আসে। ওপরের ঘরে আমরা দুটি প্রাণী। একদিন এক পূর্ণিমা রাতেই ওপরের ঘরের ছাদে পেয়েছিলাম—আমার মেয়েকে। জীবনে সেটাই আমার বাসর ঘর, সেটাই আমার শুভরাত্রি, আমার স্বর্গসুখ। আরো পাঁচটা মেয়ের মতোই আমার মধ্যে যে মা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা কুমারীত্বের আবরণে লুকিয়েছিল, সেদিনের সেই পূর্ণিমার ঢল ঢল জ্যোৎস্নায় সে নির্লজ্জ হয়ে দু'বাহু বাড়িয়ে আমার শিবপুজোর আরাধনার ফল, কামনার ধন, নিঙড়ে নিতে এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করিনি।

সদ্যপ্রস্ফুটিত ফুলের রেণুতে ভ্রমরের চরণস্পর্শ সেই প্রথম, সেই শেষ। জানেন, আজও সেসব কথা মনে পড়লে আমি যেন কেমন হয়ে যাই। কিন্তু সেসব কথাও থাক। তিনি আবার চাকরী নিলেন কলেজে। কিন্তু তিনটি প্রাণীর আটপৌরে জীবন চালাতে যেখানে হিমশিম খেতে হয় সেখানে দেনা-শোধ হবে কী করে? কলেজের পর যদি পয়সা নিয়ে ছাত্র পড়াতেন তা'হলে হয়তো কিছুটা সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু মানুষটাকে যারা জানে তারা বলবে ও'র দ্বারা কিছু হবে না। বাড়ি ঘর তো ছার। যেভাবে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়াই কঠিন। তিনি কঠিন পথেই হাঁটলেন। গাঙ্গুলীদের কাছ থেকে দশহাজার টাকা নিয়ে একেবারে সাফ্ কবলা রেজিস্ট্রি করে দিলেন পৈত্রিক ভিটে। তখনো বিনুদি কালীঘাটে ছিলেন। তাঁর কাছে ধরণা দিতে—তিনিই তাঁর আশ্রমের বিশ্বস্তকর্মী সমীরবাবুকে পাঠালেন একখণ্ড জমি কিনে মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দিতে। যে ক'দিন বাড়িঘর হয়নি সে ক'দিন আমরা রইলাম শহরতলীর একটা পোড়ো বাড়িতে। বাড়িটা যুদ্ধের সময়

মিলিটারী দখলে ছিল। তখনো দেশ ভাগের প্রায়শ্চিত্ত করতে মানুষ বাপ-পিতামহের ভিটে মাটি ছেড়ে এপারে আসতে শুরু করেনি। তাই ঐ টাকাতেই শহরতলীতেই দু'কাঠা জমিতে আড়াই কামরার একখানি এল প্যাটার্নের পাকা মেঝে ও পাকা দেওয়ালের অ্যাসবেসটসের ছাদ দেওয়া বাড়ি করে দিলেন সমীরবাবু।

পশ্চিম আর উত্তর ভিটেতে ঘর আর পূব-দক্ষিণ দিকটা জুড়ে রইল ফুলের বাগান। মাঝখানে ছোট্ট একখানি উঠোন। রান্না ঘরের দেওয়াল ঘেঁষে পেয়ারা ও ডালিম গাছ। এলের কোণাটায় যেখানে বাড়ি থেকে বের হওয়ার সরু নালি—ঠিক তারই গোড়ায় একটা মাধবী লতার গাছ—লকলকিয়ে উপরে উঠছে। রান্নাঘরের পাশেই পাতকুয়ো, বাথরুম ইত্যাদি। কবির পক্ষে বাড়িটা ভালোই। আশেপাশে তখনো অনেক বাড়ি-ঘর-লোকজনের বসতি হয়নি। বিদ্যুৎ ও খাবার জলের লাইন আসেনি। খাবার জল এখনো লোক দিয়ে আনতে হয়।

নতুন বাড়িতে এসে একটা নিঃসঙ্গ নিঃস্তব্ধতার মধ্যেই অভাব অনটনের সংসারটা ভাল চলছিল। কিন্তু তিনি কি নিঃসঙ্গ নিস্তব্ধতাব মানুষ? বিনুদি কালীঘাট থেকে পণ্ডিচেরী শ্রীশ্রীমায়ের কাছে চলে যেতেই আবার স্বমূর্তি ধরলেন। তবে এত কথা যখন বললাম তখন নোট লেখা, প্রবন্ধ লেখা—অর্থাৎ বাড়তি আয়ের পথ যা ছিল তা বন্ধ হয়ে গেলো একে একে। হাজির হতে লাগলো তাঁর গুণমুগ্ধরা। ধরা বাধা আয়ের অনেকটাই চলে যেতো বিলিতি মদের দোকানে আর তাঁর গুণমুগ্ধদের আপ্যায়নে। সংসারের জন্যে যা থাকতো তা' দিয়েই আমাদের দিন চলতো। আমার কায়িক শ্রম বেড়ে গেলো। গুঁড়োকয়লা আর গোবরের গুল পাকিয়ে কয়লার সাশ্রয় করতাম, সাবানের বদলে সোডা। মেয়েটার দুধ আধসের থেকে এক পোয়া করলাম—তা-ই চালবাটার সঙ্গে গুলে খাওয়াতাম। নিজে চা খাওয়া ছেড়ে দিলাম। এত করেও কুল পাচ্ছিলাম না।

সমীরবাবুর কথাটাই বাদ যায় কেন। সমীরবাবুর কথাটা এজন্যই বলা প্রয়োজন যে—তাতে যমুনার অভিযোগটাই সত্যি না অন্য মিথ্যাও সত্যি হয়ে আছে স্বামীর সেটাও পরিষ্কার হয়ে যেতে পারে। আপনারা অর্থাৎ পুরুষেরা প্রায় সকলেই বলেন—মেয়েরা কুচুটে ও হিংসুটে। সমস্বার্থসম্পন্না দুই রমণী একসঙ্গে থাকতে পারে না। একজাতীয় সাহিত্যিক আছেন তারা মেয়েদের সতীপনা ও দুই সতীনের ঝগড়া ছাড়া গল্প উপন্যাস লিখতেই পারেন না। তাঁদের সবার কাছে ও আপনার কাছে সমীর-বাবুর ঘটনাটা না বলা এক ধরনের পাপ ছাড়া কিছুই নয়। এইসঙ্গে এ-কথাও বলে রাখি যে সমীরবাবু ও আমাকে জড়িয়ে আমার স্বামী কোনদিন একটি কথাও বলেন নি। বাড়ি তৈরীর ব্যাপারে যখন সমীরবাবু আমাদের অস্থায়ী বাসায় মাঝে মাঝে আসা-যাওয়া করতেন তখন একদিন শুধু বলেছিলেন সমীরকে তোমার কেমন লাগে? আমার সাদা মনে কাদা নাই, বলেছিলাম—কেন ভালোই। এই বলার পর স্বামীর

চোখেমুখে কোন ভাবান্তরও দেখিনি। তা'হলে বুঝবো কি করে এ-কথায় তাঁর 'কিন্তু' আছে ? কিন্তু 'কিন্তু' যে আছে সেটা সমীরবাবুর কথায় পরে বুঝতে পেরেছি। নীলাঞ্জনবাবু সমীরবাবু ও চিন্ময়ী দেবীর সম্পর্কের কথাটা সমীরবাবুই বলেছেন। আমার দুর্ভাগ্যের কথা যে, এসব কথা শোনার পর চিন্ময় দেবী—যাকে বিনুদি বলি তাঁকে এবং পরে সমীরবাবুকেও আমরা হারিয়ে ফেলেছি। বিনুদি পণ্ডিচেরী চলে যাওয়ার পর সমীরবাবু চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন, 'নিলু তুই আমার ওপর মিছে অভিমান করে আছিস—কিন্তু আমার চিঠি পাওয়ার পরই যদি তোর এ ভুল ভেঙে যায় তখন আর আমাকে অনুশোচনা জানাতেও পারবি না। কারণ—আমি তখন রেঙ্গুনের উদ্দেশ্যে জাহাজে থাকবো ?' চিঠিখানি এসেছিল চট্টগ্রাম থেকে।

পুরো ঘটনা বলি শুনুন। তখন বর্ষাকালও নয়—ফাল্গুনের শেষ। আমরা সেই পড়ো বাড়িতে অস্থায়ী বাসিন্দা। এটাও সমীরবাবু সন্ধান করে দিয়েছিলেন—পতি-দেবতা তখনো চান করতে বেরোননি। ঠিক ঐ সময়ই বৃষ্টির জন্য ছাতা মাথায় সমীরবাবু এলেন নতুন বাড়ির কাজকর্মের কথাবার্তা বলতে। তখনো আমি সমীর বাবুর সামনে মাথায় ঘোমটা রেখে চলি এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলি না। আগে যে দু'-একবার তাঁকে দেখিনি-তা নয়। কিন্তু তিনি বাইরে থেকেই চলে গেছেন—ঘরে বসেননি। কারণ আমার মনে হয়েছিল—স্বামী তাঁকে খুব একটা আমল দিচ্ছেন না। কিন্তু সেদিন বৃষ্টিভেজা মানুষটাকে তো আর বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখা যায় না। ডেকে ঘরে এনে বসালেন। ঘরের যা বিশৃঙ্খল অবস্থা—লজ্জায় আমি মরে গেলাম। উপায়-ই বা কী। এত জিনিসপত্র, একটা ঘর আর ছোট্ট এক চিলতে বারান্দা। জায়গা কোথা !

স্বামী বললেন, 'ও যখন বৃষ্টি ভিজে এসেছে—এক কাপ চা করে দাও।'

যতক্ষণ বৃষ্টি ছিল ততক্ষণ ওঁরা কথা বললেন। আমি পার্টিশানের আড়াল থেকে ভদ্রলোককে দেখলাম—সুন্দর, সুপুরুষ। বয়স ও সৌন্দর্যের দিক থেকে ওঁদের মধ্যে আশ্চর্য সাদৃশ্য থাকলেও কথাবার্তা বেশ দূরত্ব বজায় রেখেই হচ্ছিল। আমার মনে হয়েছিল বাড়ি তৈরীর দায়টা যেন সমীরবাবুরই বেশী। কারণ তিনিই সব বলছেন, স্বামী 'হ্যাঁ হুঁ' ছাড়া বড় একটা বলছেন না। তারপরও সেই অক্ষয় তৃতীয়ার দিন পর্যন্ত দুই বন্ধুকে অনেকবার কথা বলতে দেখেছি শুনেছি কিন্তু কখনো প্রাণখোলা, মনখোলা কথাবার্তা বলতে শুনিনি। সেদিন বৃষ্টি মাথায়ই স্বামী ও সমীরবাবু বের হয়ে গেলেন শত অনুরোধেও উনি সমীরবাবুর ছাতার নিচে গেলেন না। অবশ্য বৃষ্টি খুব বেশী ছিল না। তবুও ভিজতে হয়েছে।

যেভাবেই হোক মাস দেড়েকের মধ্যে নতুন বাড়িতে উঠে যেতেই হবে। আঠাশে বৈশাখ অক্ষয় তৃতীয়া। তাই সমীরবাবুর বিশ্রাম নেই। প্রায় প্রতিদিনই তিনি কালীঘাট থেকে ছুটে আসেন এবং কাজ শেষ করে চলে যান। সেই ফাঁকেই মাঝে মধ্যে আমদের বাসায় আসেন—এবং তা তার বন্ধু বাড়ি থাকতেই। কেবল দু'দিন তিনি

তাঁর বন্ধুর অনুপস্থিতিতে এসেছিলেন এবং বন্ধুর জন্য প্রতীক্ষা করতে করতে অনেকক্ষণ বসে ছিলেন। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর সঙ্গে কথা না বলে থাকতে পারিনি। চা খেতে বলায়, বললেন, চা খাই না। আমি নিরুপায়। বলি, এতক্ষণ থাকেন কী করে? আসেন তো সেই সকাল আটটায়। উনি নিঃশব্দে হাসলেন। বললেন, অভ্যেস। জানো গঙ্গা, 'শরীরের নাম মহাশয় যা সহাতে চাও তাই সয়' বলে নিজেই জোরে জোরে হাসলেন। তাঁর মুখে আমার বাপের বাড়ির নাম শুনে আমি চমকে উঠলাম! আমার নাম গঙ্গা একথা জানলেন কী করে? আমার চোখে বোধ হয় বিস্ময় ছিল। তিনি বললেন, তুমি অবাক হয়ে যাচ্ছ? জানি, আমি সব জানি, তোমাদের নাড়ী-নক্ষত্র সব জানি।

—জানেন? কিন্তু কী করে জানেন তাই তো শুনতে চাইছি।

সমীরবাবু হাসলেন। মনে হলো, আমার কৌতূহল দেখেই হাসলেন। সেই সময় তিনি আমার মুখের পানে তাকিয়ে ছিলেন। হঠাৎ আমার লজ্জা পেল। আমি মুখ নামিয়ে মেয়েকে ঘুমপাড়াতে চেষ্টা করলাম। আমার স্বামী—যে চেয়ারটায় বসেন সেটাতেই বসে ছিলেন তিনি। বললেন, ও আর আমি এক স্কুলে এক সঙ্গেই পড়তাম। আমরা যখন নাইনে উঠি তখন দেশে খুব ছাত্র আন্দোলন চলছে—স্বাধীনতার জন্যে সুভাষ বোস ছাত্রদের আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। তখনকার দিনে ভালো ছেলে মাত্রই ঝাঁপিয়ে পড়ত। আমরাও পড়েছিলাম। কিছুদিন বাদে হেডমাস্টার মোহিনীবাবুকে পুলিস গ্রেপ্তার করে প্রেসিডেন্সী জেলে আটক করে। আমি আর নিলু হেডমাস্টার মশাইয়ের বাড়িতে আগে থেকেই যেতাম। আগে থেকেই হেডমাস্টার মশায়ের স্ত্রী চিন্ময়ী দেবীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল! তাঁদের কাছে আমরা বড় বড় বিপ্লবীদের জীবনকথা শুনে শুনেই—স্বদেশী করতে নেমে পড়ি।

চিন্ময়ীদিরও অগাধ পড়াশোনা। রবীন্দ্রনাথ তো তাঁর কণ্ঠস্থ। গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁদের মতে মিল না থাকলেও তাঁরা খদ্দর পড়তেন। শুধু পড়তেনই না—বিছানার চাদর, ঢাকনা, দরজা-জানালার পর্দা সবই খদ্দরের। বললে বলতেন—খদ্দর কিনলে পয়সাটা যারা সুতো কাটে, কাপড় বোনে তারাই পাবে। মিলের মতো মালিকের ভাগ বলে কিছু নেই এতে। মাথা তুলে আমি বলেছিলাম, পুরো মাত্রায় স্বদেশী মন ছিল ওনার। সমীরবাবু বললেন, ছিল না—আজও তেমনি আছে। দ্যাখোনি—কালোপেড়ে খদ্দরের শাড়ি পরেন।

বস্তুতপক্ষে চিনুদির পরনে খদ্দরের শাড়ি ছিল, না তাঁতের শাড়ি ছিল আমি খেয়াল করিনি। কিন্তু শাড়িটি কালো পাড়ের ছিল না, ছিল চকলেট রঙের ও সাদা ব্লাউজটি কালো বর্ডার দেওয়া ছিল। তবু সমীরবাবুর কথায় সায় দিয়ে বলেছিলাম, হুঁ।

সমীরবাবু পাকা লোক। অন্য কথায় গিয়েও আসল কথার খেই হারাননি। বললেন, শোন। তারপর সেই সময় খুব ধরপাকড় শুরু হয়েছিল। বিশেষ করে যুবক সম্প্রদায়

ছিল পুলিসের টারগেট। চিন্ময়ীদি বললেন, তোরা বোর্ডিং ছেড়ে পালিয়ে যা। এখানে থাকলে কোনদিন অ্যারেস্ট হবি। পালাবো কোথায়! তিনি কলকাতায় খিদিরপুরে মাইকেল দত্ত স্ট্রীটের এক ব্যবসায়ীকে চিঠি লিখে আমার হাতে দিযে বললেন, আজই তোরা কলকাতা চলে যা, দেরী করলেই বিপদ হতে পারে। একটু থেমে সমীরবাবু আবার বললেন, জিয়াগঞ্জ থেকে সে দিনই চ'লে এলাম! খিদিরপুরে দিন কয়েক বেশ ভালোই কাটল কিন্তু নিলু মির্জাপুর স্ট্রীটে গিয়ে ধরা পড়ল। আমি বুদ্ধি করে চাটগায়ের এক খালাসীর সঙ্গে ভাব করে তার আত্মীয় সেজে মুসলমানি টুপি লুঙ্গি পরে রেঙ্গুনে পাড়ি দিলাম। ফিরলাম যুদ্ধ লাগার মুখে ঐ খালাসী বন্ধুটির সঙ্গে চট্টগ্রামে। ক'দিন বাদেই পণ্ডিত জহরলাল মেয়ে ইন্দিরাকে নিয়ে চট্টগ্রাম এলেন বর্মা থেকে বক্তৃতা দিতে। মুসলমান সেজেই জেম-সেন হলে বক্তৃতা শুনতে গেলাম। গিয়ে দেখি মঞ্চের ওপর চিন্ময়ীদি বসে আছেন। আমি তো অবাক! কিন্তু তাঁর কাছে এই বেশে যেতে সাহস করলাম না। একজন ভলান্টিয়ারকে দিয়ে একটা চিরকুট লিখে জানালাম আমি সমীর। দেখা করতে চাই। তিনি নেমে এসে বললেন, এক্ষুনি পণ্ডিতজী এসে পড়বেন। সভা আরম্ভ করতে হবে, তুই এনায়েৎ বাজারের রানীদিঘির পুব পাড়ে সারদা কানুনগোর বাড়িতে যাস্। আমি ওখানেই থাকি। নিলুর খবর পেলাম ওখানেই। নিলু প্রেসিডেন্সীতেই আছে। পুলিস ইন্‌সপেকটর রহমৎ খাঁকে মার্ডার করার অপরাধে আট বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে কথাটা শুনে আমার মনটা ভীষণভাবে দমে গেল। আমার স্বামী মার্ডার কেসের আসামী? আমি একটা খুনির সঙ্গে ঘর করছি? আপনি বিশ্বাস করবেন না সেই মুহূর্তে লজ্জায় ঘৃণায় মরে গেলাম। আমার মানসিক অবস্থাটা হয়তো আমার চোখে মুখে ফুটে উঠেছিল। 'আরে না না। সত্যি সত্যি নিলু, মার্ডার কেসে নেই। স্রেফ মিথ্যে কেসে ওকে জড়িয়েছিল পুলিস।' বলে আমাকে প্রবোধ দিয়েছিলেন সমীরবাবু। তারপর আবার বলতে লাগলেন, 'সত্যি যদি কোন অত্যাচারী সাদাচামড়াকে সে গুলি করতো, সেটা হতো গৌরবের। মুক্তিযোদ্ধাদের সেই গৌরবই তো কাম্য। কিন্তু সে তা করেনি, তবে ট্রেনিং নিচ্ছিল।' ৪২ বিপ্লবে তাই কেউ রেহাই পাইনি।

পরদিনই চিন্ময়ীদির সঙ্গে দেখা করে জানতে পারলাম হেডমাস্টার মশাই ক্ষয়রোগ নিয়ে চার বছর বাদে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে দু'বছর রোগে ভুগে মারা গেছেন। আর নিলু জেল থেকে এম-এ পাশ করে সাড়ে ছ'বছর পর জেল থেকে বের হয়ে চাটগার কাষাড়া কলেজে চাকরি নিয়ে কলকাতা থেকে চলে আসে। আর চিন্ময়ীদি দেশের জায়গা-জমি বাড়িঘর বিক্রী করে চলে যান কলকাতায়। কালীঘাটে বাসা বাঁধেন। পরে সেটাই হয়ে ওঠে আশ্রম। তেতাল্লিশ সালে গ্রামবাংলা থেকে হাজারে হাজারে মানুষ দুর্ভিক্ষের অভিশাপ থেকে বাঁচার জন্যে যখন কলকাতা এলো এক কণা খুদ কিংবা একফোঁটা ফেন ভিক্ষে করতে, কলকাতার মানুষ সাধ্যমত চেষ্টা করেও যখন হাজার হাজার মানুষকে খাদ্য দিতে পারছে না ভিখেরি দেখে দরজা

বন্ধ করে দিচ্ছিল, তখন এই চিন্ময়ীদি-ই প্রথম নিজের বাড়ির নিচতলার হলঘরটায় লঙ্গরখানা খুলে দিলেন মানুষকে বাঁচাতে। তারপর তো সরকার থেকে লঙ্গরখানা খোলা হলো নানা স্থানে। চিন্ময়ীদি বলছিলেন, তিনি জানেন এভাবে মানুষকে বাঁচানো যাবে না, তাই সেই সব ক্ষুধার্ত মানুষকে উসকে দিতে চাইছিলেন বড় বড় খাদ্য গুদাম লুঠ করতে, বড় বড় খাবার দোকান লুঠ করতে, কিন্তু সে সময় কোন রাজনৈতিক নেতাই তাঁর এ প্রস্তাবে সায় দেয়নি। হুমায়ুন কবীর, শ্যামাপ্রসাদ তখন বাইরে। সাম্যবাদী ও র‍্যাডিক্যালিস্টরাও বাইরে,—তারা চিন্ময়ীদির প্রস্তাবকে পাগলামো বলে নাকি উড়িয়ে দিয়েছিলেন। অথচ শ্যামাপ্রসাদ ও হুমায়ুন কবীর দুর্ভিক্ষের খতিয়ান দিতে গিয়ে বলেন, মনুষ্যসৃষ্ট বাংলার দুর্ভিক্ষে লাখের বেশী মানুষ প্রাণ ত্যাগ করেছেন। কী ট্র্যাজেডি বল তো ?' বলে সমীরবাবু একটু থামলেন। ৫০ লাখ মানুষের না খেতে পেয়ে মরার কথা শুনে আমার চোখে-মুখে বোধহয় বিস্ময়ের ছাপ পড়েছিল। বললাম—পঞ্চাশ লাখ লোক ! সমীরবাবু আমার বিস্ময়ের ভাবটাকে কাটানোর জন্য কথাটাকে আরো সরলীকরণ করলেন। বললেন, হ্যাঁ পঞ্চাশ লাখ বাঙালি সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা জননীর কোল থেকে অকালে ঝরে গেল, কেউ একটু টুঁ-শব্দও করেনি। জাতীয় ও বিপ্লবী নেতারা সব জেলে। সুভাষচন্দ্র নিরুদ্দেশ। শুধু কমিউনিস্ট পার্টি, এম-এন রায়ের র‍্যাডিক্যাল পার্টি ইংরেজের যুদ্ধে সাহায্যের জন্য বহাল তবিয়তে বাইরে বিচরণ করছে। চিন্ময়ীদি এসব বলতে বলতে কেঁদে ফেলেছিলেন। বলছিলেন—তোরা যদি কাছে থাকতিস তা হ'লেও বিদ্রোহের আগুন একটু হলেও জ্বালানর চেষ্টা করতাম। ইংরেজ আর তার দালালরা বুঝত—না সব মানুষই তাঁদের এই ঘৃণ্য কাজকে মেনে নেয়নি। চিন্ময়ীদি বলছিলেন, ক্ষুধা যে কী জিনিস সেদিন আমি তা চোখে দেখেছি—কোন বাড়ি থেকে কিছু খাবার দিলে যার শক্তি বেশী সেই কেড়ে নিয়ে খেয়েছে। এমনকি মা তার সন্তানদের বাঁ হাতে ঠেলে রেখে নিজে সে খাবার গোগ্রাসে গিলছে—ওহ কি সে দৃশ্য !' কাল সমীরবাবু হঠাৎ উঠে গেলেন। বুঝলাম ভেতরে ভেতরে ক্ষোভে দুঃখে ভীষণ ভাবে উত্তেজিত। বোধহয় নিজেকে সামলে নিতেই বাইরে পুকুরপাড়ে একটু ঘুরতে গেলেন। আমিও বোধহয় এক নাগাড়ে এতগুলো কথা শুনে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। তক্তপোষ থেকে নেমে এসে এক কাপ দুধ জ্বাল দিয়ে টেবিলে ঢাকা দিয়ে রেখে জানালা দিয়ে দেখলাম এই অসময়েই শান বাঁধানো ঘাটে জলের গা ঘেঁষে বসে আছেন সমীরবাবু। ঘর থেকে ডাকলে শুনতে পাবেন না, কাছে গিয়ে ডাকা উচিত। কিন্তু যাওয়া উচিত কিনা তাই ভাবছিলেন—কারণ এ বাড়ির একজন আদি বাসিন্দা আছেন উপরের দরজা-জানালা ভাঙা একটি ঘরে। তিনি নাকি বালবিধবা—মাছ মাংস না খেলেও গেঁড়ি শামুকের ঝোল খান। এই পুকুর থেকেই চানের সময় হাঁড়িভর্তি গেঁড়ি তোলেন। সময় মতো রান্না করতে না পারলে মাঝে মাঝে ছাতে শুকোতে দেন। তখন দুর্গন্ধে বাড়িতে টেকা দায় হয়ে ওঠে। সেই মহিলা আমার স্বামীর সঙ্গে হেসে ঢংয়ে কথা বলেন এবং সুযোগ পেলেই আমার বিরুদ্ধে আমার

ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে নালিশ করেন। হঠাৎ আমি সামনে পড়ে গেলে কথা ঘুরিয়ে এমন ভাবে বলেন যেন—তিনি আমাদের মঙ্গলের জন্যেই এ সব বলেছেন! কিন্তু আমার বড় সৌভাগ্য যে তিনি ঘরের ভেতর আসেন না, চৌকাঠের গায়ে হেলান দিয়ে তার দাদার কাছে হাত-মুখ নেড়ে ঘুরিয়ে কত কথা যে বলেন তার হিসেব নেই। এই অল্প ক'দিনের মধ্যেই দাদার সঙ্গে তিনি এমন ভাব জামিয়ে ফেলেছেন যে বিপদের নাম করে ডাকলে ওনার দাদাবাবুটি রাত-বিরেতে তার ঘরে যেতেও আপত্তি করেন না। একদিন ক'কিয়ে ক'কিয়ে কাঁদতে কাঁদতে দাদাকে ডাকলেন পেট-ব্যথার ওষুধ দিতে! দাদা সেই অন্ধকারে সিঁড়ি ভেঙে উপরে গিয়ে 'তাক্' থেকে নাকি খাবার সোডা নামিয়ে খেতে দিয়ে এসেছিলেন। আর একদিন সন্দের পর এসে ডেকে নিয়ে গেলেন! তার ভাঙা জালানা বরাবর কে নাকি ঢিল ছুঁড়ছে—তাই দেখাতে। অথচ ভদ্রমহিলা আমার সঙ্গে হুঁ হাঁ ছাড়া বড় একটা কথা বলেন না। কাজেই এই মহিলাকে আমি ভয় করি। মিছে বদনাম রটাতে তার এতটুকু বাধবে না। সমীরবাবুকে ডাকতে গেলে সে মহিলা যদি দেখতে পায় তা' হ'লে এটাকেই তালকরে লাগাতে পারে কিন্তু দুধ ও লুচি যে ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। আমি একটু ভাবলাম। তারপর 'যা হয় হোক, আমার মনে তো কোনো পাপ নেই' বলে এগিয়ে গিয়ে সমীরবাবুকে ডেকে আনলাম।

সাধারণত সমীরবাবু কিছুই খান না কিন্তু সেদিন খেলেন। বললেন, এসব করলে কখন? বললাম, তাও বলতে হবে নাকি। আসলে আপনি পুকুর পাড়ে কতক্ষণ বসেছিলেন সে খেয়াল আপনার নেই, তাই বুঝলেন চোখের পলকে বুঝি করে ফেলেছি।

তিনি খেতে খেতেই হাতঘড়ি দেখে বললেন—নিলু কখন ফিরবে বলে যায়নি গঙ্গা? বললাম—আপনার চিন্ময়ীদি কি আপনার বন্ধুকে এমন শিক্ষা দিয়েছিলেন যে বাড়ি থেকে বের হলে বলে যেতে হয় কখন ফিরবেন। সমীরবাবু 'ও তাও তো বটে' বলে উঠে পড়লেন। বললাম, উঠলেন যে, আমার 'সব কথা জানেন' বলে এতক্ষণ যা শোনালেন শুধু মহাভারত, আমার কথা কই? সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাথা নেড়ে বলেছিলেন আছে আছে—এ তো হলো আসল কথার ভূমিকা—কিন্তু এখন যে প্লটে যেতে হচ্ছে—বালির লরি হয়তো বসে আছে—টাকা দিতে হবে যে—বলতে বলতে বাইরে গিয়ে বললেন—যাচ্ছি—সময় করে আবার আসবো একদিন!

সমীরবাবু চলে গেলে কেবলই আমার মনে হতে লাগল—সমীরবাবু এতক্ষণ বসে রইলেন অথচ তাঁকে খেতে বললাম না। এটা ঠিক হয়নি। তিনি খেতে না চাইলেও আমার বলা উচিত ছিল। পীড়াপীড়ি করলে হয়তো খেতেন। হঠাৎ মনে হলো একদিন সমীরবাবু ও নীলুবাবুর মধ্যে যে একাত্ম বন্ধুত্ব ছিল—আজকের ইতিহাস তারই প্রমাণ। অথচ কী করে যে, দু-জনের মধ্যে—একটা প্রাচীর উঠে গিয়েছিল তা আমি কিছুতেই আবিষ্কার করতে পারলাম না। সে জন্য একথাও তখন মনে হয়েছিল থাক, বেশী মাখামাখি না করাই ভালো। কিন্তু সেদিনই অপরাহ্নে তিনি ফিরে এসে

বসলেন। এবং আমার হাতে বালির গাড়ির ভাড়ার টাকা দিয়ে বললেন। টাকাটা নিলুকে দিও যেন সে সন্দে নাগাদ পৌঁছে যায়। তারপর আবার শুরু করলেন পূর্বকথা—যেন সে কাহিনী আমাকে না শুনিয়ে থাকতে পারবেন না তিনি। যেমন এই দীর্ঘপত্র আপনাকে আমি না বলে থাকতে পারছি না—আমার কথা। সমীরবাবু আবার সেই স্বামীর চেয়ারটাতেই বসলেন। যেটা আমি কিছুতেই চাইছিলাম না। কিন্তু আপত্তি করতে পারলাম না। তিনি বলতে লাগলেন—তারপর কিছুদিন বাদে, মানে ছয়-সাত মাস বাদে চিন্ময়ীদি আমাদের দুজনকে নিয়েই কলকাতা চলে এলেন। আমি আর নিলু দু'জনেই চাকরি করলাম না। দেশ স্বাধীন না করে ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কোনো জীবিকার পথ বেছে নিলাম না। নিলু আর আমি কালীঘাটের সে আশ্রমেই থাকি। একদিন নীলু হাজরা পার্কে মিটিং করতে গিয়ে ধরা পড়ল। চারিদিকে হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা-হাঙ্গামা। তার মধ্যেই জাতীয় নেতারা বৃটিশের সঙ্গে আপোস করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠল। আমরা আপোসবিরোধী ছিলাম। কিন্তু ঠেকাতে পারলাম না। প্রতিভা রায়, লীলা রায়ের সঙ্গে চিন্ময়ীদিও গ্রেপ্তার হলেন। আমি নিরুপায় হয়ে দেশের বাড়িতে এসে বসে রইলাম। নিলুর মা বাবাকে বললাম। আমাকে বিয়ে দেওয়ার জন্য আমার বাড়ির সবাই পাগল হয়ে উঠল। তাই আবার পালিয়ে আসি কলকাতায়। আশ্রম ভেঙে গেছে। থাকার বড় অসুবিধা। ইতিমধ্যে নীলু জেল থেকে বের হয়ে এসে একটা খবরের কাগজে কাজ নিল এবং খুব লেখালেখি শুরু করল। খবর পেয়ে তার বাড়ির লোকেরা এসে তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে বিয়ে দিতে চাইল। সে নাকি গাঁয়ের মেয়েকে বিয়ে করতে একদম রাজি ছিল না। চলে এলো শহরতলীর পত্রিকা বাড়িটায়—যে বাড়িটা যুদ্ধের সময় বোমা পড়ার ভয়ে ছেড়ে দিয়ে মুর্শিদাবাদে মামার বাড়িতে গিয়ে সবাই আশ্রয় নিয়েছিল।

ইংরেজ সরকার আর সুবিধাবাদী নেতাদের কারসাজিতে বাংলায় দুর্ভিক্ষ হলো, মহামারী হলো, দাঙ্গা বাঁধানো হল। তারপর দেশ ভাগ করে সুবিধাবাদীরাই মসনদে বসলো। লাখে লাখে বাঙালী মরল। তারপর শুরু হলো দেশ ছাড়ার পালা—যার নাম উদ্বাস্তু স্রোত। এরই মধ্যে নিলুর বিয়ে ঠিক হলো। সমীরবাবুর এটুকু কথা শুনেই উৎকর্ণ হয়ে রইলাম—সে বিয়েটা আমার বিয়ের কাহিনী কি না জানতে। একটু থামতেই বললাম, তারপর ? সমীরবাবু একটু মৃদু হাসলেন, পরে বললেন, তারপর যথারীতি আমি বরযাত্রী হলাম। তারপরের কথা সবই তোমার মনে থাকার কথা।

আমি একটু আনমনা হয়েছিলাম হয়তো। মনে মনে সেদিন সে রাত্রির সব ঘটনার কথাই মনের পর্দায় একে একে ছবির মতো ভেসে উঠতে লাগল। সেদিন বিয়ের লগ্ন ছিল তিনটেয়, সাতটায়, ন'টা পাঁচে ও রাত্রি এগারোটায়। সাতটার লগ্নেই বিয়ে হওয়ার কথা ছিল—কিন্তু সাতটায় বর এলো না। নটার লগ্নও বয়ে গেল। স্বাভাবিক ভাবেই আমার বাপের বাড়ির সকলেই অস্থির হয়ে উঠল। নটার লগ্নও বয়ে যাওয়ার পর আমার ছোটকাকা গাড়ি নিয়ে ছুটলেন কলকাতায়—বরের বাড়িতে—দেরী হচ্ছে কেন

খবর নিতে। ঘণ্টা দেড়েক বাদে তিনি যে খবর নিয়ে এলেন—তা শুনে বাড়িসুদ্ধ লোকের কান্নাকাটি শুরু হয়ে গেল। ঠাকুমা 'আগেই বলেছিলাম স্বদেশী ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিসনে। একটা দিনও সুখ পাবে না বাছা ওই হতভাগাদের সঙ্গে সংসার করে' বলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। মা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। বাবা পাথর হয়ে বসে আছেন। কাকা খবর দিলেন বর কোথায় মিটিং করতে গেছেন—এখনো বাড়ি ফিরেনি। বরের বাড়িতেও উদ্বেগের সীমা নেই। আমি কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়ে—আমার মনের অবস্থা কীরকম আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। কুলীনের মেয়েদের বিয়ে করা হলেও ঘর করা অনেকের কপালে হয়ে ওঠে না। আর এই উৎসর্গ করা মেয়ের আর বিয়ে হবে কি কোনোদিন? বুক কাঁপানো অমঙ্গলের পদধ্বনি। শরীরটা কেমন করছিল।

সারাদিন উপোসের পর এমনিতেই শরীরটা ছেড়ে দিয়েছিল এখন এ-খবরে আমি আর আমার মধ্যে রইলাম না। এমন একটা দুঃসংবাদে আমি কেঁদেছিলাম কিনা মনে নেই। তবে একথা স্পষ্ট মনে আছে আমার বুক থেকে গলা পর্যন্ত সবটাই শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছিল।

বিয়েটা জ্যাঠামশাই-ই ঠিক করেছিলেন বলে তাঁর ওপর অকারণে আমার মিথ্যা অভিমান এতই বড় হয়ে উঠল যে, তাঁর স্নেহ ভালোবাসা ও বিশ্বাসের কোনও মূল্যই যেন আমার কাছে রইল না। কারণ তিনিই নির্বিকার চিত্তে একাধিকবার আশ্বাসের বাণী শুনিয়ে বলেছিলেন, তোরা যে যা-ই বলিস আমি বলছি ওরা আসবেই। কলকাতা থেকে আসা—নানা ঝামেলার ব্যাপার থাকতেই পারে। কিন্তু তাঁর এই আশ্বাস-বাণীর কেউ একটা মূল্য না দিলেও বর ও বরযাত্রীরা রাত দশটা পঞ্চাশের মাথায় এসে সকলের মুখরক্ষা করলেন।

বর ও বরযাত্রীদের এত বিলম্ব হলো কেন—সে প্রশ্ন নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের কারো অবকাশ ছিল না। লগ্ন পার হয়ে যাওয়ার আতঙ্কে পুরোহিত ও অন্যান্য সকলে বরকে বাসরে নিয়ে এসে একেবারে সিংহাসনে বসিয়ে দিলে। আমাকে যখন সাত-পাক ঘুরিয়ে মালা বদলের জন্য নেওয়া হল তখনো তিনি ঘুমোচ্ছিলেন। আমি চোখ তুলে তাঁর দিকে তাকাতেই দেখি তিনি চোখ বুজে রয়েছেন। তাঁর হেলে যাওয়া মাথাটা যিনি সোজা করে ধরে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন তিনি এই সমীরবাবু। তার সঙ্গেই আমার প্রথম শুভদৃষ্টি বিনিময় হলো! আমার আজও বেশ মনে আছে--সেই মুহূর্তে আমার অজ্ঞাতে আমার ভেতরটা একবার কেঁপে উঠেছিল। সুমঙ্গল কি অমঙ্গল—সেই কাঁপন আজো কি থেমেছে?—কী হলো কী ভাবছো? সমীরবাবুর এই কথায় আমি চমকে উঠেছিলাম। তিনি হেসে বললেন—'কি মনে আছে? আমি কিন্তু ভুলিনি। তোমার সঙ্গে নীলাঞ্জন চৌধুরীর মালা বদল হলেও আমার সঙ্গেই তোমার প্রথম শুভদৃষ্টি বিনিময় হয়' বলে তিনি কৌতুক-ভরে এক অদ্ভুত হাসি হাসলেন। আমি শুষ্ক ও কম্পিত স্বরে বললাম, একথা কি

আপনার বন্ধুবর জানেন ? তিনি হঠাৎ বিষণ্ণ হয়ে বললেন—আমি আস্ত একটা গাধা, না লিপিকা ? না হলে-আমাদের সখ্যতায় কোনদিনই চিব ধরত না। আমি ভাবিনি এই সমান্য ঘটনার কথা তাকে কঠিন আঘাত করবে। আমি কোনমতেই আগে বুঝিনি।

আমি কি বুঝেছিলাম—এখানেই আমাদের স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের মাঝখানে এই বিষবৃক্ষের বীজ একদিন সন্দেহ অবিশ্বাসের ডালপালা ছড়িয়ে আমার জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলবে ? পুরুষরাও এ রকম সামান্য অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি-বিচ্যুতিকে এতখানি মর্যাদা দিযে সারাজীবন মনে মনে লালন করতে পারেন এ ঘটনার কথা না জানলে, আমি কোনমতেই বিশ্বাস করতাম না। আজ আমার মনে হচ্ছে সমস্ত মেয়ে মানুষই স্বামীর সন্দেহের হাত থেকে—জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে একটি অপরিচিত ত্রাসের মধ্যে থাকে। আর এর দরুন না হয় তার নারীত্বের স্বাভাবিক বিকাশ, না হয় মনুষ্যত্বের বিকাশ। আমার কথা ভেবে দেখুন—ছোটবেলায় মা-বাবার আত্মীয়-স্বজনের অনুশাসনে আমার লেখাপড়াটুকু পর্যন্ত হলো না। আমি যদি নিজে চেষ্টা না করতুম তাহ'লে কি আপনাকে এতকথা লিখতে পারতুম ?

দ্বিতীয়ত আমিও যে গ্রামের অশিক্ষিতা নির্বোধ মেয়ে একথা প্রায় গোপন রেখেই বিয়ে দিয়েছিলেন আমার গুরুজনেরা। গাঁয়ের গেঁয়ো মেয়েকে কয়েকমাস শহরে এনে দিলেই কি শহুরে হ'য়ে যায় নাকি ? অথচ আমার জ্যাঠামশাইরা ভেবেছিলেন। তাঁরা একজন সুপাত্রের কাছে মেয়েকে দিতে পারার জন্যেই হযতো এটি করেছিলেন।

সমীরবাবুর সঙ্গে আমার শুভদৃষ্টি হয়েছিল ঠিকই। সেটা সময়ের গুণে শুভ। বিয়ের লগ্ন না হলে এমন অজানা কারোরই হঠাৎ চোখে চোখ পড়ে না ? আমি এটাকে কোনদিনই শুভদৃষ্টি বলেই মেনে নেইনি। কথাটা বিয়ের পর বাপের বাড়িতে গিয়েও শুনেছি। সমবয়সীরা যখন বলে তখন হেসে উড়িয়ে দিয়েছি কিন্তু কাকিমা ছোটপিসি ও'রা যখন বলেছেন—খুব খারাপ লেগেছিল। কিন্তু সমীরবাবু এ কথাটা সকলকে বিশেষ করে তাঁর বন্ধুকে বললেন কেন ? বলুন না। আপনি তো একজন বিদগ্ধ পুরুষ মানুষ। পুরুষরা স্ত্রীর নিষ্ঠা সম্পর্কে কতখানি সন্ধিহান থাকেন এটা তো সব পুরুষেরই জানা উচিত। তাহলে কি এ কথা সত্যি আমার ঐ রাত্রের দৃষ্টি বিনিময়ই আমার পাপ। যা তিনি সকলের কাছে প্রকাশ করে নিজেই নির্দোষিতা প্রমাণ করতে চাইছেন—না এটা তার এমনি কৌতুক। তাহলে এ প্রসঙ্গের বাকী কথাটা শেষ করে নিই তবেই বিষয়টা আরো পরিষ্কার বুঝতে পারবেন।

সেদিন সমীরবাবু চলে গেলে বেশ রাত করেই স্বামী ঘরে ফিরলেন। খাওয়া-দাওযার পর আবার কবিতার খাতা নিয়ে বসেছেন। তাঁর কাছে সমীরবাবুর দেওয়া টাকাগুলো দিয়ে যা বলে গেছেন বললাম। ঠিক সেই সময়ই উপরের মহিলা হ্যারিকেন নিয়ে বোধ হয় পুকুরের ঘাটে এসেছিলেন। ফেরার পথে বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকলেন দাদা এসেছেন নাকি। দাদা আমাকে দোর খুলে দিতে ইঙ্গিত করলেন। আমি খুলে

দিলাম। ভদ্রমহিলা বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, বললেন—'না না খুলতে হবে না। আমার ভয় লাগছিল তাই ডাকলাম।' স্বামী বোধ হয় একটু অখুশী হয়েছিলেন। একটু কর্কশ কণ্ঠেই বললাম—'ভয় কিসের। রাত এখন সবে তো ন'টা হবে।'

—ন'টা ছ'টার কথা নয় দাদা। জায়গাটা তো ভালো নয়। চারিদিকে কাছেপিঠে বাড়ি-ঘর নেই গাছ-গাছালি অন্ধকার ঘুটঘুট করছে, ভয় করবে না?'

—'আমরা না আসলে থাকতেন কি করে একা একা এই অন্ধপুরীতে!'

—'ও-মা! তখন কি সন্দে হলে নিচে নামতাম? বাজ পড়লেও নামতাম না।' বলতে বলতে মহিলা চৌকাঠ ঘেঁসে দাঁড়ালেন আর মাঝে মাঝে পেছন তাকাচ্ছেন! যেন এখনো তার ভীষণ ভয় করছে।

স্বামী বললেন, 'যান যান এখন উপরে চলে যান। ভয় কিসের আমরা তো আছি—এগিয়ে দেব?'

—'না না, এগিয়ে দিতে হবে না।' বলে হ্যারিকেনটা তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। একটু গিয়ে ফিরে বললেন—'দাদা একটা কথা বলুম।'

—'কী কথা। বলুন!' এবার তিনি বিগলিত হয়ে আবার চৌকাঠে ঠেস দিয়ে বললেন—'বলছিলাম কি—তখন এক ভদ্দরলোক বৌঠানের হাতে অনেকগুলো টাকা দিয়ে গেলেন, সে লোকটা কে?' মহিলার কথা শুনে আমার গা কাটা দিয়ে উঠেছিল।

—'কেন?' স্বামী বললেন।

—'না এমনিতেই বলছি। পেরাই আসে কিনা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলে! আপনার, না বৌঠানের ভাই, তাই জিজ্ঞাসু করছিলাম।'

—'বৌঠানের ভাই। কালীঘাটে থাকে। আর কিছু জানতে চান?'

—'না-না। এটুকুই যথেষ্ট।' বলে দ্রুত পায়ে মহিলা আমার কপালে আগুন লাগিয়ে চলে গেলেন। তারপর। তারপর আর কি! তিনি সে রাত্রে এবং তার পরদিনও আমার সঙ্গে একটি কথাও বলেননি।

সেদিন সেই বিবাহবাসরে কেন তিনি চোখ বুজে ছিলেন তখন তা' জানতাম না। পরে ভেবেছিলাম—বিয়ের ক'দিন আগে থেকেই অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। তার ফলেই তাঁর এই অকাল কুম্ভকর্ণের ঘুম। কিন্তু আমি যখন তাঁকে পতিত্বে মালা পরিয়ে বরন করি—তখন নীলাঞ্জন চৌধুরী ওরফে নিলু বাবুকেই তো বরণ করি। তাতে আমার কোনো কিন্তু ছিল না,—যদিও পাশে সুন্দর হাসি হাসি দুটি চোখ আমার চোখের আড়াল হয়নি। তথাপি আমি বলবো, ঐ একাগ্র দৃষ্টি আমার নিষ্ঠাকে কেড়ে নিতে পারেনি। আমি আমার যৌবনের পরম পবিত্র অর্ঘ্য সেই বালকের মতো ঘুমকাতুরে মানুষটাকেই দিয়েছি। কিন্তু তাঁর দু'হাত যখন আমার গলায় মালা পরায় তখনই তা দু'হাতেই ছিল না। অন্য আরো 'চার-ছটা' হাত তাঁর হাতকে তুলে ধরে আমাকে মালা পরিয়েছিল। তবুও কি বলবেন, সমীরবাবু রোপিত বিষবৃক্ষের বীজ আজো বেঁচে আছে?

সমীরবাবুর সঙ্গে অনিচ্ছাকৃত শুভদৃষ্টির ঘটনাকে সেই রাত থেকেই অজ্ঞাত অপরাধ বলে—চোরের মতো নিজেকে লুকিয়ে চলেছিলাম। স্বামীর পক্ষ থেকে ঐ ব্যাপারে কোন কথা কোন মন্তব্য কখনো শুনিনি। কিন্তু সেদিন সেই পোড়ো বাড়ির বাসিন্দা ঐ মহিলা অজ্ঞাতে আমার ক্ষতস্থানের বিস্মৃতপ্রায় জ্বালাকে সজোরে খুঁচিয়ে দিয়ে যন্ত্রণাটাকে বাড়িয়ে দিয়ে গেলেন! তার একটা জাজ্বল্য প্রমাণ হবেন অনেক দিন বাদে—নিজেদের নতুন বাড়িতে চলে আসবার পর—তিনি একদিন হঠাৎ বললেন—শুনলুম সমীর এসেছে। কালীঘাটেই আছে, চল দেখা করিয়ে আনি!

এবার বুঝুন, আপনারা পুরুষরা কী সাংঘাতিক চীজ! নারীর মন নিয়ে কী নিষ্ঠুর ছিনিমিনি খেলেন আপনারা। অথচ আপনারাই কবি সাহিত্যিক শিল্পী, উদার ও বিদগ্ধ বলে নিজেদের জাহির করে আসছেন যুগ যুগ ধরে। নারীর পবিত্রতা আর পতিব্রতার কাহিনী ফেঁদে হাজার হাজার পুঁথি লিখেছেন আপনারাই। নারীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বর্ণনায় পুরুষদের রসনা কতখানি তৃপ্ত হয় জানি না। কিন্তু রসজ্ঞা রমণীমাত্রই যে পুরুষদের এই ভণ্ডামী উপভোগ করেন সে কথা বলাই বাহুল্য। নারীকে দেবী বানিয়ে সতীলক্ষ্মী সাজিয়ে অসূর্যম্পশ্যা বলে যতই স্তব-স্তুতি করুন না কেন—আসলে যে তা' নিজেদের ভোগের জন্য, লালসা চরিতার্থের জন্য—একথা সব রমণীই বোঝেন।

এখনো যে সংসারে নারীকে মূল্য ও মর্যাদা দেওয়া হয় তা শুধু তার সন্তান ধারণের ক্ষমতা আছে বলেই। ভগবান না করুন—এমন একদিন যদি হয় সন্তানের নারীকে আর প্রয়োজন হবে না—কৃত্রিম উপায়ে, বা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে সন্তান উৎপাদন যদি সম্ভব হয়, শুধু একমুঠো অন্নের জন্যই সেদিন নারীকে হয় দাসীপনা—নয় বারবনিতার পথ বেছে নিতে হবে। একথা বলছি কম দুঃখে নয়—নইলে এ-খোঁচাটা দেওয়ার কী প্রয়োজন ছিল তাঁর। যাকে নিয়ে এ-খোঁচা-খুঁচি সে তো অনেকদিন আগেই আমাদের সংস্রব ছেড়ে চলে গিয়েছে। ঐ সামান্য ঘটনাটা—যা একান্তই অজ্ঞাতে অনিচ্ছাতে ঘটে গিয়েছিল—তা তিনি এতদিনেও ভুলতে পারেননি বলে ঈর্ষায় দগ্ধ হয়ে মাঝে মাঝে হুল ফোটান। আমার আজ একথা বুঝতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না যে, সমীরবাবুর সঙ্গে তাঁর আবাল্য বন্ধুত্ব এই কারণেই নষ্ট হয়েছে। কিন্তু তাঁর বেলা?

হ্যাঁ, বলতে পারেন যমুনাকে আমি আপন বোনের মতোই বিশ্বাস করেছিলাম। আমার অন্ধ ভালোবাসা এমনই হয়েছিল যে যমুনার পৈতৃক পরিচয়টুকু নিতেও আমার কোনো আগ্রহ ছিল না। সে নিজেই বলেছে যে, সে নাকি কোনো অভিজাত ঘরের মেয়ে। কলকাতার অনেক দূরে কোন জেলায় তাদের আসল ঘর। তার ঠাকুরদা কাজের অসুবিধার জন্যে কলকাতার কাছাকাছি কোথায় এসে ঘরবাড়ি করেছিলেন। ওরা এখানেই এখন থাকেন। ছেলের বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক নেই। জ্ঞাতিরা তা ভোগ-দখল করে আছেন—সে সম্পত্তি থেকে পাওয়া ফসলের ভাগও সে দেয় না—তাই এখন

তাদের অবস্থা পড়ে গিয়েছে—নইলে—ইত্যাদি ইত্যাদি। বাপ মায়ের একমাত্র কন্যা সে। তাকে বিয়ে দেবার কথা প্রতিবেশীরা বললে—তার মা বাবা নাকি বলেন—মেয়ের কুড়ি বছরে নাকি বৈধব্যযোগ আছে। পাঁচ ভাইয়ের এক বোন। কাজেই তার আদর ও সাবধানতার সীমা নেই!

সে নাকি কলকাতায় মেয়েদের বোর্ডিংয়ে থেকে লেখাপড়া শিখেছে। তাই তার এত অভিজ্ঞতা। অর্থাৎ সে প্রকারান্তরে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে আমার থেকে তার বিদ্যাবুদ্ধি ও দাম অনেক বেশি। অবশ্যই তার বিদ্যাবুদ্ধি যে অনেক বেশী তা' তার কাজের মধ্য দিয়েই আমি বুঝেছিলাম। আমার স্বামীকে ঘিরে যে-সব ছেলেমেয়ে ভীড় করেছিল—তাদের অনেককেই তাড়িয়েছিলাম। রাজনীতির গন্ধ সহ্য করতে পারতো না যমুনা। তাই বাছাই করে সেই গন্ধিওয়ালাদের তাড়িয়েছিল সে। আমি থ হয়ে যেতাম। এতবড় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষটা তার একাজে টুঁ শব্দও করতেন না। শুধু কাব্য, সাহিত্য ও শিল্পের অনুরাগী শিক্ষানবিশীরাই রয়ে গেল তাঁকে ঘিরে। তারপর এক কান্ড করল সে।

একদিন বিকালে কবিতাপাঠ ও সঙ্গীতের আসর বসলো ও-ঘরে। কবির চেনা অনুরাধা বলে একটি রূপসী মেয়ে এলো ঐ আসরে। সব মিলিয়ে দশ এগারো জন। যমুনা টেনে হিঁচড়ে আমাকেও নিয়ে ও-ঘরে বসিয়ে দিয়েছিল এক কোণে। ভয় ও সংকোচ থাকলেও ভেতরে ভেতরে খুশীই হয়েছিলাম। যমুনা আমাকে কবিপত্নীর মর্যাদা দিয়ে নতুনদের সঙ্গে পরিচয় করিয়েও দিল। আমার মনে হয়েছিল—আমি হৃতসাম্রাজ্য ফিরে পেলাম। একবারও মনে ভাবিনি যে এমনি সুচতুর ভাবে কেউ পতিপ্রেমে ভাগ বসাতে পারে?

অনুষ্ঠান আরম্ভের আগে যমুনা একটি ছোট্ট বক্তৃতা দিয়ে বললে—আজ কবির জন্মদিন। আমরা যারা কবিকে কেন্দ্র করে শিল্প, সাহিত্য ও কাব্যচর্চা করি, আজকে এই শুভদিনে হয় তারা স্বরচিত গান—কবিতা দিয়ে নতুবা কবির গান কবিতা দিয়েই তাঁকে শ্রদ্ধা জানাবে। তার আগে আমি প্রস্তাব করি কবিপত্নী শ্রীমতী লিপিকা চৌধুরী-ই কবিকে মাল্যভূষিত করে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করুন।

অনুষ্ঠানের সূচনায় আমি এধরনের অচমকা অদ্ভুত প্রস্তাবে স্বভাবত বিব্রত হয়ে পড়লাম, কিন্তু কুণ্ঠা প্রকাশের অবকাশ রইল না, চারিদিক থেকে হাততালি দিয়ে বিপুল সমর্থন জানাল সকলে। আমি এমনিই মাথায় কাপড় টেনে কুণ্ঠিত হয়ে এক কোণে বসে ছিলাম দর্শক হিসেবে। যমুনার কথায় পা' দুটো কাঁপতে লাগল। নিজে থেকে উঠবার তাগিদও অনুভব করলাম না। অনুরাধা ছুটে এসে—মাটিতে গেঁথে যাওয়া পা' দুটো সমেত টেনে তুললো আমাকে। একবার আড়চোখে চেয়ে দেখলাম স্বামীকে। তিনি আমার দুর্দশা দেখে মৃদু মৃদু হাসছেন। ঠিক সেই মুহূর্তে আমার মনে হয়েছিল—এ একটা কারসাজি। স্বামী ও যমুনা মিলে এটা করেছে। ভয়ে ও লজ্জায় মরে গেলাম।

যমুনা রজনীগন্ধার মালা তুলে দিল হাতে। এরা নববধূর মতোই আমাকে ধরে নিয়ে গেল কবির সামনে। একটি ছোট্ট মেয়ে এসে চন্দন পরিয়ে গেল কবির ললাটে। আমি আমার মানুষকে তাঁর জন্মদিনে কবিতা পাঠের আসরে কবি হিসেবে মাল্যভূষিত করে বরন করলাম শ্রীনীলাঞ্জন চৌধুরীকে। একদিন স্বামী হিসেবে তাঁকে মাল্যদান করতে গিয়ে অজ্ঞাতে যে ভুল হয়েছিল আজ তা' আর হতে দিলাম না। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য আজও তিনি আমার মুখের পানে তাকালেন না। নত চোখে সামনের টেবিলটার দিকেই চেয়ে রইলেন। তাঁর এই আচরণে ক্ষোভে, দুঃখে, অভিমানে, আমার দু'চোখ ফেটে জল আসছিল। সকলের হাততালি ও উল্লাসের আড়ালে—চোখের জল লুকানোর জন্যে মেয়ে কাঁদছে বলে ও-ঘর থেকে দ্রুতপায়ে চলে এলাম।

বাইরে ঝিরঝিরে বৃষ্টির সঙ্গে মিষ্টি বাতাস। না, মেয়ে কাঁদছিল না। সে মশারির নিচে দিব্যি ঘুমোচ্ছে। বোধ হয় স্বপ্নে কেঁদেছিল। আমি চোখ মুছে এ-ঘরেরই কপাটে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে কান পেতে রইলাম।

উদ্বোধন সঙ্গীত গাইলেন কবি নিজে। এ গান আমি তাঁর কণ্ঠে ফ্ল্যাট বাড়িতে শুনেছি। গানটি বোধ হয় তাঁর খুব প্রিয়? সেদিন নিজেকে ধন্য মনে করতে পারিনি। কেবলই মনে হয়েছিল কোনো রূপসীকে নিয়েই তিনি এটা রচনা করেছিলেন। কিন্তু আজ তা মনে করতে পারছি না। বার বারই মনে হচ্ছিল আমাকেই মনে রেখে এটা রচনা করেছিলেন। এ গানের সুর এমনই মরমী যে শুনলে আকুল না হ'য়ে থাকা যায় না। গানটির পদ তুলে দিলাম। কিন্তু সুর শোনাতে পারলাম না। যদি পারতাম, তবে বুঝতেন কেন আমি আকুল হয়েছিলাম। কেন এত অপমান, অসহ্য যন্ত্রণা পেয়েও কম্পাসের কাঁটার মতো তার দিকে মুখ করে বসে থাকতাম।

'কবে কোন্ বিস্মৃত যুগে
প্রথমা মানবী তুমি
বসিয়া সমুখে, মোর
প্রথম ভাষণে শুধাইলে
প্রিয়তম বলে, —
কবে কোন্ বিস্মৃত যুগে।
ওগো সুতনুকা—সুনয়না
মন হারিণী প্রিয়তমা।
এক হাতে ছিল তব কুসুমকলি
আর হাতে ছিল বরন ডালি
চরণ দু'খানি ছিল ঝরনা জলে—
কবে কোন্ বিস্মৃত যুগে'···

একটু আগে চোখের যে জল মুছে ফেলেছিলাম—তা' আবার জল নেমে এলো।

কপাটে হেলান দিয়েছিলাম—পা' ভিজে যাচ্ছিল বৃষ্টির ছাটে। আমিই তাঁর মন-হরিণী; আমিই তার প্রিয়তমা সুতনুকা সুনয়নী। আজই তাকে আবার নতুন করে পেলাম। তাঁর প্রতি সকলের সম্মান ও আমার গৌরবকে একাকার করে দিয়েছে। আমি ও তিনি অন্তরে অন্তরে অভিন্ন। তাঁকে আমি না বুঝে মিথ্যে অভিযুক্ত করেছি—তিনি সত্য ও সুন্দরের পূজারী। আমি কি সত্য ও নিষ্ঠায় অভিষিক্ত নই? আমি কি সুন্দর নয়? মিথ্যে অভিমানে তাঁর কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখিনি?

সে লহমায় আমার এ কথাও মনে হয়েছিল মালা পরাবার সময় তিনি যে চোখে চেয়ে তাকাননি—এটা তাঁর আমার প্রতি তুচ্ছ ভাব নয়। এটা স্বাভাবিক সৌজন্য-বোধক লজ্জা। এ লজ্জায় গ্লানি নেই। আছে ভালোবাসার স্নিগ্ধ অনুভূতি।

আমি একটা অচিন্তনীয় সুখ অনুভব করলাম।

হাততালি শেষ হলে আবার যমুনা এসে আমাকে টেনে নিয়ে বসিয়ে দিল ও-ঘরে। অনুরাধা এবার কবিতা পাঠ করবে। সে অনেকগুলি সাময়িকপত্র নিয়ে এসেছিল। তার একটার পাতা খুলে কবিতা পড়তে গিয়ে বললে—আমি আটখানি বিভিন্ন নামের মাসিক, ত্রৈমাসিক, দ্বিমাসিক পত্রিকা নিয়ে এসেছি—এগুলির একটাও কলকাতা তথা বাংলা থেকে প্রকাশ হয় না। বিহার, ওড়িশা, আসাম, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লী, অন্ধ্র, মাদ্রাজ প্রভৃতি রাজ্যের প্রবাসী বাঙালীরা প্রকাশ করে থাকেন সে-সব পত্র-পত্রিকা—এ তারই কয়েকটি। আমার হাতে যেটি, এটার নাম মঞ্জরী। প্রকাশ হয় পাটনা থেকে। দশম-বর্ষের সপ্তম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়—কবির 'নিঃসঙ্গ নই' কবিতাটি।

অনুরাধা পড়তে আরম্ভ করে—"নিঃসঙ্গ নই"

আমি কখনো নিঃসঙ্গ নই
নিঃসঙ্গ হতে পারি না—
কেউ না কেউ আমাকে ঘিরেই থাকে,
তাদের কথা বলার শব্দ—
পাখার ঝাপটা,
উচ্ছ্বাসের ঢেউ,
নম্র চোখের চাহনি, অধরের একটুখানি হাসি;
অথবা ফেটে পড়া ক্রোধের আগুন—
আমাকে ঘিরেই থাকে।
আমি নিঃসঙ্গ হতে পারি না।

আমি মাঝে মাঝে নিঃসঙ্গ হয়ে থাকতে চাই
চোখ বুজে ঘুমের মধ্যে অন্ধকারে ডুবুরি হয়ে—
নিঃশব্দ হতে চাই তারাদের মতো।
ভালোবাসা এসে আমাকে জাগিয়ে রাখে;
জাগিয়ে রাখে ঝিঁঝি পোকার ডাক।

আমার দেখা—অ-দেখা বইয়ে পড়া
ইতিহাস হয়ে থাকা মানুষেরা, এবং
বাতাসে মিশে থাকা—আপাত মনে হওয়া নিঃশব্দ
অনন্ত শব্দময় বিশ্ব—সব সময় আমাকে
ঘিরেই থাকে। নিঃসঙ্গ হতে পারি না।

অভিমান অভিশাপ—নালিশ ও ক্রোধ
জান্তব সত্তার বিচিত্র রূপ—
ঘিরে থাকে প্রেম, প্রীতি, সোহাগ ভালোবাসা
কাছে না পাওয়া দীর্ঘশ্বাস—
সারল্যের মূর্ত প্রতীক মানুষের মমত্ববোধ আকীর্ণ—
সমাজ সত্তা।
ঘাসের সবুজ, আকাশের নীল জলের স্বচ্ছতা
আরক্ত সূর্য, সভ্যতার ধূসর রং, নৈসর্গিক জীবন
সব সময় ঘিরে রাখে আমাকে—
আমি নিঃসঙ্গ হতে পারি না।

হাততালির পর আরেকখানি মাসিক তুলে নিয়ে বলল, এটি প্রকাশিত হয় গৌহাটি থেকে। নাম—'সাথী'। কবিতার নাম—'অন্বেষণ'

এক কালের কোন কবি লিখেছিল কবিতা—এক
আশ্বিনের রামধনুর রঙ এনে
এঁকেছিল যারে—ফেলেছিল দীর্ঘশ্বাস
সেই আমার মানসী প্রিয়া—
নাম তার নীলিমা বিশ্বাস।
আমার রক্তের স্রোতে আমি খুঁজেছি তারে
বাপ পিতামহের কাল থেকে—
ভাগীরথীর তীর থেকে মেঘনার তীরে
বেতসের ঝোপ্ থেকে শালবনে—
লাল মাইয়ের অনুচ্চ পাহার কোলে,
শালদা নদের স্রোতে—
বাপ পিতামহের কাল থেকে—
আমিও খুঁজেছি তারে। টাইগার হিলে
ছোট নামখানার নোনা জলে—
খুঁজেছি তারে, আকাল সমুদ্র, উজান বাতাস
আকাশ নীল ঠেলে ঠেলে, / আমিও খুঁজেছি তারে॥

ফ্ল্যাট বাড়িতে যারা কবির কাছে আসত তাদের কেউ আমাকে ঝি-চাকরাণী বা রাঁধুনীর চেয়ে বেশী মর্যাদা দেয়নি। যমুনা আমাকে দিয়ে যে কাণ্ড-কারখানা করাল তাতে আমার মনে হয়েছিল সে আমাকে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করেছে। তার এই ব্যবহারে আমার সমস্ত দুঃখ, গ্লানি ধুয়ে মুছে গিয়েছিল। নিত্যদিনের অভাব অনটনের পরে স্বামীর তাচ্ছিল্য যে কতখানি দুঃসহ ছিল সেকথা আর ভাবতে ইচ্ছে করছিল না। উলটে মনের মধ্যে একটা দুরাকাঙ্ক্ষা বোধ হয় সেই মালাদানের পর থেকেই চাগিয়ে উঠেছিল।

স্বামীর খাওয়া-দাওয়ার পর যমুনা আর আমি খেতে বসেছি। কয়েকবারই আগে পরে যমুনার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছিলাম সে খুশীতে উজ্জ্বল। সে যেন একটা দুঃসাধ্য কাজ সমাধা করে আত্মতৃপ্তিতে খুশী। অথচ সেকথা তার বলারও প্রয়োজন নাই। এ-বাড়ির আমরা তিনজনই তার বিশদ জানি এবং জানি বলেই সকলের চোখে-মুখে হয়তো তার উজ্জ্বল ছায়াপাত ঘটেছে।

যমুনা এসে অবধি দেখেছে, আমার সঙ্গে আমার স্বামীর সম্পর্ক অনেকটা ভাই-বৌ—ভাসুর ঠাকুর সম্পর্ক। কাছে থেকে দূর কিন্তু মধুর নয়। বিরোধ নেই কিন্তু বিচ্ছেদ আছে। সাংসারিক প্রয়োজন ছাড়া একটি কথাও নেই। আমার একটা 'মন' আছে—'স্বাদ' আছে 'আহ্লাদ' আছে। আমি সাংসারিক প্রয়োজনের বাইরের দু'একটি কথা বলতে পারি—এমন কথা তিনি, কখনো বিশ্বাস করেন না। আর এ জন্যে যে তার চোখে-মুখে তাচ্ছিল্যের ছাপ—যা দেখেই আমার মধ্যে বিষণ্ণতার ছায়া, যা—যমুনা এ বাড়িতে পা রেখেই বুঝে ফেলেছিল—সেটুকু সে আজ অপরাহ্নের অকল্পিত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ধুয়ে মুছে, শুকিয়ে ফেলেছে।

ছোট্ট একটি ঘরোয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কবির এই আটত্রিশ বৎসরের জীবনে তাঁর জন্মদিনের প্রথম অনুষ্ঠান এমন সুচারুভাবে পালিত হওয়ায় তিনিও যে অত্যন্ত খুশী হয়েছিলেন তারও আভাষ মিলেছিল তাঁর কথাতেই।

অন্যদিনের মতো ওঘরে টেবিল-চেয়ারে খেতে না বসে এঘরে এসে মাটিতে পাতা পিঁড়িতে বসে পর্যাপ্ত আহারের আয়োজন দেখে বলেছিলেন—বাঃ বাঃ, চমৎকার! এই সময়ের মধ্যে তোমরা এতো সব করলে কী করে?

বললাম—যমুনাই সব এনেছে। এ কৃতিত্ব তারই।

—ও হুঁ। তা মানবো কেন। সাত আট পদ রান্নাটাও তো কম কৃতিত্বের নয়।

আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না। স্বামীর মুখে আমার রান্নার প্রশংসা শুনে আমার বুকটা আনন্দে দুলে উঠলো। রান্নার তারিফ শুনে মেয়েরা খুশী হয় সত্যি—কিন্তু এ-শুধু তারিফ নয়, আমার নিপুণ শ্রমের স্বীকৃতি। স্বামীর কাছে এ স্বীকৃতি আমার কতখানি যে সৌভাগ্যের তা আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না। সেই মুহূর্তে আমার মনে হয়েছিল আমি গৃহিণী হিসেবে সার্থক। নারী হিসেবে সার্থক নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে যে আনন্দ পায় নারী পরিজনকে খাইয়ে পরিতৃপ্ত করে, তার চেয়ে কম আনন্দ অনুভব করলাম না তাঁর প্রশংসায়।

কিছুটা খাওয়া হতেই দুটি রেকাবী পূর্ণ করে দই-মিষ্টি রাখল যমুনা।

—আবার দই-মিষ্টি। কবির প্রশ্নে আমি বললাম—এসব অনুরাধার। তিনি তাকালেন—আমি এগিয়ে দিলাম ছানার পায়েসের বাটিটাও।

—একি! এটা আবার কি?

যমুনা বললে ছানার পায়েস। এটা অভ্যর্থনা কারিণীর সংগ্রহ ও অবদান।

—বাঃ বাঃ, এত সব খাব কী করে?

রাত তো ফুরিয়ে যাচ্ছে না—আস্তে আস্তে খান না। যমুনা তাঁকে সবিনয়ে অনুরোধ করল। তিনি একবার আমার মুখের দিকে হাসি হাসি চোখে তাকালেন—বললেন, তা হলে আয়োজনটা বেশ যুৎসই-ই করেছ। আগে জানলে আরো ক'জনকে বলা যেত।

যমুনা হাতে পাখা নাড়তে নাড়তে বলল—যাদের বলা হয়েছিল তাদের সবাই কি এসেছে? এলে খুব একটা বেশী থাকত না। এক টুকরো মাংস চিবোতে চিবোতে স্বামী বললেন, বৃষ্টিটা না হলে হয়ত সবাই আসত। কে জানে বোশেখ মাসে শ্রাবণের মতো ধারাবৃষ্টি। আর সেটা সন্ধের আগে থামল-ই না।

খেতে বসে আমার সামনে এমন রসালাপ করতে কোনদিন দেখিনি। মনে মনে যমুনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলাম। আজকের মতো সহজ সরল আচরণ করা মানুষটাকে দেখলে কিছুতেই বিশ্বাস হবে না যে, তিনি কখনো উচ্ছৃঙ্খল হতে পারেন। এটাই আমার পরম সৌভাগ্য। বাইরের লোকেদের সামনে হঠাৎ তাঁর এই সদাচারণে ভেতরে ভেতরে আমি বোধহয় প্রলুব্ধ হয়েছিলাম। খাওয়া শেষ করে উঠে আসনে দাঁড়িয়েই যমুনাকে উদ্দেশ করে বললেন, মালাটা কি অনুরাধা এনেছিল?

যমুনা তার হাতে মুখ ধোয়ার জল তুলে দিয়ে বললে, না।

'ও' বলে তিনি মুখ ধুয়ে তাঁর ঘরে চলে গেলেন। বাকীটা তাঁর জানার দরকার নেই।

এক সময় যমুনা তাড়া দেয়। চাপা কণ্ঠে বলে, 'তাড়াতাড়ি খেয়ে উঠে মাস্টারমশাই না ঘুমোতে ও ঘরে চলে যাও' বলে ইশারায় নিঃশব্দে চোখে মুখে হাসল। তার হাসির ইঙ্গিত আমি বুঝেছিলাম। সেই দুরাকাঙ্ক্ষা যে আমার মনেও আসেনি তা নয়। এসেছিল—মাল্যভূষিত করার সময়ই। কিন্তু যমুনার ইশারার তাৎপর্য না বোঝার ভান করে বললাম—কেন ও ঘরে কিছু আনার বাকী আছে নাকি! ও আমাকে মুখ ভেংচিয়ে বলল—এ্যাঁ হেদারাম! তুমি একটা আস্ত বোকা!

খাওয়ার পাট চুকিয়ে আসতেই যমুনা আলনা থেকে নীলম্বরী শাড়ি, একটা পাটের খয়েরী রংয়ের আলপাকা সায়া ও একটি বডিস, হাতে দিয়ে বললে নাও—নাও চট্‌পট তৈরি হয়ে নাও।

এবার আমি সত্যি প্রমাদ গুণলাম। একি হ্যাংলাপনা! না ডাকতেই হাজির হব? একবার সেই পোড়ো বাড়িতে থাকার সময় কোন ইশারা না পেয়েই—তাঁর

বিছানায় গেছিলাম। তিনি সবেমাত্র আলো নিভিয়ে শুয়েছিলেন। তাঁর মশারির ভেতর ঢুকতেই রাস্তার কুকুরের মতো দূরদূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন—আমি অপমানে কেঁদে ফেলেছিলাম। তিনি সান্ত্বনার বাক্য শুনিয়ে বলেছিলেন, যদি কোনদিন প্রয়োজন মনে করি তোমাকে ডাকব।

বলতে পারেন—কোন বিবাহিত স্ত্রী এমন অপমানের পরও বেঁচে থাকতে পারে? তবুও বেঁচে আছি। আমরা মেয়েরা ধরিত্রির মতো সহনশীলা। মারো-কাটো, পায়ে মাড়িয়ে যাও—জোরে আর্তনাদও করব না—পাছে লোকে জানতে পারে অমুকের স্ত্রী তার স্বামীর হাতে মার খায়। এ অপবাদ যে নারীসমাজে কতবড় নিন্দনীয় তা কী করে আপনাকে বোঝাব!

আমি খানিক চুপ করে ছিলাম বলে যমুনা আমার পরা শাড়িটা টেনে খুলে ফেলে। বলে—কী দাঁড়িয়ে আছো কেন? মেয়ের জন্য ভাবতে হবে না। আমি তো রয়েছি।

অসহায়ভাবে বললাম—যাব? কণ্ঠে আমার সলজ্জ আনন্দ ও ভয়।

—হ্যাঁ, যাবে? আজকে তোমার শুভরাত্রি!

তবু কুণ্ঠিত হয়ে বললাম—যদি ফিরিয়ে দেয়?

—ফিরিয়ে দেবে কেন? তুমি তাঁর চোখে মুখে তৃষ্ণার ছবি দেখতে পাওনি? আমি যতদিন এসেছি—তাঁর এমন ভালো মেজাজ দেখিনি। যাও দেরী করো না। রাত বয়ে যাচ্ছে।

যমুনা আমাকে তাড়া দিল। আমি মন্থরভাবে শাড়িটা পড়লাম। বুকের ভেতর ধকড় ধকড় হাতুড়ি পেটা চলছে! বললাম না ডাকতেই যাব?

সে আমার কথা দিয়েই আমাকে মুখ ভেংচিয়ে বললে—'না ডাকতেই যাব।' দ্যাখো দিদি ভালোবাসাটা হচ্ছে দেনাপাওনার ব্যাপার—কিছু পেতে হলে কিছু দিতে হয়। শুধু নেবই, দেব না কিছুই এটা হতে পারে না। যদি প্রেমের কথা বল তা হ'লে বরং মানতে পারি। প্রেমে শুধু দিয়েই তৃপ্তি। কিছু সে চায় না। সেখানে আরেক সুখ। বিলিয়ে দিয়েই আনন্দ। এটা অতি মহৎ ব্যাপার। আমরা সাধারণ সামান্য মানুষ। আমরা ভালোবাসার মধ্যেই ঘর বাঁধি, ভালোবাসার মধ্যেই সুখের সন্ধান পাই!

যমুনার কথায় বাধা দিয়ে বলেছিলাম—তিনি আমাকে ভালোবাসেন না!

—বাসেন। তুমি বুঝতে পার না। অনেক পুরুষ আছে, মুখে কখনো ভালোবাসি ভালোবাসি বলে না কিন্তু অন্তর ভালোবাসায় পূর্ণ। বিশেষ করে কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী ভালোবাসি বলে কখনো ধেই ধেই করে নাচেন না। অথচ তাঁদের সমস্ত কর্মই ভালোবাসায় পূর্ণ! যমুনার উপদেশকে উপেক্ষা করে বলতে পারলাম না—একদিন আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এও কি বলা যায় নাকি!

আমি তৈরি হলাম। নিজেই মুখে স্নো-পাউডার ছোঁয়ালাম। কপালে সিঁদুর টিপটা ভালো করে দিলাম। তারপর হ্যারিকেনটা তুলে ধরে বড় আয়নাটার সামনে

দাঁড়ালাম—ভালোই দেখাচ্ছিল। যমুনা বললে—সত্যি তোমাকে কি সুন্দরই না দেখাচ্ছে। তারপর সে-ই আমাকে দোর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গিয়ে নিজের ঘরের কপাট আটকে দিল। অর্থাৎ সে আমাকে বুঝিয়ে দিল যে—সে আড়ি পাতেনি। আমরা যেন নির্বিবাদে শুভরাত্রি যাপন করি।

দরজা ভেতর থেকে ভেজানো ছিল। চুপি চুপি কপাট ঠেলে ঘরে ঢুকে দেখি, তিনি শুয়ে শুয়ে কি পড়ছেন। টেবিলে টেবিল ল্যাম্পটার চিমনিটি একটি পোস্ট কার্ডে আলতু করে ঢাকা। আমি টেবিলের সামনে যেতেই চমকে উঠে বললেন—হঠাৎ কি ব্যাপার ?

বললাম—একটু উঠুন, বিছানাটা ঝাড়বো।

তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বইয়ের মধ্যে মুখ রেখেই বললেন—ঝাড়তে হবে না।

বলতে পারলাম না, হবে। জোর খাটাতে পারলাম না।

আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মুখ তুলে তাকিয়ে একটু নীরব থেকে বললেন, কি হলো। দাঁড়িয়ে রইলে কেন—কিছু বলবে ? মাথা নেড়ে জানালাম—না। আবার বইয়ের দিকে চোখ নামালেন। আমি ভাবছিলাম—কী বলবো। আমি যে ভিখারিণী হয়ে এসেছি। আমার মনে যে দারুণ ক্ষুধা। পেটে ক্ষুধা মুখে লাজ রেখে লাভ কি ? ভাবলাম বলেই ফেলি,—তোমার পাশে ঘুমোতে এসেছি। ধ্যাৎ, বলে মনের মুখে ঝাঁটা মারলাম। না না, এতো হ্যাংলাপনা করা যায় না। যমুনা যে আমার ক্ষুধার কথা মনে করিয়ে দিয়ে আমাকে কাতর করে দিয়েছে, সেকথা একবারও মনে এলো না। যমুনা বলেছিল—তিনি আমাকে ভালোবাসেন,—হায়রে ভালোবাসা। মুখ দেখে যিনি মনের কথা বোঝেন না তিনি কেমন ভালোবাসেন ? স্বামী আবার মুখ তুলে তাকিয়ে বললেন—তবু দাঁড়িয়ে আছো যে ? আমি তাঁর বিছানায় গিয়ে পা গুটিয়ে বসে খাটের ডালার সঙ্গে গোটানো মশারিটাকে টেনে নামাতে গিয়েছিলাম। হঠাৎ বাজখাঁই গলায় খেঁচিয়ে উঠলেন—কি ব্যাপার ? কি হচ্ছে। যাও বলছি। কিছু করতে হবে না—বলে আমার হাত থেকে মশারির কোণাটা ছিনিয়ে নিয়ে আবার চাঁদোয়া করে রাখলেন। তারপর তীব্র শ্লেষের সঙ্গে বললেন, তোমাকে বলেছি—প্রয়োজন হলেই ডাকবো। নির্লজ্জ বেহায়া মেয়ে কোথাকার।

এবার আর থাকতে পারলুম না—অবুঝ শিশু বালিকার মতো কান্নার সঙ্গে দু'চোখ বয়ে অশ্রুধারা ঝরিয়ে চলে এলাম। আমি যে কেমন করে ও-ঘর থেকে এ-ঘরে চলে এসেছিলাম সেকথা এখনো মনে করতে পারি না। এর পর আর কি কথা থাকতে পারে বলুন। আমার মতো হতভাগিনীদের আত্মহত্যা ছাড়া আর কি আছে সম্মানের পথ ?

ঐ দিনের ঘটনায় যমুনা কতখানি ক্ষুব্ধ হয়েছিল জানি না—কিন্তু মর্মাহত হয়েছিল ভীষণভাবে। ভালোভাবে কয়েকদিন তার সঙ্গে কথা বলতে পারেনি। তার ভুলের জন্যই যে, আমি এমনভাবে অপমানিত হলাম—একথা সে বুঝেছে বলে বার বার আমার

কাছে ক্ষমা চেয়েছে। সে ক্ষমা না চাইলেও তাকে আমি দোষী ভাবতে পারিনি। কারণ আমার ভেতরের রাক্ষুসিনীই তো আকণ্ঠ সুধাপানের তাড়নায় এমন নির্লজ্জ করে তুলেছিল। ছিঃ, ঘেন্না রাখার জায়গা নেই! আমার মতো হতভাগিনীদের চোখে বোধ হয় জলের অভাব থাকে না। তাই সারারাত কেঁদেও তা' শেষ করতে পারিনি। যমুনা যতবার প্রবোধ দিতে চেষ্টা করেছে, ততবার আরো বেশী করে কেঁদেছিলাম।

কাকভোরেই যমুনা বাপের বাড়ি চলে গেল। আমার সংসার আমার কাছেই রইলো পড়ে। আমার অপমানে সে-ও যে ক্ষুব্ধ, অপমানিত, কাকভোরে চলে যাওয়াটা তাই বোঝায়। এ সময় ওর চলে যাওয়াটা যে আমার পক্ষে কতবড় শাস্তি হবে সেকথা আর তাকে বোঝাতে পারিনি। শুধু বলেছিলাম, কখন আসবে?

—কখন আসব, কবে আসব—একথা বলতে পারছি নে দিদি। বুকটা আমার ভেঙ্গে গেছে, বলে সে দ্রুত পায়ে চলে গিয়েছিল।

কিন্তু এই সাতদিনেই আমার সঙ্গে আমার স্বামীর সম্পর্কটা আবার পূর্ববৎ অবনতির দিকে চলে গিয়েছিল, অর্থাৎ 'হ্যাঁ—না'র বেশী কথা নেই—শব্দও নেই। চান-খাওয়ার জন্য কারুর ডাকাডাকি নেই। মেয়েটা চেঁচিয়ে মুখে রক্ত উঠে গেলেও একবার ডেকে জিজ্ঞেস করার কেউ নেই। সংসার চলার জন্য তাঁর মাথা-ব্যথাও নেই। বিকেল হলেই আবার বের হওয়া এবং নেশা করে রিকশা চেপে রাত করে বাড়ি ফেরা। আমি যা জোটাতে পারি রান্না করে ও-ঘরে টেবিলে রেখে আসি, কোন-দিন এমনিই ঢাকা পড়ে থাকে।

কয়েক মাস আগে বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনীর বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ লিখে বেশ কিছু টাকা পেয়েছিলেন, সেটা যমুনার দৌলতে আমার কাছেই জমা ছিল। সংসারের অভাব মেটাতে এতদিনে তা শেষ হয়ে গিয়েছে। কলকাতার কোন সাময়িক পত্র তার লেখার জন্য টাকা-পয়সা দেন কিনা আমি জানি না। হয় তো তিনি নিজেই গিয়ে নিয়ে আসেন—নইলে তাঁর নবাবীয়ানা চলে কি করে?

আয়ের আরেক পথ আছে, তা হলো প্রশ্নপত্রের নোট লিখে দেওয়া। কিন্তু এ জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়। খেয়ালি মানুষ হুকুম মাফিক শ্রম প্রায়ই করেন না। সে জন্যই ক'বারই তাঁকে কলেজের চাকরি ছাড়তে হয়েছে—অথবা ছাড়ান গিয়েছে।

যমুনা যখনই তাঁকে নোট লিখতে বলত—তখন বলতেন এটা অসৎকর্ম। বইটি আমার নামে বের হবে না। হবে নামি লোকের নামে। আমি শুধু মজুরীটা পাবো—সম্মানটা নয়। তাই ইচ্ছে করে না ওসব লিখতে। কিন্তু পেটের জন্য যমুনার চাপে কখনো কখনো লিখতেন। লিখতে না চাইলে আমার রাগ হতো। আমি বুঝতে চাইতাম না এ জন্যে তাঁর বুকের ভেতর কি যন্ত্রণা। উল্টে কবিতা—কবিতা লিখলে রাগ হতো। ভাবতাম এ ছাইপাশ লিখে কী হবে। কবিতা কি ভাত দেবে? কিন্তু যমুনার দৌলতে যেদিন তাঁর জন্মদিন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পত্র-

পত্রিকায় তাঁর কবিতা পড়ে শোনানো হলো—সেদিন কিন্তু গর্বে বুকটা ফুলে উঠেছিল। একটা মানুষের মধ্যে এত মহৎ কথা—এত মহৎ ভাবনা লুকিয়ে থাকে—যা বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না। আপনি বলবেন—আমি লোকটাকে চিনতে পারিনি; যমুনাও তাই বলেছিল। দৈনন্দিন জীবনে যাকে দেখছি—যে আমাকে মানুষের মর্যাদা না হোক নারীর মর্যাদাও দেয় না, তাঁকে চিনতে পারিনি? যদি না-পেরে থাকি সেটা আমার দোষ নয়। দোষ আপনাদের সমাজের।

যমুনার যুক্তি ছিল—কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীরা একটু এলোমেলো হয়েই থাকে। আর যে-সব মেয়েরা মাস্টার মশাইয়ের কাছে আসে বলে তোমার মন খুঁত খুঁত করে, আসলে তা' কিছুই নয়। ওটা আমাদের মেয়েদের স্বভাব। আমি বলেছিলাম, পাড়ার লোকও তো ভালো বলে না। জবাবে যমুনা বলেছিল আমাদের দেশটা অনেক পিছিয়ে আছে। অশিক্ষা আর কুসংস্কারে, বলতে পারো ডুবে আছে। লেখাপড়া শিখলেই তো শিক্ষিত হয় না—সামাজিক শিক্ষা যতক্ষণ না উন্নতমানের হয়—ততক্ষণ এ সব থাকবেই। এ ব্যাপারে পুরুষরাই বা কম কিসে? তবে মেয়েদের উচিত ছিল তাঁকে উচ্ছৃংখল হতে না দেওয়া।

যমুনা আমাকে উপদেশ দিয়ে বোঝাতে চেয়েছিল তাঁর মাস্টারমশাই ধোয়া তুলসীপাতা। আমি তাঁকে চিনি না। বুঝতেই পারি না। কিন্তু জন্মদিনের ঘটনায় সে যে আঘাত পেয়েছিল—তারপরও কি বলবো তাঁকে যমুনা চিনেছিল!

বাড়ি থেকে ফিরে এসে যমুনা ও-ঘরে আড্ডা দেওয়াটা একেবারেই কমিয়ে দিয়েছিল। আমার মতোই আমার সংসারটা তার ভেবে পুরো দায়িত্বটাই মাথায় তুলে নিয়েছিল। সংসারের কাজ শেষ করে সকাল-বিকাল দুবেলা টুইশানি করে বেড়াত। তাতে যা আয় হতো তাও সে এই সংসারেই ঢালত। আমি খুব কুণ্ঠিত হতাম। স্বামীর রোজগারে সংসার চলে না। মেয়েটার জামা-জুতোর পয়সা জোটে না। উপযুক্ত খাদ্য জোটে না। পরের মেয়ে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে সংসার চালায়—এর চেয়ে গ্লানির কি আছে বলুন। অথচ স্বভাবটা পাল্টালে অভাবটা কি থাকতো? যমুনা যে টুইশানির টাকাই ঢালে তা' নয়, মাঝে মাঝে বাড়ি থেকে এনেও এ সংসারে খরচ করে। কাজেই ওকে আমি নিজের জন বলেই ধরে নিয়েছি। এমনি করে যমুনার ওপর অগাধ বিশ্বাস সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল আমার। একদিন যমুনাকে বললাম তোমার মাস্টারমশাইকে এক সময় জিজ্ঞেস করো তো এ সব তিনি লেখেন কেন? কাঁড়ি কাঁড়ি লেখা ছাপা তো কোনদিন হবে না। তার চেয়ে বরং পাঠ্য বই লিখলে তো পারে? দু'পয়সা আয় হয়।

যমুনা কথাটা শুধিয়েছিল। তিনি নাকি দার্শনিকের মতো জবাব দিয়েছিলেন—না লিখে পারি না, তাই। মানুষের মনটা হচ্ছে চাষের জমির মতো। যে বীজই ফেল না কেন—পারিপার্শ্বিক অবস্থা যদি প্রবল বিরোধী না হয় তবে অংকুরিত হবেই। চারিদিকে হাজার হাজার চিন্তার বীজ ঘুরে বেড়াচ্ছে, কখন কার মধ্যে কোনটা

এসে গেঁথে বসবে সে কথা যেমন বলা শক্ত আর কখন তা অঙ্কুরিত হয়ে ফুলে-ফলে বিকশিত হয়ে উঠবে, সে কথাও নিশ্চয় করে বলা যায় না। তখনই শুরু হয়ে যায় গর্ভযন্ত্রণা। ভূমিষ্ঠ অর্থাৎ প্রকাশনা না হওয়া পর্যন্ত তার নিষ্কৃতি নেই। লেখকের লেখাই হচ্ছে প্রকাশ—আর তা যত্ন করে লালন-পালন করে ছাপাটা হচ্ছে বহির্প্রকাশ। তখন তা' জগতের কল্যাণ হবে জেনে, লেখকের পূর্ণ তৃপ্তি। যমুনার মুখে এসব কথা শুনে আমি হাঁ করে থাকতাম। বাস্তবের সঙ্গে এ-সব কথার মিল খুঁজে পেতাম না।

যমুনা সেদিন আমার স্বামীর পরিচয় দিয়ে আরো বলেছিল ওঁর মধ্যে অনেক মহৎ বস্তু আছে—তুমি তা খুঁজে দেখতে চাও না—তাই দেখতে পাও না। যমুনার কথা বলার ঢং দেখে আমার মনে হয়েছিল—তার মধ্যে বিদুষীপনার অহংকারটা আস্তে আস্তে মাথা তুলছে। আমি বোধ হয় স্ত্রীর আত্মমর্যাদায় আঘাত অনুভব করেছিলাম—তাই চলে এসেছিলাম।

মনে মনে ভাবলাম, সাত বছর ধরে স্বামীর ঘর করছি। যমুনা এসেছে আজ ক'মাস, এরই মধ্যে সে আমার স্বামীকে চিনে ফেলেছে, বুঝে ফেলেছে। আমার আত্মমর্যাদার অভিমানটা বোধ হয় এখানেই। কিন্তু পালটা যুক্তিও মনে এসেছিল। হবে না কেন? এর মধ্যেই তো যমুনা ওঁকে নিয়ে এদিক-সেদিক ঘুরেছে। এই সেদিনও তো কোন্ প্রকাশকের নাম করে একবেলা ঘুরে এলো। আর আমি? আমাকে নিয়ে কোন দিন তিনি পথে বের হননি। কলকাতাকে দেখার জন্য কত দূর দূর দেশ থেকে কত লোক বেড়াতে আসে; দেখতে আসে—কলকাতার থিয়েটার, নাচ ঘর, যাদু ঘর, খেলার মাঠ, গড়ের মাঠ, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল—টাউন হল, রাজভবন, কফি হাউস, হাইকোর্ট, চিড়িয়াখানা, গোলপার্ক, গোলদীঘি, লালদীঘি, বেলুর-দক্ষিণেশ্বর, বালিগঞ্জ লেক—আর আমি কলকাতার উপকণ্ঠে ঘরের কোণে বন্দিনী। বাইরের জগত থেকে বিচ্ছিন্ন এক জীব। আমি তাঁর স্ত্রী হয়েও ঘরে বাইরে সব কিছু থেকে বঞ্চিতা। এ সব কথা যখনই মনে পড়ত ক্ষোভে দুঃখে মরে যেতে ইচ্ছে হত।

* * *

শৈশবে আমার বাড়ন্ত গড়ন দেখে, যৌবনের উন্মেষ ঘটার আগেই মা-বাবা ঠাকুমা—এমনই শুচিবাইগ্রস্থ হয়ে পড়েছিলেন যে,—চারিদিকে বাধা-নিষেধের গণ্ডি এঁকে দিয়েছিলেন। ওঁরা আমাকে হাঁটতে শেখাননি আছাড় খেয়ে ব্যথা পাব বলে।

এমনকি ভেতর বাড়ির পুকুর ঘাটে একাকী যাওয়াও নিষিদ্ধ ছিল। যদি পরীর নজরে পড়ি! আমার মনে যাতে কোন কৌতূহল জাগতে না পারে তার জন্য প্রেম ভালোবাসা শব্দগুলির মতো পেঁয়াজ রসুন খাওয়াও ছিল নিষিদ্ধ। তাদের মতে আমি তাম্রপাত্রে সংরক্ষিত পবিত্র গঙ্গাজল। বাইরের জগতের গাছপালা মানুষজন সবই ছিল অপরিচিত। বিবাহিতা মেয়েদের সঙ্গে গল্প করাও নিষেধ ছিল। কি জানি কেন গোপন কথাও যদি জেনে যাই। বলুন আমার মতো নীরেট হাবাগোবা মেয়ে কি করে কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীর হৃদয়-মন্দিরে ঢুকতে পারি? যার মধ্যে

কৌতূহলই নেই সে অপরের হৃদয়ে কি আছে জানতে চাইবে কেন? যমুনা সেই কথাই বোধ হয় বলেছিল, "তুমি খুঁজে দেখতেও চাওনি"। এ জন্য কে দায়ি? আমি? না। দায়ি, আমার পারিবারিক শিক্ষা। অপসংস্কারে আচ্ছাদিত যে সমাজ, দায়ি সে সমাজ। অথচ যমুনা আমাকেই দায়ি করে। কেন—আমি তো এ বাড়িতে এসেছিলাম কাঁচা বয়সে। আমাকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার দায়িত্ব কি তাঁর ছিল না? শাশুড়ী ঠাকরুণ তো বলেছিলেনই 'ও তো কাঁচা মাটির ডেলা। ওকে যা শেখাবি তাই শিখবে'। যমুনা তার মাস্টারমশাইকে এ সব কথা বলে না। শুধু আমাকেই ঠেসে ধরে। এ জন্য মাঝে মাঝে ওর ওপর রাগ হয়। তবু আমি ওকে ভালোবাসি। কিন্তু আমি কি জড়পদার্থ? আমার মধ্যে মানুষের মতো সচেতনা নাই বা থাক, ক্ষুধা-তৃষ্ণা তো আছে। হৃদয় যখন আছে তার তৃষ্ণা থাকাও স্বাভাবিক নয় কি?

যমুনা বলেছিল—তোমার হৃদয় আছে ঠিকই—কিন্তু তা মরুভূমির মতো শুকনো। সেখানে বসন্তের ফুল ফুটবে না, নইলে এত বড় সমুদ্র সামনে রেখে চুপ করে রইলে কি করে? ছুটে গেলে না কেন সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে?

বোকার মতো বলেছিলাম—আমার স্বামী সমুদ্র!

দৃঢ় স্বরে সে বলেছিল—হ্যাঁ, তিনি সমুদ্রই। তাঁর মধ্যে অনন্ত ক্ষুধা। সহস্র নদীর পিপাসা বুকে নিয়ে নিরম্বু উপবাস—এ-কি কম কথা? পড় তো না তাঁর কবিতা! তিনি বলেছেন—

"বুকে মোর সমুদ্র পিপাসা
মনে তাই ভাঙনের নেশা পাড়ের সীমানা।।"

বুঝলাম যমুনাই তাঁকে চিনেছে, জেনেছে, বুঝেছে। তাই তার এত স্রোত,—'এত কলকল ভাষ' তাই সে খরস্রোতা হয়ে ছুটেছে লক্ষ্যের দিকে। হঠাৎ আমার মনে পড়ল একদিনের ঘটনা।

যমুনা ওঘরে তাঁর চেয়ারের হাতল ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদছিল। আমার নিষ্পাপ স্বামী তার মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে সান্তনা দিচ্ছিলেন। আমি ঘরে যেতেই দু'জনে চমকে উঠলেন। আমি লজ্জায় অপ্রতিভ হয়ে দ্রুত পায়ে চলে এসেছিলাম ফিরে। ওদের চমকে ওঠাটা আমার ভালো লাগছিল না।

এমন দু'একটা দৃশ্য আমি আগেও দেখেছি। কিন্তু তা মনে দাগ কাটেনি। কারণ তারা কেউ যমুনার মতো খরতর নয়। তা ছাড়া এরা বয়সে যমুনার চেয়ে অনেক ছোট।

যমুনা তখনো আসেনি। মালা বলে একটি মেয়ে আসত। তার হাতে লাল মলাটের মোটা খাতা থাকত। সে আসত এগারোটা নাগাদ, বোধ হয় ইস্কুল ছুটির পর। তখন অন্যেরা বড় কেউ থাকত না। আমি রান্নাঘরে ব্যস্ত থাকতাম—মনে কোন সন্দেহ ছিল না। সেদিন তাঁর গেঞ্জি জামা কাচার জন্য ও-ঘরে গিয়েছিলাম।

দেখলাম কবির বুকের ওপর মালা কাত হয়ে শুয়ে আছে আর কবি তার মোটা খাতা খুলে শুয়ে শুয়ে কবিতা পড়ছেন সুর করে। আমি ঘরে গিয়ে আলনা থেকে ময়লা গেঞ্জি জামা খুঁজছিলাম। এতক্ষণ ওরা আমাকে দেখেনি। যখন দেখল তখন মালা উঠে সোজা হয়ে বসেছে। কিন্তু চমকে ওঠেনি। আরেকদিন ঐ মালাকেই থুতুনি ধরে আদর করতে দেখেছিলাম—তাতেও আমর বুকের ভেতর রক্তের ছোটাছুটি শুরু হয়নি। কিন্তু যমুনার বেলায় হল কেন?

দিন দুয়েক বাদে রান্নাঘরে দুজনেই কাজ করছিলাম—ঠাট্টা করে সামান্য শ্লেষ মিশিয়ে বলেছিলাম তুমি কিন্তু আমার সব কিছুরই ভাগীদার হলে—যেমন কাজের তেমনি সংসারের। কথাটার জবাব দিল না সে। মেয়েকে নিয়ে কলকাতায় চান করতে চলে গেল। পরে একসময় কথাপ্রসঙ্গে নিজেই গায়ে পড়ে বলল—'সুখের ভাগীদার সবাই হতে চায় দিদি—দুঃখের ভাগীদার হতে কার সাধ যায়?'—একঢিলে দুই পাখি মারল সে। এতক্ষণ বাদে প্রশ্নের জবাব বলেই ধরে নিলাম। ওদের চমকে ওঠার মধ্যে পাপের ছায়া দেখেছিলাম সে কথা চাপা রেখে বলেছিলাম—আমার কিন্তু এখনো গায়ে হাত পড়েনি। সে খুশী হয়ে জবাব দিয়েছিল সেটা তোমার সৌভাগ্য। অর্থাৎ সে ধরে নিয়েছিল—ওরা যে ভালোবাসাবাসির নাটক করেছিল, সেটা মোটেই বুঝিনি। তাকে কোন অন্যায়ের জন্য যে শাসন করেছিলেন—এটাই আমি বুঝেছি। হায়রে বিদুষী যমুনা! শাক দিয়ে মাছ ঢাকা গেলেও গন্ধ ঢাকা যায় না; হাসিমুখেই শুনিয়েছিলাম তাই।

মাস্টারমশাইয়ের শাসনে ছাত্রীর যে অভিমান হয়েছে, সেটা বোঝাতে যমুনা বলেছিল—তুমিই আজ খেতে দিয়ে এসো তোমার কর্তাকে। ভালোই হল—নিজের হাতে স্বামী সন্তানকে খাওয়াতে কে না চায়। যমুনা তার কর্তব্যপরায়ণতা দিয়ে এতদিন এ সৌভাগ্যটাও কেড়ে নিয়েছিল।

তিনি যথারীতি টেবিলে খাচ্ছিলেন। আমি দাঁড়িয়ে পাখা দিয়ে গরম ও মাছি তাড়াচ্ছিলাম। আধাআধি খাওয়া হয়ে এলে বললাম, 'ধার-দেনায় চুল পর্যন্ত বিকোনোর অবস্থা হয়েছে।' প্রথমে কিছু বললেন না। আমি জানি আমার কথার উত্তর মধু হয়ে আসবে না। পরে আবার বললাম, 'একটা স্থায়ী আয় না হলে এভাবে চলা দায় হয়ে ওঠে।' তিনি একটু মুখ তুলে একপলক তাকিয়ে বললেন—'বেশ তো, চুল বেচে যদি কিছুটা ধার শোধ হয় মন্দ কি—কী হবে মাথায় এত লম্বা লম্বা চুল রেখে। লাভের মধ্যে তো দু'কৌটো তেল খরচ!'

কথা শুনে আমার পিত্তি জ্বলে গেল। আমার সুন্দর ঢেউখেলানো চুলকেও প্রচ্ছন্ন আঘাত! আমার সৌন্দর্যে তাঁর কোন আকর্ষণ নেই। হাসতে হাসতে পালটা আঘাত দিয়ে বললাম—'আমার চুল দিয়ে ক'পয়সা হবে, সবার দিলে যদি কিছু হয়' বলে মুখ ধোয়ার জল আনতে চলে গেলাম।

ফিরে এলে বললেন—'ভেবেছি, কলেজ স্ট্রীটে একটা বইয়ের দোকান দেব!'

কথাটা শুনে আমার ভালোই লাগল—বললাম 'দোকান করতে টাকা লাগবে না ? আমাদের তো সঞ্চয় কিছুই নেই।'—বললাম না—সবই তো গিয়েছে পেটে আর বোতলে।

—'লাগবে। যমুনার নামে যে একবিঘা জমি আছে সেটা বিক্রী করে টাকা দেবে সে।' গম্ভীর কণ্ঠে কথা কয়টি বলে উঠে পড়লেন তিনি।

টাকা সংগ্রহের ব্যবস্থা দেখে মনটা অকারণেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। তা'হলে সন্দেহটা সঠিক পাকা-পোক্ত ব্যবস্থা। অপরের স্বামীত্বে স্থায়ীস্বত্বে বসবাসের সুন্দর ব্যবস্থা।

মুখে কিছু বললাম না। প্রতিবাদ করব কোন মুখে ? পৈতৃক সম্পত্তিতে আমার কোন অধিকার নেই। আর আমার নামে আলাদা কোন সম্পত্তিও নেই যে—বিক্রি করে টাকা দেব। মনের সুখে চাবুক মেরে চলে এলাম।

মেয়েটা বড় হচ্ছে। একটা মাত্র মেয়ে তাকে মানুষ করতেই কুঁকড়ে যাচ্ছি। অশান্ত মনকে সান্ত্বনা দিলুম—এই বলে যে, অভাব-অনটনের সুযোগটা যদি নেয়-ই সে তবে তাকে আর কি বলা যাবে! সব কাজে যেমন মুখ বুজে থাকি এ ব্যাপারেও তেমনি থাকব।

তিনি মুখ ধুয়ে ঘরে চলে গেলেন। আমি এ-ঘরে এসে দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে উঠোনের কোণে পেয়ারা গাছটার ফাঁকে ঘোঁয়াটে আকাশের পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলাম! চোখ দুটো সেইজন্যই বোধ হয় জলে ঝাপসা হয়ে এসেছিল।

স্বামীর কাছে প্রাপ্য বলে যখন কিছু নেই, আব্দার করারও যখন কিছু নেই, তখন তুই আর এসব বাদ-প্রতিবাদে যাস কেন! আমার অজ্ঞাতেই আমার মন কথাগুলো আমাকে বললে; তবুও মনের মধ্যে যমুনা ও তার মাস্টারমশায়ের সম্পর্কটার সম্বন্ধে একটা ঘোট পাকাতে থাকল। এতটা করার পেছনে তার কি স্বার্থ থাকতে পারে ? যমুনার প্রতি আমার যে অকুণ্ঠ বিশ্বাস ছিল—তা যেন ঐ ঘোলাটে আকাশটার মতোই ঘোলাটে বোধ হচ্ছিল।

কোনকাজই ভালো লাগছিল না। তবু সংসারের চাকা ঘোরাতেই হবে।

আজকাল যমুনা ও'র আবার ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। কথায় কথায় উনি ওকেই ডাকেন। মাঝে মাঝে টুইশানি কামাই করে যমুনা ও'র সঙ্গে কলকাতা যায়। যাবার সময় বলে, ফিরতে দেরী হলে কিছু ভেব না।

একদিন বেশ রাত করেই দু'জনে ফিরেছে। দু'জনের একজনও খেল না। বলল, এক পাবলিশারের বাড়িতে খেয়ে এসেছে। মাস্টারমশাইয়ের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন এক কালে।

যমুনার কথা বিশ্বাস করলাম। সে আরো কি যেন বলেছিল, কানে শুনলেও মনে ধরেনি! ওরা খায়নি, আমারও খেতে ইচ্ছে করেনি। হাঁড়িতে জল ঢেলে এসে শুয়ে পড়লাম। যমুনা আগেই শুয়ে পড়েছিল। বড় তক্তপোষটায় আমরা তিনজনেই

এক মশারীর ভেতর ঘুমোই। শুতে গিয়ে দেখি—আমার আর যমুনার বালিশের মাঝখানে ওর মানিব্যাগটা। ওর বালিশের তলা থেকে বের হয়ে আছে মানিব্যাগের অনেকটাই। ব্যাগটা ভালো করে ওর বালিশের তলায় ঢোকাতে গিয়ে অদ্ভুত একটা কৌতূহল হল। একবার ওর ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকালাম। ও ঘুমোচ্ছে। বেশ গাঢ় ঘুম। ব্যাগটা হাতে তুলে নিয়ে খুলে ফেললাম। ব্যাগে কী আছে? কতটা টাকা আছে ওর। ব্যাগ খুলে তার টিকেট পকেটে হাতড়াতেই দুখানি স্টার থিয়েটারের পাঞ্চ করা টিকেট পেলাম। টিকেটের নিচে কি একটা শক্ত লাগছিল। টেনে বার করলাম। দেখে চক্ষুস্থির হয়ে গেল। মশারির ভেতর থেকে হাত বাড়িয়ে হ্যারিকেন আলোটা আরো একটু চড়িয়ে দিলাম। দেখলাম এক নাটকীয় ভঙ্গীতে ছাত্রীশিক্ষক দুজনের ফটো। প্রায় তাঁর গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যমুনা।

আমার বুকের ভেতর ঘন নিঃশ্বাস আরো ঘন হয়ে এলো। আমি বুঝতে পারছিলাম না এখন আমার কি করা উচিত। একবার ভাবলাম ওকে চুলে ধরে তুলে গালের ওপর ক'টা চড় বসিয়ে দিই। আবার ভেতর থেকে কে যেন বলল—থাক থাক, অপেক্ষা কর। আরো দেখার জন্য অপেক্ষা কর। তাড়াতাড়ি টিকেট ও ফটো রাখতে গিয়ে টিকেটে নজর পড়ল। আজকেরই তারিখ। মূল্য দশ টাকা—শ্রেণী ১ম। বলতে পারেন, সে রাতটা আমার কেমন গিয়েছিল! এক এক সময় মনে হত দিই সব ফাঁস করে। আমি যে ওদের দুর অভিসন্ধি বুঝে ফেলেছি দিই একথা জানিয়ে। না, এখনো সময় হয়নি। সবুরে মেওয়া ফলে নাকি! দেখি। এক এক সময় মনে হত সয়ে যাওয়াটা পাপকে প্রশ্রয় দেওয়া। কিংবা কখনো মনে হতো,—তিনি যখন আমাকে নিয়ে সুখী হননি—ওকে নিয়ে যদি সুখী হন—তবে তার পথের কাঁটা হই কেন? আমি বরং বিষ খেয়ে চিরদিনের মতো সরে যাই। ওরা শান্তিতে থাকুক। আসলে আমার ভেতরটা জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছিল। সত্যের মিথ্যে অভিনয় করে সেই জ্বালা-যন্ত্রণা দিবারাত্র ভোগ করে যাচ্ছি। তবুও অন্তরের জ্বালাকে অসীম সহ্যশক্তি দিয়ে ঢেকে রেখে সংসারের নিত্যদিনকে স্বভাবিকের মতোই চালাচ্ছি। মাঝে মাঝে কেবল মাকে ডাকি। এ বাড়িতে ঠাকুরের আসনপাতা নিষিদ্ধ। শাশুড়ী থাকতেই ছেলেরা ভেঙে দিতে চাইছিল। তিনি স্বর্গে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঠাকুরের আসনও উঠে গেছে। তাই প্রকাশ্যে ভগবানের নাম নেওয়াও নিষেধ। 'মা' ডাকায় নিষেধ নেই। সেই জন্য মাকেই ডাকি। মা, আমাকে রক্ষা কর।

দিন কয়েক বাদে একদিন যমুনা বললে—মাস্টারমশাই বলেছেন, অভিজিৎবাবু আসবেন দুপুরে, এখানে খাবেন।

বললাম, 'কে অভিজিৎবাবু?'

—'সেই যে পাবলিশারের কথা বলেছিলাম—ওনাকে মাস্টারমশাই নেমন্তন্ন করেছেন। তিনি মাস্টারমশায়ের পাণ্ডুলিপিগুলো পড়ে দেখবেন। ভালো মনে করলে ছাপার দায়িত্ব নেবেন।'

প্রস্তাবটা শুভ। অন্তত বইয়ের দোকানের থেকে ঢের বেশী শ্রেয়। ছাপা হলে তাঁর বই কি বিক্রী হবে না?

আমি নতুন উদ্যমে রান্নার কাজে লেগে গেলাম। সেদিন একসময় যমুনাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'উনি কোথায় থাকেন?' যমুনা বললে, 'উনি শ্যামবাজারে থাকেন। বইয়ের দোকান কলেজ স্ট্রীটে।'

বেশ ভালোই। যথ সময ভদ্রলোক এলেন। আস্তে কথা বলতে পারেন না। ও-ঘরে কথা বললে রান্নাঘর থেকেও শোনা যায়। রান্না হয়ে গেলে যমুনা গিয়ে ওই টেবিলেই দু'জনকে খেতে দেওয়ার ব্যবস্থার কথা বলতেই অভিজিৎবাবু বললেন—'না না, টেবিল চেয়ারে খাব না। ও তো মশাই নিত্যদিন মেসে খাই। বাড়ির খাওয়ার বাড়ির মতো হয়ে খাওয়াই উচিত। আসনপিঁড়ি পেতে দু'জনকে খেতে দিন।' অভিজিৎবাবুর কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। তিনি মেসে থাকেন? অথচ যমুনা বলেছিল —নিজের বাড়ি। স্ত্রীপুত্র পরিজনের সঙ্গে থাকেন। মাস্টারমশাইও শেষে সায় দিলেন পিঁড়িতেই বসে খাবেন। বুঝলাম, বই প্রকাশের স্বার্থেই—সহজে মাস্টারমশায়ের সম্মতি। নইলে তাঁর ঘর থেকে এ ঘরে বাইরের কোন লোককেই তিনি ঢোকাতেন না। কারণ—এ ঘরে এলেই যে কেউ বুঝবে এ-ঘরের দৈন্যতার সঙ্গে ও-ঘরের কোনমাত্র মিল নেই। ও-ঘরে আভিজাত্যের পরিপাট। এ-ঘরে ভিখারিণীদের বাসা।

ঘরের মেঝেতেই আসন পেতে দেওয়া হল। যমুনা পাখা নিয়ে বসল। আমি পরিবেশন করছি। মেয়েটা পাড়ার একটা শিশু বিদ্যালয়ে। ভদ্রলোক বেশ রসিক। খেতে বসেই এদিক ওদিক তাকিয়ে মাস্টারমশাইকে বললেন, 'আপনি বেশ সাফ্‌ সুতরো।' ভদ্রলোক পূর্ববঙ্গের লোক। তার কথায় পূর্ববঙ্গের টান বেশ স্পষ্ট। স্বামী বোধ হয় কথাটার মানে বোঝেননি। বললেন—'মানে?'

—মানে বুঝলেন না? ছেলেপুলে নাই দেইখ্যা বললাম, তারপরই দু'জনে হাসি। আমরাও তার রসিকতায় নিঃশব্দে হাসলাম।

প্রথম বারে যে ভাত দিয়েছিলাম তা শুক্তো ভাজাতেই শেষ। দ্বিতীয় বারে থালা-ভর্তি ভাত দিতেই চেঁচিয়ে উঠলেন আরে করছেন কি, করছেন কি। অত ভাত খামু কি কইর‍্যা।

স্বামী বললেন, আস্তে আস্তে খান না, তাড়া তো কিছু নেই। —আস্তে আস্তেই খামু। আমি একটু আসতেই খাই। নাকে মুখে গুজনের স্বভাব নাই কিনা। কারোর গুলামি তো করি না। স্ব+অধীন, স্বাধীন। তারপর 'হো হো' করে নিজেই হাসলেন। তাঁদের উভয়ের থালার পাশে মাছের ঝোল-ঝাল-কালিয়া, মুগের ডাল ও ইলিশ মাছের অম্বল বাটি বাটি সাজিয়ে দিয়েছিলাম। অভিজিৎবাবু হঠাৎ আমার দিকে চোখ তুলে বললেন—'কোনডা আগে খাইব—বলেন। চ্যাইখ্যা মনে হয় সবই ভালো—উপাদেয়।' যমুনা বললেন—'আগে ডাল - বেগুন ভাজা নিন।'

—কী বললেন—আগে ডাইল খাব! ডাইল খ্যাইয়া প্যাট ভইর‍্যা গেলে মাছ

আর খাওয়া হইব না। বুদ্ধিটা তো ভালোই দিলেন! বলে হাসি হাসি চোখে তাকালেন।

স্বামী তখনো ডাল খাচ্ছিলেন। বললেন, আপনার যা ইচ্ছে তাই দিয়ে শুরু করুন না কেন। ওদের বুদ্ধি শুনে কি হবে।

ওঁদের কথা শুনে আমার হাসি পাচ্ছিল। হঠাৎ মনে হল ডিমের কারী দিতে ভুলে গিয়েছি। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে নিয়ে এসে অভিজিৎবাবুর পাশে রাখতেই উনি বলে উঠলেন—'আবার এইডা কি ?'

—যমুনা বললে—'ডিমের কারী।'

অভিজিৎবাবু রুইয়ের কালিয়া দিয়ে আবার শুরু করলেন। তারপর ডিমের কারী পাতে ঢালতেই ভাত শেষ—আমি তৈরি ছিলাম, আবার ভাত দিলাম।

—'দাঁড়ান দাঁড়ান খ্যাইয়া লই', বলে—স্বামীর পাতের দিকে চেয়ে বললেন—এ কি, এক যাত্রায় পৃথক ফল! নীলাঞ্জনবাবুর ডিম কই ? যমুনা ও আমি হাসি চাপতে পারলাম না বলে রান্নাঘরে চলে এলাম। অবস্থাটা এমন দাঁড়ালো যে যমুনা আর আমি চোখাচোখি হলেই হাসতে ভেঙে পড়ছিলাম। শেষে যমুনা পাখাহাতে নিয়েই বাইরে ডালিম গাছের তলায় চলে গিয়ে বাঁচল।

পৃথক ফলের উত্তরটা নীলাঞ্জনবাবুই দিয়েছিলেন—তিনি ডিম খান না। একটু বাদেই ডাক পড়ল—কোথায় গেলে ভাত দিয়ে যাও। এসে দেখি যিনি ভাতের জন্য ডাকলেন তাঁর পাতে এখনো প্রথমবারের ভাতই রয়ে গেছে। অবশ্য অভিজিৎবাবুর পাত শূন্য। ভাত দিতেই তিনি বললেন, দিয়ে যান বৌঠান। পরে বলল—তবে একটা কথা কইয়ে দেই—রান্না ভালো হইলে ভাত একটু টানে বেশী। থালা পূর্ণ করে দিয়ে চলে আসছিলাম ; ইশারায় ডাকলেন। অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন, আছে তো ? আমি সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নেড়ে জানালাম—আছে। শেষে অনুচ্চ কণ্ঠেই বললাম, আপনি নিশ্চিন্তে খান। স্বামীবাবু তো বাবু লোক, তাঁর ততক্ষণে অম্বল খাওয়াও শেষ হয়ে গেছে। যমুনা তাঁকে উঠতে বারণ করে তাড়াতাড়ি দই মিষ্টি এনে দিল।—এ সব আর খেতে পারলুম না বলে উঠে দাঁড়িয়ে অভিজিৎবাবুকে উদ্দেশ করে বললেন, উঠে পড়লাম কিন্তু আপনি আস্তে আস্তে খেয়ে আসুন। অভিজিৎবাবু মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। যমুনাও সঙ্গে সঙ্গে উঠে গিয়ে বুদ্ধি করে পুনরায় ভাতের হাঁড়ি বসিয়ে দিল। আমি ফাঁকা পেয়ে অভিজিৎবাবুকে বললাম, ছেলেমেয়ে ক'টি ? তিনি হাসতে হাসতে বললেন, বুচ্ছেন না বৌঠান, ছেলে-পুলে থাকলে কি পেট পুরে এত খাইতে পারতাম !'

—বৌ ?

—আরে না না, ঐ পথে আমি পা'-ই দেইনি। তারপর হাসিমুখ একটু গম্ভীর করে পুনরায় বললেন—যান আর দুইটি ভাত দিয়ে—আর কি দিবেন দিয়ে—নিজের কাজে চলে যান।

—না। আপনি খান না। কাউকে খাওয়াতে আমার ভালো লাগে।

মুখের ভাত ঈষৎ চিবিয়ে গিলে ফেলে তিনি বললেন—এই কথা আমার মা-ও বলত, 'তরা খা। দেখলে আমার আনন্দ লাগে।' তিনি তাঁর মায়ের কথা উপমা দেওয়ায় মনটা সহসা ধুয়ে মুছে মন্দিরের মতো হয়ে গেল। আমার মধ্যে তিনি তাঁর মায়ের ছবি দেখছেন। এটা কম সৌভাগ্যের নয়! বুকের ভেতরটা একটা অব্যক্ত আনন্দে দুলে উঠল। কিন্তু হাঁড়ি থেকে ভাত তুলতে গিয়ে দেখি অল্প ক'টা ভাত রয়েছে। শংকায় বুকটা কেঁপে উঠল—শেষরক্ষা বুঝি হল না। মনে মনে মাকে ডাকলাম—মা, মুখরক্ষা কর মা!

অভিজিৎবাবুর পাতে ঢালতে গেলে, বললেন—না না আর লাগব না, ভাবছিলাম লাগব। চিন্তা করে দেখলাম, দই-মিষ্টি রইছে না?

আমি কথা না শুনে তাঁর পাতে ভাত ক'টা দিয়ে বললাম, 'এ ক'টা তো। ঝালটা দিয়ে খেয়ে নিন।'

—'যা খাইলাম বৌঠান—যতদিন বাঁইচ্যা থাকুম, ভুলুম না। এমোন রান্না এমোন স্বাদ মুখে লাইগ্যা থাকে। আসলে কি জানেন? মেছে ঠাকুর চাকরের হাতে খাইয়া-খাইয়া মুখটা পইচ্যা গেছে গিয়া। আপনার কর্তার দৌলতে আমার জীবন সার্থক হইল।'

স্বামী ও অন্য কারুর অনুপস্থিতিতে এক অপরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে প্রথমটা সংকোচ বোধ হলেও পরে মনে হয়েছিল এমন দিলখোলা দিলদরাজ। কথা না বললে নীলাঞ্জনবাবুরই নিন্দা হতো।

শ্যামবর্ণের গোলগাল টাকমাথা মানুষটার প্রায় সর্বাঙ্গ বড় বড় লোমাবৃত্ত হলেও বৃহদাকার দুই চোখের চাহনিতে ধূর্তামির লেশমাত্রও নাই। ভিতর ও বাহির একই সরলতায় ব্যাপ্ত।

বললাম—'আপনার সহায়তা পেলে—আপনার বন্ধুর সাহিত্য-জীবন সার্থক হয়ে উঠবে।' অভিজিৎবাবু রসগোল্লার রসটুকু নিঙরে একটা মুখে পুরে দু' একবার চিবিয়েই গিলে ফেললেন। এবং আরেকটা মুখে দেওয়ার আগে বললেন—'চেষ্টার ত্রুটি করুম না। আমি তো আর মালিক না? আসল কথা কি বৌঠান—নতুন লেখকের লেখা কেউ ছাপতে চায় না। কি জানি যদি মার যায় বইটা! টাকাগুলো জলে যাইবো। বইগুলি সের দরে বেচতে হইবো।'

—'আপনাদের মালিক কে? কি নাম?'

—'সাংঘাতিক লোক, নাকে গন্ধ টাইন্যা বইল্যা দিব, বইটা চলব কিনা। নাম হইল—রুদ্রপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের দৌহিত্র।'

যমুনা পাশে দাঁড়িয়ে ছিল—বলল, 'তাই নাকি?'

—'খুব নামী লোক।'

যমুনা ও তার মাস্টারমশাই সেদিন বিলম্বের বর্ণনা করে যা বলেছিল তার সবটাই বানানো গল্প। যদিও তার মাস্টারমশাই প্রত্যক্ষভাবে আমাকে কিছুই

বলেননি, তবুও তিনিই যে এ গল্পের রচনাকারী এ বিষয়ে আর কোনমাত্র সন্দেহ রইল না। এবার বলুন আমি যে ওদের সম্বন্ধে সন্দেহ করেছিলাম তার বাস্তব ভিত্তি আছে কিনা? আমার স্বামী যে সমীরবাবুকে আমাকে জড়িয়ে সন্দেহ করেন, তার কি কোন বাস্তব ভিত্তি আছে? বলতে পারেন, আমি সাফাই গেয়েছি; কিন্তু কোথায় কিভাবে সাফাই গেয়েছি, সে কথাও তো বলবেন। সমীরবাবুর যদি আমার প্রতি কোন দুর্বলতা থাকতো তা' আমি অবশ্যই টের পেতাম। যেদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার নাম করে ওঁদের অতীত ইতিহাস বলেছিলেন, সেদিন যদি বালির কণ্ট্রাকটারকে দেওয়ার জন্য টাকাটা আমার স্বামীর কাছে পেঁছে দিতে আমাকেই না দিতেন তবে বুঝতাম—তার এই দীর্ঘ উপস্থিতিটা তিনি গোপন করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তা তো তিনি করেননি! কিংবা কালীঘাট ভবানীপুর ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় কোন চিঠিতে আমার কথা একবার উল্লেখ করতেও পারতেন? হয় তো বলবেন, এই না পারাটাই একটা প্রমাণ। আমি বলব—না। 'দৃষ্টি বিনিময়ের' ঠাট্টা করতে গিয়েই যখন প্রায় বন্ধু-বিচ্ছেদ—তখন চিঠিতে আমার নাম উল্লেখ না করে, নির্দোষ বৌটাকে নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করতেই চেষ্টা করেছেন।

কিন্তু যমুনারা আমার কাছে প্রত্যক্ষভাবে সপ্রমাণ ধরা পড়লেও আমি তা নিয়ে মুখোমুখী হতে পারিনি। আমার কাছে কেমন যেন একটা ছোট কাজ ছোট কাজ মনে হত। এটাকে আমি তুচ্ছ বিষয়ের মতোই এক পাশে সরিয়ে রাখলাম।

অভিজিৎবাবু চলে গেলে মনটা যেন আনন্দে নেচে উঠল। যমুনার জমি বেচার টাকায় আর দোকান খোলার প্রয়োজন হবে না। 'চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স' ঐতিহ্য-মণ্ডিত প্রকাশন। এঁরা কোন বই ছাপলে বাজারে চলে না, এটা হতেই পারে না। অভিজিৎবাবু খান তিনেক উপন্যাস ও গল্পের পাণ্ডুলিপি নিয়ে গেছেন।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে এ-সব নিয়েই কথা হচ্ছিল যমুনার সঙ্গে। সেই চমকে ওঠার দিন থেকে ও যেন ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। আজ সেই অস্পষ্টতা ধুয়ে-মুছে চলে গেছে। আগের মতো তাকে ভালো লাগছিল। সে বোধ হয় বুঝেছিল, আমি তাকে ঠিক আগের মতো দেখছিলাম। কিন্তু বিছানায় শুয়ে অন্য দিনের মতো হাঁ-না-য়ের মতো দু'এক কথা বলে ঘুমিয়ে না পড়ে আমার মতোই সচ্ছন্দ হয়ে সে এমন কি অভিজিৎবাবুর সেই বিশেষ উক্তিটি—'নীলাঞ্জনবাবুর ডিম কই' নিয়েও আরেক দফা হাসাহাসি করল। এক কথায়—কালো মেঘ সরে যেতেই দু'জনে আবার ভালোবাসার আলোতে উচ্ছল হয়ে উঠেছিলাম।

তর তর করে কথা হাঁটতে লাগল—এলো সেই জন্মদিনের কথা। যমুনা বললে—তুমি তো আর ও-ঘরে গেলেই না। সবাই চলে গেলে মাস্টারমশাই একটু ঘুমিয়ে

পড়েছিলেন। আমি আর অনুরাধা গল্প করছিলাম এক কোণে। ওর বিয়ের কথা বলতেই ও একটু বিষাদের হাসি হেসে বলেছিল—

'নায়ক পালিয়ে গেছে।'

'মানে ?'

'পালিয়ে যাওয়ার কী মানে হয়, এটা ওরাই বল'ত পাবেন। ভীরু কাপুরুষ ছাড়া আর কি বলব ভাই।' অনুরাধা যমুনাকে এসব বলেছিল।

মেয়েরা যখন অপরের প্রেম-টেমের গন্ধ পায় তখন নিজেকে ধোয়া তুলসি পাতার মতো আলাদা সরিয়ে রেখে 'এমা —ওমা, তাই নাকি, আহা !' ইত্যাদি সহানুভূতিসূচক শব্দগুলি যথাসময় প্রয়োগ করে নিজের কৌতূহল মেটাতে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরনিন্দার গল্প রচনার জন্য অভিযোগ কারিণীব পেটের ভেতব পর্যন্ত যেতে চেষ্টা করে।

যমুনাও সেই চেষ্টা করেছিল এবং সফলও হয়েছিল। যার সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে কালীঘাটের হালদার পাড়া রোডে হিউম্যান ওয়েলফেয়ার সোসাইটি নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে। সেই সোসাইটি অনেক জায়গা জমি নিয়ে একটি আশ্রমের মতো,—সেই ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের সময় থেকে কাজ করে আসছে। ঐ আশ্রম বা প্রতিষ্ঠানের পরিচালিকা ছিলেন দেবী চৌধুরানীর মতো আত্মপ্রত্যয়শীলা এক মহিলা। যদিও এটি একটি নামে ওযেলফেয়ার সোসাইটি, আসলে তা ছিল একটি পলাতক রাজনৈতিকদের নির্ভর-যোগ্য শেলটার। অনুরাধারা তখন থাকত ভবানীপুরে। ভবানীপুর কালীঘাট বালীগঞ্জ এমন কি ফলতা থেকে অনেক ছেলেমেয়ে আসত ঐ সোসাইটির নানা অনুষ্ঠানে। লাঠিখেলা, ছোবাখেলা, তীরছোঁড়া থেকে বন্দুক চালান পর্যন্ত শেখানো হত ভিতর বাড়িতে। গোপনে প্রকাশ্যে শেখানো হত ব্রতচারী নৃত্য, সমাজসেবা-মূলক কাজ। দেশাত্মবোধক গান-কবিতা-আবৃত্তি, ধর্মীয় ও দেশত্মবোধক নাটক। আশ্রমে যারা থাকতেন মেযে কিংবা ছেলে কেউ গেরুয়া বসন পরতেন না। বহু গণ্যমান্যরাও যেতেন ঐ আশ্রম অনুষ্ঠানে। স্বভাবত অনুরাধা ও তার মাসতুত বোন নিরুপমাও যেত ঐ আশ্রমে। তারা দেশাত্মবোধক গান ও নাটকের তালিম নিত ওখানে। সেখানেই সমীরবাবু ও নীলাঞ্জনবাবুর সঙ্গে পরিচয় হয় অনুরাধার সঙ্গে। সেই সুযোগেই ঘনিষ্ঠতা হয় সমীরবাবুর সঙ্গে। দু'জন দু'জনকে ভালবেসে ফেলে। নীলাঞ্জনবাবু কোথায় আগেই ধরা পড়ে জেলে চলে যান। সে সময় সমীরবাবু অনুরাধার আরো ঘনিষ্ঠ হয়। নীলাঞ্জনবাবু জেল থেকে ছাড়া পেয়ে দেশে চলে যান। বিয়ে করেন। অনুরাধা সমীরবাবুর গোপন প্রেমের খবর কেউ জানত না। সমীরবাবু একদিন অনুরাধাদের বাড়িতে গেলে—তার বিধবা মা ও মামী জানতে পারেন। সমীর-বাবু তাকে বিয়ে করবেন বলে কথা দেন। অনুরাধা প্রত্যাশায় দিন গোনে। যমুনা নাকি জিজ্ঞেস করেছিল অনুরাধাকে—ওদের এই মন দেয়া-নেয়া'র ব্যাপারটি নীলাঞ্জনবাবু জানত কিনা। না তিনিও জানতেন না। আশ্রমের বড়দি এ ব্যাপারে

ভীষণ কড়া ছিলেন। তিনি নাকি বলতেন—এধরনের গোপন দুর্বলতা সোসাইটির মরেলিটি নষ্ট করে দেয়—মানুষের শ্রদ্ধাভক্তি না থাকলে এ ধরনের সোসাইটি টিকে থাকতে পারে না। ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভালোবাসাটাই পাপ।

তারপর একদিন বড়দি চলে গেলেন পণ্ডিচেরী আশ্রমে। এখানে এই আশ্রমের নিয়ম-শৃঙ্খলা ভেঙে গেল। যে ক'জন তখনো থেকে পাহারা দিচ্ছিলেন তাদের মধ্যে সমীরবাবুও ছিলেন। তারপর একদিন সমীরবাবুও পালিয়ে গেলেন।

শুয়ে শুয়ে যমুনার মুখে এই সব নিবিষ্টচিত্তে শুনছিলাম। ইচ্ছে হচ্ছিল জানতে, নিরুপমা-নীলাঞ্জন কাহিনীর কিছু জানে কিনা অনুরাধা। কিন্তু না, তেমন সুযোগ আমার এখনো হয়নি। যদি কোনোদিন অনুরাধা আবার আসে তবে সেই উপাখ্যান শুনতে পাব হয়তো, বললে যমুনা। সেই প্রত্যাশায় দিনাতিপাত চলছিল আমার।

হঠাৎ একদিন বিকেলে যমুনা বাবার কাছে চলে গেল। কারণ জানতে চাইলে, বলেছিল—এমনি। অনেকদিন যাইনি, মা বাবাকে দেখতে ইচ্ছে করছে। একদিন বাদে ফিরে এলো বেশকিছু তরিতরকারি নিয়ে। আরো দুটো নতুন জিনিস এনেছিল সে। আমার জন্য দুটো ভালো দামের ব্লাউজ ও মেয়েটার জন্য একটা সুন্দর ফ্রক। বললে, পুকুরটা এখনই জলে ভর্তি হয়ে গেছে, তাই জাল ফেলা গেল না। নইলে ভালো দেখে মাছও আনতে পারতাম দিদি।

ওর কথাবার্তা ব্যবহার যেন কোন খাদ নেই। সত্যি সে আমাদের সবাইকে ভালোবাসে। ওদের ওখানে কে একটা জামা-কাপড়ের বড় দোকান খুলেছে। সে নাকি তার বাবার খুব পরিচিত, তাই ডেকে এগুলো দিয়েছে। যমুনা জামা ব্লাউজ দেখিয়ে বললে, দোকানী নাকি বলেছে, সামনের লটে নতুন ডিজাইনের শাড়ি আসবে, তখন দু'জোড়া নিয়ে আসতে।

তাকে বাধা দিয়ে বলেছিলাম—'না না এখন এসব কিনে টাকা নষ্ট করছ কেন? পুজোয় তো লাগবেই।' সে বললে 'টাকা তো আমি দিই না। তা যা দিতে হয় বাড়ি থেকেই দেবে। ও নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাতে হবে না।' আমি চুপ করে গেলাম। ক'দি পর যমুনা আবার বাড়ি গেল এবং পরদিনই সন্ধ্যেবেলা দু'জোড়া শাড়ি নিয়ে ঘরে ফিরল। বললে—'তোমার যে-দুটো পছন্দ হয় রাখ।

শাড়িগুলি সত্য সুন্দর। কত দাম কে জানে। বললাম, 'চারটে শাড়িই তো পছন্দের। তোমার পছন্দ আছে'—বলে তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। তার চোখমুখ উজ্জ্বল, বললে—'তাই? তবে সবকটাই রেখে দাও। পুজোয় আর কিনতে হবে না।'

'তা মন্দ হবে না' বলে কী দাম চেয়েছে জানতে চাইলাম। সে বলল, দামের কথা জানব কেমন করে। ও তো বাবার ব্যাপার।' অর্থাৎ ওরা এত পয়সাওয়ালা, মেয়ে যা চায় বাপ তাই মেনে নেয়—এটাই সে বোঝাতে চেয়েছে। তবুও জানা উচিত নয় কি? এভাবে নেওয়া ঠিক নয়। জানা থাকলে স্বামীকে বলে টাকাটা

দিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেত। আমার কুণ্ঠা দেখে বললে—'ঠিক আছে আবার গেলে জেনে আসবো।'

বললাম—আবারো যাচ্ছো নাকি ?

—'বাঃ, যেতে হবে না? পুজোর আর ক'দিন বাকী। পুজোর আগেই স্টার্ট দেওয়ার কথা।' বলে যমুনা কর্তার ঘরে চলে গেল। ব্যাপারটা আমি কিছু বুঝলাম না। কী পুজোর আগে স্টার্ট দিতে ? দোকান ? মনটা সন্দেহে ভার হয়ে উঠলো।

রাত্রেই যমুনা জানাল, কাল শরৎচন্দ্রের জন্মদিন। মাস্টারমশাই আর ও দেবানন্দপুর যাবে। তোমার কথাও বলেছিলাম, তিনি না না করে উঠলেন। বললেন, মেয়ে নিয়ে এমনি সামলাতে পারে না। কিন্তু আমাকে নিয়ে যে কোথাও বেড়াতে যাওয়া যায় না, যেতে পারেন না—একথা তার কাছে খোলাখুলি স্বীকার করতে চাইলাম না। বললাম—'ঠিকই বলেছেন। মেয়েটা যা দুরন্ত। ওকে নিয়ে রাস্তাঘাটে চলা মুস্কিল-ই।'

দেবানন্দপুরটা কোথায়, কতদূরে এবং যেতে আসতে কত সময় লাগে কিছুই জানি না। ওঁরা ফিরল না

অনেক রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করে সদরে তালা লাগিযে শুয়ে পড়লাম কিন্তু ঘুম এল না—ওঁরা কোথায় আছেন ? হোটেলে—না যমুনাদের বাড়িতে। রাত্রে—খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। যেখানেই থাকুক সুখেই থাকবেন। বার বারই আমার মনে হচ্ছিল—ওরা হয়তো একঘরে—এক বিছানায় আছেন। কিছুতেই অন্য চিত্র আমার চোখে ভাসছিল না। ওঃ, কী দুঃসহ যন্ত্রণা তা আপনাকে কেন, কোন নারীকেই বলে বোঝাতে পারবো না। এই বিশ্ব সংসারে আমার মতো যেসব পোড়াকপালী আছে তারাই বুঝবে এ কেমন জ্বালা। বাইরে শ্রাবণধারা সব ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আর ঘরের ভিতর আমার অশ্রুধারা বালিশ বিছানা ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আসুক, একটা হেস্ত-নেস্ত করে তবে ছাড়ব। কপালে যা থাকে থাকুক। আমার অজ্ঞাতেই যেন একটা দৃঢ়-সংকল্প পাথরের মতো শক্ত হয়ে মনে গেঁথে রইল।

পরদিন সন্ধের পর এলেন বাবুরা। এসেই যমুনা কাপড় জামা বদলে রান্নার উদ্যোগ করতে গিয়ে বললে—ক্ষিধেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে। সারাদিন চা ছাড়া বলতে গেলে কিছুই জোটেনি। ওমা, তুমি কি আজ রান্না করনি ? তরিতরকারি দেখছি যেমনটি—তেমনটিই রয়েছে। কী খেয়েছ ? খাওনি ?

সে এক নিঃশ্বাসে অনেকগুলো কথা বলে ফেলল। তার একটি কথারও জবাব দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। তবু মুখ দিয়ে কথা বার হয়ে এলো—'রান্না করব কার জন্যে। কে খাবে ?'

যমুনা বিস্মৃত চোখে তাকাল। আমি যে এতক্ষণ চোরা চোখে তার মুখখানি দেখছিলাম—সে' তা জানে না। আমি ধরে নিয়েছিলাম, রাতে মুখে দাগ পড়লে

একটা দিনে তা মিলিয়ে যাবে না। আমার পুরো তিন দিন লেগেছিল। বাধ্য হয়ে সকাল বিকেল দু'বেলা স্নো-পাউডার মেখে লোক-লজ্জার হাত থেকে বেঁচেছিলাম। ওর কি একদিনেই মিলিয়ে যাবে নাকি ? কিন্তু কোনো দাগ না দেখে হতাশ হলাম। তা হ'লে কি চুম্বন টুম্বন কিছুই হয়নি। নাকি এক ঘরে এক বিছানায় ঘন বরষা যাপনের কোন সুযোগই আসেনি ? এই সব আবোল তাবোল কথাগুলি পলকে এসে মিলিয়ে গেল মনে। মুখে বললাম—'কেন ? খাব না কেন, বাসি রান্নাগুলো কি ফেলে দেব নাকি ?'

—'এ মা অসুখ করে যদি !'

—'তেমন কপাল করে আসিনি যমুনা।' থুতনি বাড়িয়ে কথাটা বললাম ওকে।

যমুনা তাড়াতাড়ি উনুন ধরিয়ে রান্না চাপিয়ে বলল—'জ্বর না হলেই হয় !'

—'কেন ? জ্বর হবে কেন ?' কৌতূহল নিয়ে প্রশ্ন করলাম। সে অতি বিজ্ঞ মানুষের মতো চোখ নামিয়ে বলল—'কে-ন ? তারপরই কথাটাকে মোলায়েম করে বললে, 'কেন এখানে জল হয়নি ?'

—'হয়েছে। সন্ধ্যে থেকে বলতে গেলে সারা রাতই।

যমুনা এবার স্ফীত হয়ে বলল, ওখানে সকাল থেকে বৃষ্টি। স্টেশন থেকে রিকশায় উঠতে গিয়ে ভিজলাম। তারপর এতটা পথ প্রায় জলের ছাটে ভিজেই গেল। শরৎবাবুর বাড়ি পেঁছে দেখি লোকজন বিশেষ নেই। আমরা মঞ্চের কাছে যেতেই দু'টি ছেলে এসে বলল—আপনারা ইস্কুল বাড়িতে চলে যান। আজ কোন অনুষ্ঠান হবে না—শুধু জন্মমুহূর্তে নমঃ নমঃ করে প্রদীপ জ্বালান হবে। বাকী অনুষ্ঠান কাল যদি ওয়েদার ভাল থাকে তবে কালই হবে। বৃষ্টি-বৃষ্টি। সেই বৃষ্টিতেই রিকশায় উঠলাম জল ঠেলে। প্রায় আধমাইল দূরে সেই ইস্কুল। মাস্টার-মশাই তো ফিরে আসতে জেদ করছিলেন। আমি বললাম, কোন লাভ নেই, ফিরে গেলেও স্টেশনে পেঁছতে পেঁছতে একেবারে চুপসে যাব। তারপর একঘন্টা দেড়ঘন্টা পথ—তাও যদি ট্রেন থেকে নেমে বাস পাওয়া যায়। না পাওয়া গেলে কী দুর্গতি হবে—ভাবতে গেলেও গা শিউরে ওঠে। অগত্যা ইস্কুল বাড়িতেই। সেখানে গিয়ে মেয়ে-পুরুষে শ-তিনেক আমাদের মতো বাইরের লোক।'

যমুনার কথায় বাধা দিয়ে বললাম—'হোটেল ছিল না কাছাকাছি ?' যমুনা দুই চোখ উপরে তুলে বললে, হোটেল আসবে কোত্থেকে। সেটা তো গ্রাম—যাকে বলে এঁদো গাঁ। যাই হোক, সেই ভিজে কাপড়-জামা নিয়েই কোনমতে রাতটা কাটিয়ে দিলুম টেবিলে বেঞ্চিতে শুয়ে বসে। স্বেচ্ছাসেবকরা অবশ্য আমাদের এক কোয়াটার পিস্ পাউরুটি ও এক চামচ জেলি দিয়েছিল। স্কুলের বারান্দায় ড্রামভর্তি জল আছে খাও। ছেলেদেরও সেই ব্যবস্থা। আমাদের মেয়েদের দুটো ক্লাসঘর মাঝখানের পার্টিশান খুলে দিতে বিরাট হল ঘরের মতো লাগছিল। ছেলেদের তিনটে।

যমুনা থামল। কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বললে, দ্যাখ তো, আমার ব্যাগে দুটো পাউরুটি

আছে ভুলেই গেছলাম। একটু সেঁকে মাস্টারমশাইকে দিয়ে এস। আর একটা আমাদের দুজনের জন্য সেঁকে নাও। ট্রেনে কিনেছিলাম। দাঁড়াও একটা বেগুন ভেজে দিচ্ছি। যা খিদে পেয়েছে।

আমি বললাম, তুমি যে কলা এনেছিলে বাড়ি থেকে সেগুলো হয়তো পেকেছে।

—'দ্যাখো দ্যাখো—তা'হলে তো কথাই নেই', বলে যমুনা যেন লাফিয়ে উঠল। আমি যে ওদের সম্বন্ধে সন্দেহ করে সারারাত কেঁদেছিলাম—সেটা একেবারেই মাঠে মারা গেল।

রাত্রেই বাবুর জ্বর এল—কাজেই ভাত আর খাওয়া হলো না। এত জলে ভেজা, যাবে কোথায় ?

আগের সেই স্বদেশী যুগ আর নেই যে বলবে, 'শরীরের নাম মহাশয়, যা-সহাবে তাই সয়'। এখন পান থেকে চুন খসলেই গোলমাল।

যমুনা বললে—'তুমি বরং হাত ধুয়ে ও-ঘরে গিয়ে একটু কাছে বস। যদি পার মাথা টিপে দিও।' তারপর প্রসঙ্গ পাল্টে বললে—'মনি কি খেয়েছে ? কখন থেকে ঘুমোচ্ছে! পড়তে বসেছিল ?'

মাথা নেড়ে বোঝালুম বসেছিল। মুখে বললাম—'খায়নি কিছু। তুলে খাওয়াতে হবে।'

'আচ্ছা তুমি যাও'—বলে নিজের কাজে মন দিল সে।

যমুনার এই সহজ সারল্য ও মমতাভরা আচরণে কেউ মুগ্ধ না হয়ে পারে ? কেউ তাকে আত্মীয় না ভেবে পারে ? কেউ তাকে ভালো না বেসে পারে ? আমি তাকে ভালবেসেছিলাম তার মহৎ গুণে। সে শুধু আমার স্বামীকে ভালবাসে না—আমাকে ভালবাসে, আমার মেয়েকেও ভালবাসে। ভালবাসে এ বাড়ির গাছ-পালাও। গঙ্গা যমুনা দুই বোন। হঠাৎ মনের কোন গহন থেকে কে যেন টিপ্পনি কাটল—হুঁ, বোন না ছাই, ও হচ্ছে তোর সতীন। স্বামীর মাথার কাছে বসে—হাত বুলোতে বুলোতে ঐ অলুক্ষুণে কথা মনের জানালায় ঝিলিক মারতেই আমি বোধহয় আমার অজ্ঞাতেই শিউরে উঠেছিলাম।

—'কি হলো অমন করলে কেন ?' গাঢ়স্বরে বললেন তিনি। আমি ভেবেছিলাম, তিনি বোধহয় ঘুমোচ্ছেন অথবা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে আছেন। আমার ভেতরের শিউরে ওঠার ব্যাপারটা তিনি কিভাবে বুঝতে পারলেন ভেবে বিস্মিত ও শঙ্কিত হলাম। কিন্তু সহসা কোনো উত্তর দিতে পারলাম না। তিনি তাঁর সেই অপূর্বসুন্দর দু'চোখ কপালের কাছে টেনে তুলে সেই নিরুত্তাপ কণ্ঠে দৃঢ়তা বজায় রেখে পুনরায় বললেন, 'কী হলো বললে না ?'

—কী বলব বলুন তো। এ কথা কি বলা যায় ? তিনি জেদ ধরলেন—তাঁকে বলতেই হবে। মিথ্যে বললে বলতে পারতুম বা ফাঁকি দিয়ে বলতে পারতুম—কই না তো ?—কিন্তু মিথ্যে বলব কেন ? স্বামীর সঙ্গে মিথ্যে বলব ? আর মিথ্যে

বলেও তো তাঁর অনুভূতিটাকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করা যাবে না। তিনি হঠাৎ ক্রোধে উঠে বসলেন। এমনিতেই তাঁর দুই-তিন ডিগ্রী জ্বর। তার ওপর এই উত্তেজনা; চোখ দুটি লাল দেখাচ্ছিল। আমি ভয় পেয়ে গেছলুম। মুখ দিয়ে কোনো কথা সরছিল না। তিনি হঠাৎ আমার গালে একটি চড় বসিয়ে দিয়ে বললেন—'মিথ্যেবাদী দূর হয়ে যা—এখান থেকে। যে স্বামীর কাছেও গোপন করে সে কুলটা। তার মুখ দেখাও মহাপাপ।'

আমি কি ভাবে ওখান থেকে উঠে এসেছিলাম বলতে পারব না। এ-ঘরে এসে চোখের জল রোধ করার জন্যে বালিশে মুখ ডুবিয়েও নিষ্কৃতি পাইনি। যমুনা বোধ-হয় রান্নাঘরের খোলা দরজা দিয়ে আমাকে কাঁদতে দেখে ছুটে এসেছিল। আমার কাঁধে আস্তে হাত ছুঁইয়ে মৃদু অথচ সন্ত্রস্ত কণ্ঠে বলেছিল—কি, কি হয়েছে দিদি? বল না কি হয়েছে। ও যত বলছে আমি ততই ভেঙে পড়ছিলুম। মুখ দিয়ে কিছুই বলতে পারলুম না। অভিমানের কান্নায় আমার বুকটা ভেঙে খান-খান হয়ে গেল।

আমার সন্দেহটা হয়তো অমূলক। কিন্তু ওদের ব্যবহারেই তো আমার মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে!

* * *

যে নারী স্বামীর কাছে কথা গোপন করে, সে কুলটা, তার মুখ দেখাও মহাপাপ।

এ কথাগুলি আমার বুকের মধ্যে ত্রিশূলের ঘা-এর মতো অনেকদিন বিঁধে হয়ে ছিল। যমুনা নির্দোষ। তবুও তাকে নিয়ে সর্বক্ষণ সন্দেহ পোষণ করা যে পাপ, এ কথা যুক্তি দিয়ে বুঝলেও, বিশ্বাসের জায়গায় একটা কাল দাগ থেকেই যাচ্ছিল। এটা কি নারী-মানসিকতার অন্ধ সংস্কার? এটা কি সব নারীর মনেই বদ্ধমূল ধারণা? স্বামীর উপর অন্য নারীর অধিকার কি স্ত্রীর অস্তিত্বই বিপন্ন করে তোলে? সতীন নিয়ে স্বামীর ঘর নারী-জীবনে আবহমানকালের ঘটনা। এটাকে মেনে নিয়েই তো নারী-জীবনের বিকাশ ঘটেছে। সেক্ষেত্রে কি তারা সকলেই সন্দেহের আগুনে দগ্ধ হয়েছে? তাদের সকলেরই কি অস্তিত্ব বিপন্ন হয়েছিল? এইসব প্রশ্ন বেশ কিছুদিন ধরে আমার মনে দোল খাচ্ছিল। এ সম্বন্ধে যমুনার মনোভাবটা কি জানার জন্য সুযোগ খুঁজছিলাম। কি আশ্চর্য, কথাটা সেই তুলেছিল। কিন্তু এ-প্রসঙ্গে এ কথাটাও বলে রাখি—সে আমাকে কি পরিমাণ বোকা ভাবে, এ কথায় তা-ও বুঝতে পারবেন। এ-কথা সে-কথা বলার পর হঠাৎ যেন তার মনে পড়েছে—'তুমি না সেদিন বলেছিলে—তোমাদের বেনেপাড়ার বেনেদের কে—ঘরে বৌ থাকতে আরেকটা বিধবা মেয়েকে বিয়ে করে এনেছে। তাই নিয়ে কি ঝগড়া! শেষে আগের বৌকে তাড়িয়ে দিয়ে তবে শান্তি। বলছিলেন না?' আমি পূর্ব কথায় সায় দিয়ে বললুম—'হুঁ, তাতে কি হয়েছে। যমুনা পালটা বলল—'হয়নি কিছু। আমাদের ওখানেও এমন একটা ঘটনা হয়েছে। সেদিন বাড়ি গিয়ে শুনলুম। এখানেও লোকটা

ঘরে বৌ ছেলে-মেয়ে থাকতে আবার একটা মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে এল। আশ্চর্য—আগের বৌ কোনো আপত্তি করল না। ও না কি বলেছিল—বেশ তো ভালোই হলো। আমি আর একা পারছিলুম না—আমি একজন সঙ্গী পেলাম। যমুনা তার গল্প বলে একটু থামতেই আমি বলেছিলাম—আগের বৌটি খুব বুদ্ধিমতী।

—'বুদ্ধিমতীর কি দেখলে ?'

—'নয় কেন ? সে ভাবল—আমার তো যা সাধ মেটানোর মিটিয়ে নিয়েছি, তিনটে ছেলে-মেয়ের মা হয়েছি—এখন শুধু ঝামেলা। ও যখন মধু খেতে এসেছে, পোয়াক না একটু ঝামেলা।'

আমার কথা শুনে যমুনা বললে—'সত্যিই তো। আমি কিন্তু অত কথা ভাবিনি।'

ঘর অন্ধকার ছিল—আমার যুক্তি শুনে ওর মুখের অবস্থা কেমন হয়েছিল জানি না। প্রচ্ছন্নভাবে আমার প্রশস্তি গাইলেও আমি সাড়া না দেওয়ায় কিছুক্ষণ বাদে ও বললে—'দিদি, ঘুমিয়েছ ? আমি ঘুমের ভান্ করতে করতে কখন সত্যি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না।'

সতীন নিয়ে সুখে-শান্তিতে ঘর করা যায়—আমার কাছ থেকে এমন একটা সমর্থন পেয়েই বোধহয় ও এবং আমার পতি পরম গুরু কদম কদম বাড়িয়ে চলল। আবার জমি বেচার টাকায় দোকান করতে দু'জনে উঠে প'ড়ে লাগল।

আমার একটা দোষ কি জানেন ? স্বামীর কাছ থেকে অপমান-নির্যাতন পেয়েও আমি সে কথা কয়েকদিনের মধ্যেই ভুলে যাই। অথবা সত্যিই আমি বেহায়া। কর্তাকে খেতে দিতে গেলাম আমি-ই। তিনি নিঃশব্দে খাচ্ছিলেন। মনে মনে ভাবলাম তাঁদের ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ করা কর্তব্য। মৃদু প্রতিবাদের সুরে বললুম—'ওর জমি বেচার টাকা দিয়ে দোকান না করলে কি চলে না ? অভিজিৎবাবু না বলে গেলেন—ওঁরা বই ছাপবেন।' আমার কথা শুনে তিনি দপ্ করে জ্বলে উঠলেন—'এ নিয়ে তোমার মাথা ঘামানোর দরকার নেই।' তাঁর কথা বলার ধরন দেখে দমে গেলেও একেবারে নিঃশব্দ হয়ে গেলুম না। আরো মৃদুস্বরে বললাম—'দরকার নেই, আবার আছেও। আপনার গলগ্রহ হয়ে যে গ্লানি ভোগ করছি, তা সহ্য করতে পারছি—কিন্তু তার গলগ্রহ হয়ে থাকা কিছুতেই সহ্য করতে পারব না।' বলতে বলতে কান্নায় আমার বুক ভেঙে যাচ্ছিল। তিনি আরও রূঢ় হয়ে উঠলেন—'তুমি আজকাল বড় বেয়াড়া হয়ে উঠেছ। মেয়ে মানুষ মেয়ে মানুষের মতো থাকবে।' তাঁর কথার মধ্যে অহংবুদ্ধির ঝাঁঝটা এতই তীব্র ছিল যে শুনে আমি থমকে গিয়েছিলাম। কিন্তু এতক্ষণ যে বুকের মধ্যে দহনজ্বালা অনুভব করছিলাম—তা সাপের তীব্র বিষের মতো উদ্‌গিরণ করে বললুম—'যার সঙ্গে এ নিয়ে দিনরাত শলাপরামর্শ করেন—সে কি মেয়েমানুষ নয় ?'

তিনি মুখখানা কঠিনতর করে ঘৃণার তীব্র শ্লেষ ঢেলে দিয়ে বললেন—'তারা অন্য

জাতের। তাদের মধ্যে অন্য জগৎ আছে। যে কাজের জন্যে তার জন্ম—সে কাজের জন্য তোমার জন্ম হয়নি। তাদের সঙ্গে তোমার তুলনা করে নিজের 'ক্ষেমতা' আর জাহির কর না।' বলে গ্লাসের জল পাতে ঢেলে দিয়ে উঠে দপ্ দপ্ করে পা ফেলে মুখ ধুতে চলে গেলেন। আমার মনে হলো আমার নাকে-মুখে এক মুঠো ঘৃণার ছাই ছড়িয়ে দিয়ে চলে গেলেন তিনি। সমস্ত শরীর লজ্জায়-ঘৃণায়-অপমানে থরথর করে কাঁপছিল। কিছুক্ষণ বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে তাঁর মনের ভাবকে হৃদয়ঙ্গম করতে চেষ্টা করেছিলুম। বুঝলাম—ক্রন্দন নিষ্ফল, প্রতিবাদ নিষ্ফল। আর এ-ও বুঝলাম সমস্ত অনুমানটিই খাঁটি।

স্বামীর সঙ্গে বাদানুবাদের কথাটা বোধহয় যমুনার কানেও উঠেছে। সে আবার নিজেকে রাশ টেনে ধরেছে। আগে সংসারের জন্য টাকা-পয়সা যা দেওয়ার– তা তিনি আমার হাতে দিতেন। কারণ আমি নাকি খুব হিসেব করে চলতে পারি। কিন্তু ঐদিন তাঁর মুখের 'পরে কথাগুলো বলে দেওয়ায় সত্যি আমি অযোগ্য হয়ে গিয়েছি। তাই এখন যমুনার হাতেই যা দেয়ার দেন। কিন্তু তার জন্য আমার কোনো একটা আফসোস বা আপত্তি ছিল না। আপত্তি 'হনুমানের দাঁত খিঁচুনটাই'। 'খরচ কমাও দিদি। মণি যখন ঘুমিয়ে পড়েছে তখন ঘরে হ্যারিকেনটা জ্বালিয়ে রেখে লাভ কি? যতটা খাবে ততটাই রাঁধবে। বাসী ভাত যখন কেউ খায় না তখন একমুঠো চাল বেশী না নিলেই কি নয়? একটু বুঝতে চেষ্টা কর দিদি—একটু বুঝতে চেষ্টা কর—। তোমার ভালর জন্যেই এসব বলা। নইলে আমার কি! আজ আছি কাল নেই!' যমুনার এইসব উক্তিগুলিতে আর্থিক সাশ্রয়তার প্রয়াস যতখানি—তার চেয়ে ঢের বেশী আধিপত্যবিস্তারের প্রয়াস—অন্তত আমার তাই মনে হতো। কিন্তু তার এই আদিখ্যেতাপনা গায়ে মাখতুম না। মনে মনে হাসতুম।

শ্রাবণের প্রথম। একদিন বিকেলে আকাশে দানাবাঁধা মেঘ নেই—পাতলা পাতলা মেঘ—আষাঢ়ের মতো বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে। যমুনা একটা ফজলি আম কেটে কয়েক টুকরো একটা প্লেটে সাজিয়ে আমার সাড়ে তিন বছরের মেয়ে মণির হাতে ধরিয়ে দিয়ে আদর করে বললে—'মামণি, এটা বাবাকে দিয়ে এস।'

আমি উঠোনের এপাশটা ঝাঁট্ দিচ্ছিলুম, বললাম—'ও পারবে নাকি, ফেলে দেবে। শেষে প্লেটও যাবে, আমও যাবে।'

—'না-না, দেখ, ঠিক পারবে।' যমুনা ও আমি দু'জনেই মণির সতর্ক চলার দিকে চেয়েছিলাম। মণি ও-ঘরের চৌকাঠ পার হয়ে গেলে যমুনা বললে, 'দেখলে পারলো কিনা। এসব এখন থেকেই বাচ্চাকে শেখাতে হয়।'

বললাম—'ওকে সব শেখানোর দায়িত্ব তো তোমারই।' শুনে যমুনা যে খুশী হয়েছিল তা তার মুখ দেখলেই বোঝা যায়। সেই খুশী খুশী ভাবের মধ্যেই প্রশ্ন করলাম—'অভিজিৎবাবু যে লেখাগুলো নিয়ে গেল—তার কী হলো?'

যমুনা মাথা নেড়ে জানাল—'না। হবে না।'

—'কেন ?' বলতেই যমুনা বললে—'ওমা শোননি। ও'রা বলেছেন—লেখা যত ভালই হোক নামী লেখক ছাড়া লেখা ছাপলে লোকসান খেতে হবে। তাতে মালিক রাজী নয়—তবে নামের দাবী ছাড়া বিক্রী করে দিলে ও'রা কিনে নিতে পারেন। আমরা বললুম, না, হবে না। লোকের নামই যদি না থাকে তবে কী লাভ ?'

—টাকাটা বড়, না নামটা বড় একথা আমার মনে একবারও ওঠেনি ; কিন্তু তবুও বললুম—'একেকটা লেখা কতটাকা বলেছিল ?'

যমুনা দৃঢ়তা জানিযে বললে—'যত টাকাই বলুক, আমরা তো রাজী নই। কাজেই ওকথা জেনে লাভ কি ?'

আমার মনটা হতাশায মুষড়ে গেল—বললুম—'তা'হলে ?' যমুনা এক পলক আমার মুখের পানে তাকিয়ে বললে—'তা'হলে আর কি ? নিজেরাই দোকান করব, নিজেরাই পাব্লিশার হব অনামী ভাল লেখকের লেখা আমরা ছাপব। বিক্রী করব। জীবনে প্রতিষ্ঠা পেতে হলে লড়াই করতে হবে দিদি !' আমি হাতের ঝাঁটা ফেলে দিযে হাত-পা ধোয়ার নাম করে চলে গেলুম।

অপ্রতিরোধ্য ব্যবস্থা। আমার আর কিছুই করার নেই। হতাশায় মনটা বিবর্ণ হয়ে গেল। যমুনার জমি বেচার টাকাতেই এসব হবে। আর সেই সঙ্গে যমুনার কর্তৃত্বও আমার সংসারটার বুকে হাজারমণী পাথরের মতো চেপে বসবে। মনে হলো একটা অজানা অমঙ্গলের ছাযা যেন চারিদিকের সমস্ত আলো গ্রাস করে আমার দিকে ছুটে আসছে। আমার পালাবার পথ নেই। কোনোদিকে এতটুকু ফাঁক নেই। আকাশের মুক্ত বাতাস আমি বুকের মধ্যে নিঃশ্বাসে টেনে নিতে পারছিনে। দম-বন্ধের যন্ত্রণা। আমের টুকরো মুখে দেওয়ার প্রবৃত্তি হলো না। ঘরে এসে শুয়ে পড়লাম। যমুনা এসে গা ছু'য়ে ডেকে বলল, 'কি হলো দিদি, অবেলায় শুয়ে পড়লে যে। মাথা ধরেছে ?' আমি 'হু'' বলে পাশ ফিরে পড়ে রইলাম।

* * *

মানুষ যখন সোজা সহজ পথে বঞ্চনার প্রতিবাদ জানিয়েও প্রতিকারের পথ পায় না—বোধহয় তখনই সে অন্য পথে পা বাড়ায়। সামান্য লেখাপড়া শিখে এবং জীবনের অভিজ্ঞতায় যতটুকু পেরেছি, যেটুকু বুঝতে শিখেছি—তাতে দেখেছি নিয়মের মসৃণ পথে যখন তার ন্যায়সঙ্গত দাবী আদায় করতে গিয়ে বারবার প্রচণ্ড আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে, ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে, তখনই সে নিয়মের রীতিনীতি ভাঙতে শুরু করে। আর তার ফলে আসে সমাজ-জীবনে বিশৃঙ্খলা। আর সেই বিশৃঙ্খলা রূপ নেয় সংঘর্ষে। সংঘর্ষ রূপ নেয় বিপ্লবে। বিপ্লবের পরিণতি হয় নতুন সমাজব্যবস্থার পত্তনে। ব্যক্তির জীবনেও কি তাই নয় ? বলুন, আমার ধারণাটা কি মিথ্যে ?

সংঘাতের মধ্য দিয়েই চাইলাম। নতুন সৃষ্টিকে, আনন্দের সৃষ্টিকে জীবনে যখন সোজা পথে উপস্থাপিত করতে পারলাম না—তখন আমি নিরুপায় হয়েই অন্য পথ নিলাম।

দোকান করার নেশায় বাবুরা আয়ের সামান্য পথটুকুও পরিত্যাগ করে বই-পাড়ায় ঘরের সন্ধানে এবং অন্যত্র জমির ক্রেতার সন্ধানে সকাল-সন্ধে ঘুরে ঘুরে সময়ের অপচয় করে, সংসারের অবস্থা সঙ্গীন করে তোলায় আমার মনের অবস্থা একেবারেই অসহনীয় হয়ে উঠল। সেই সঙ্গে যমুনার প্রতিও সন্দেহ ও অবিশ্বাস ক্রমাগত বেড়ে গিয়ে আমার ভেতরটা চরম উত্ত্যক্ত করে তুলতে লাগল।

একদিন যমুনাকে শুনিয়েই বললুম—'এতই যখন দোকান পাতার সাধ, তখন সিনেমা থিয়েটার রেস্তোরাঁ না করে এবং মেজাজ তৈরীর নাম করে পেগ পেগ মদ না গিলে, সিগারেটের পর সিগারেটে পয়সা না ওড়ালেই তো হতো।'

আজকাল যমুনা আমার স্বামীর হয়ে সব কথারই জবাব দেয়। এখনো দিল—'দ্যাখো দিদি, বানিয়ে বানিয়ে অমন মিথ্যে বলো না। ও'র জন্যে যে খরচ হয়, তা তো আমি দি-ই। তাঁর নোট লেখার টাকার এক পয়সাও এতে খরচ হয় না। আর সিনেমা থিয়েটার রেস্তোরাঁর কথা বলছ—স্রেফ বানানো কথা।'

—'বানানো কথা আমি একটিও বলিনি। শাক দিয়ে মাছ ঢাকা গেলেও গন্ধ ঢাকবে কি দিয়ে? অভিজিৎবাবুই তার প্রমাণ। বরকনের মতো ফটো তোলনি তোমরা?' কথাটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও তার মুখের ওপর ঝাল মেটাতে ছুঁড়ে দিলাম।

—'ফটো—!' যমুনা যেন আকাশ থেকে পড়ল।

—'হ্যা। প্রমাণ চাও?' প্রমাণ চাইল না যমুনা। উদ্ধত ফণী যেমন সাপুড়ের মন্ত্রপূত ধুলা নিক্ষেপে মিইয়ে যায়, যমুনাও তেমনি হয়ে গেল। এবং আলনা থেকে দ্রুত একখানা শাড়ি টেনে গায়ে পেঁচিয়ে বের হয়ে গেল হন্‌হন্ করে। বোধহয় কলেজ স্ট্রীটে তার প্রাণনাথের সন্ধানে।

মা-মাসীর ঝগড়া-বিবাদ, দেখে মামণি খেলা ফেলে কখন এসে দরজার সামনে উঠোনে দাঁড়িয়েছিল—যমুনা ঐভাবে চলে যেতেই সে 'ও মাসী', 'ও মাসী' বলে কাঁদতে লাগল। ওর মুখে বারে বারে 'ও মাসী', 'ও মাসী' শব্দটা যেন আমার কাছে বিষের মতো মনে হচ্ছিল। সহ্য করতে পারলুম না। ছুটে গিয়ে ওর গালে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে মনের জ্বালা মেটালুম। ধমকিয়ে বললুম—ফের মাসী বলবি, একদম মেরে ফেলব।'

মেয়েটা ওর বাধ্য হয়েছিল এমনি নয়। যে বয়সে মেয়েরা মা হয় সে বয়সে তার বিয়ে না হলেও মাতৃস্নেহ তো বুকে আসেই, তাই সে অকৃত্রিম মাতৃস্নেহেই আমার মামণিকে বড় করে তুলছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যে মাতৃত্বের দাবী নিয়ে মেয়ের বাপকেও চাইবে—এ আমি কল্পনাও করতে পারিনি। এসব যখন মনে হতো তখনই ঘেন্নায় একটা 'ছিঃ' বলে মন থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিতুম।

যমুনা বিকেলে বের হয়ে আমার পতিদেবতাকে নিয়ে সন্ধের কিছু পরেই ফিরল। আমি ভেতরে ভেতরে শঙ্কিতই ছিলাম—কারণ এদেশের নারীরা তো পুরুষদের কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করেই বরকে স্বামীত্বে বরণ করে। 'স্বামী'

কী বিপুল অর্থবোধক শব্দ। যা উচ্চারণের মধ্য দিয়েই আত্মোৎসর্গ শুরু হয়ে যায়। 'স্বামী' স্ত্রীর ক্ষেত্রে অসীম শক্তিশালী এক পুরুষ। সেই অসীম শক্তিশালী স্বামীর কাছে দাসীর বেয়াদব আচরণের জন্য নিশ্চয়ই নালিশ করা হয়েছে—কাজেই ভীত-ই ছিলাম। কিন্তু কোনো পক্ষ থেকেই কোনো সাড়াশব্দ না আসায় একটু আশ্চর্য হয়েছিলাম বইকি! অথবা তুরুপের তাস আমার হাতে থাকায় যমুনা সবটাই হজম করেছে। অথবা তার নালিশে দেবতা ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে দৈহিক নির্যাতন করতে এলে সকলের সামনে আমি যদি প্রামাণ্য বস্তুসকল হাজির করি—তা হলে তাদের কেলেঙ্কারীই প্রকাশ হয়ে যেতে পারে ভেবেই হয়তো চুপচাপ।

আমার রান্না প্রায় শেষ। যমুনা কণ্ঠ চড়িয়ে জানাল—তার মাস্টারমশাই কিছুই খাবেন না। কারণ গা'টা তাঁর জ্বরজ্বর। যমুনা নিজেও ভাত খাবে না, সেজন্য সে পাঁউরুটি কিনে নিয়ে এসেছে। মনে মনে ভাবলাম—শরীর ভালো নয়, জ্বরজ্বর—অথচ ঘরে এসেই আলমারী খুলে বোতল থেকে গেলাসে ঢালল, তারপর গলায়। নিত্যদিনের মতো আজও তো এসব যমুনার সামনেই হচ্ছিল—কই সে তো একবারও তাঁকে বারণ করল না! এভাবে আরও ক'দিন গেল। শরীর নাকি প্রায়ই ভাল যাচ্ছে না—কাজেই রাত্রের লুচি বা পরোটা কোনোটাই মাঝে মাঝে খান না। আমিও এসব নিয়ে আর পীড়াপীড়ি করি না। আসলে যমুনার সঙ্গে ঐদিন ঐরকমভাবে কথা কাটাকাটির পর সংসারটা যেন আপনা-আপনিই দু'ভাগ হয়ে গেছে। স্বামী ও তাঁর প্রিয়া একদিকে, আমি আর আমার অবোধ শিশু আরেক দিকে। যমুনা ও-ঘরেই বেশী সময় কাটায়। মামণি তার বাবাকে যমের মতো ভয় করে বলে মাসীকে খুঁজতে ও-ঘরে কখনো যায় না, আমিও না। একদিন ওরা দু'জনেই রিকশা করে সকালবেলাই বের হয়ে গেল। সুযোগ পেয়ে ঢুকলাম দেবতার মন্দিরে।

ঘরে ঢুকেই নজর পড়ল বিছানার দিকে। বালিশ-চাদর-মশারি সবই এলোমেলো পড়ে আছে। গোছানো হয়নি। গোছাতে গিয়ে মনে হলো তোশকটা স্যাঁৎসেঁতে হয়ে আছে। বাইরে উঠোনভর্তি রোদ। দুটো চেয়ার পেতে তোশকটা রোদে দেব ভেবে গুটিয়ে নিতে গিয়েই দেখি একটি মুখছেঁড়া সাদা খাম।

কবি নীলাঞ্জন চৌধুরীর নামে কত চিঠিই তো আসে! তার সবই থাকে চিঠির ফাইলে। এটা এখানে কেন? কৌতূহল হলো খামের উপরে লেখা নাম-ঠিকানা—যমুনার নয়। ভাবলাম বোধহয় সাময়িক পত্র-সম্পাদকের। তুলে নিয়ে ফাইলে রাখতে গিয়ে হঠাৎ খেয়াল হলো—কী লেখেন সম্পাদকরা? এত ভারী চিঠি। খুলে দেখে চক্ষুস্থির হয়ে গেল। প্রায় চার পৃষ্ঠা যমুনার প্রেমপত্র। অপরের অসাক্ষাতে তার চিঠি পড়া নিশ্চয়ই পাপ। কিন্তু তখন আমার পাপপুণ্য বিচার করার শক্তি ছিল না। এত বড় দীর্ঘ চিঠি লুকিয়ে পড়তে হবে—ভেবে ব্লাউজের ভেতর লুকিয়ে ফেললাম। এটাও আমার আর একটা হাতিয়ার হলো। ফটো, থিয়েটারের পাণ্ড করা টিকেট—উভয়ের বাইরে রাত্রিবাস এবং শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মতো মিথ্যে

বলা সত্ত্বেও যমুনাকে তখনো পুরোপুরি অবিশ্বাস করতে পারিনি। রাগের মাথায় সেদিন দু'চার কথা বললেও মন থেকে তাকে একেবারে তুলে ফেলতে পারিনি। আমার স্বামীকেই আমি দায়ী করেছি বেশী। তুমি বিবাহিত। সন্তানের বাপ। তোমার ক্ষুধা মেটানোর মতো সুন্দরী বৌ ঘরে। তার সঙ্গেই তোমার মান-সম্মান জড়িত। তাকে নিয়েই তোমার জীবনের পূর্ণতা সম্ভব। তোমার প্রতি সে প্রতি মুহূর্তেই নিষ্ঠাবতী। তোমাদের উভয়ের সম্মিলিত রূপযৌবন বংশ ও সমাজের মর্যাদা বৃদ্ধি করে। আর যমুনা? অবিবাহিতা—বলতে গেলে অজ্ঞাতকুলশীলা —তোমার চেয়ে নিম্নবর্ণের ক্ষুধার্ত যুবতী। তোমার সঙ্গে ছাত্রী-শিক্ষক সম্পর্ক। সে মর্যাদা সে না দিতেও পারে। তার বুভুক্ষু হৃদয়ে উচ্চবর্ণের কোনো শিক্ষিত ব্যক্তির প্রতি আকৃষ্ট হওয়া যেমন খুব একটা অন্যায়ও নয়, তেমনি অসম্ভবও নয়। তোমার প্রশ্রয় না পেলে সে এক পা-ও এগোতে পারে না।

এমনি করে উভয়কে বিচার করেছিলাম এতদিন। যমুনার ভালোবাসা শুধু তার মাস্টারমশাইকেই স্পর্শ করেনি, করেছিল তোমার স্ত্রী-কন্যাসহ সমগ্র পরিবারটিকেও।

চিঠিটা বুকের মধ্যে লুকোনোর সময় আমার মধ্যে যে পাপবোধ জেগেছিল—তাকে দুমড়ে-মুচড়ে পায়ে দলে-পিষে ফেলে দিয়ে তার চেয়ে আরো বড় পাপ করার জন্য মনকে তৈরী করলাম। কিন্তু রাতের আকাশ দেখে সব ভুলে গেলাম। শ্রাবণের শুক্লা চতুর্দশী। অথচ নির্মেঘ আকাশ। জ্যোৎস্নায় বাড়িঘর গাছপালা সব যেন ধুইয়ে দিচ্ছে। ডালিম গাছ, পেয়ারা গাছ, উঠোনের একপাশে রজনীগন্ধা ও কবির ঘরের পুব-দখিন কোণে হাসনুহেনারা রূপের ডালি সাজিয়ে হবু পূর্ণিমার চাঁদকে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছিল। আমার রান্নার কাজ শেষ করে ও-ঘরে যমুনাকে দিয়ে খাবার পাঠিয়ে বারান্দার সরু পিলারে ঠেস দিয়ে শুক্লা চতুর্দশীকে দেখছিলাম। মিষ্টি মিষ্টি বাতাস, দাঁড়ালে ঘাম শুকিয়ে যায়। সমস্ত বাড়িটা গন্ধে ম' ম' করছিল। এমন জ্যোৎস্নাই ছিল সেদিন সেই বৈশাখে। চার বছর আগে যেদিন স্বামীর পৈতৃক ভিটের ছাদে—জ্যোৎস্নার মতো সাদা বিছানায় স্বামীকে প্রথম ও শেষ পেয়েছিলাম। এমন টলটলে জ্যোৎস্না দেখলেই সেই স্মৃতি মনের পর্দায় ভেসে ওঠে। ভেবেছিলাম খাওয়া-দাওয়ার পর উঠোনের খোলা জায়গাটায় মাদুর পেতে শোব। যমুনা যদি আসে আসবে। না এলে কোনো ক্ষতি নেই। ঘরের ভেতরটায় তো ভ্যাপসা গরম। মামণি হয়তো ঘেমে কাঁই হয়ে আছে। ওকে নিয়ে এসে পাশে শোয়াব। আকাশ কী নির্মল! এখন আকাশের নিচে কার না সাধ জাগে চাঁদের মুখোমুখী হতে? এখন আমার মনে কোনো পাপ নেই। আমার মনে কোনো শয়তান নেই। এখন সবাইকে খুব ভালোবাসতে ইচ্ছে করছে। মনকে প্রশ্ন করলাম যমুনাকে কি আমি হিংসা করি? না। করি না। ও কি সত্যি আমার স্বামীকে ভোগ করতে চায়! বিবাহিত পুরুষকে কোনো কুমারী মেয়ে কি কখনো ভোগ করতে চায়? কোনো অবিবাহিত পুরুষ কি কোনো বিবাহিতাকে চায়? সমীরবাবু কি আমাকে চেয়েছিল? ধ্যাৎ। এমনটা কখনো

হতে পারে? অন্তত আমি বুঝিনি। ভালোবাসা কি দৈহিক সম্পর্ক ছাড়া হতে পারে না? ভালোবাসা কি নারীতে পুরুষেই হয়? পুরুষে পুরুষে, নারীতে নারীতে হয় না? তা'হলে যমুনাকে কি আমি ভালোবাসি না? ও না থাকলে আমার মন খারাপ লাগে কেন?

এসব অদ্ভুত অবান্তর প্রশ্ন তখন আমার মনকে আলোড়িত করছিল। যমুনার চিঠিখানি তখনো পড়ার সময় পাইনি। বিরাট বড় চিঠি। প্রেমপত্র এত বড় হয় নাকি! ও এখনো ও-ঘর থেকে আসছে না কেন? খেতে দিতে গিয়ে এতক্ষণ দেরী হয় না তো? মনের মধ্যে আবার সংশয়ের মেঘ ঘনিয়ে এল। ওকে একবার ডাকলাম। সাড়া নেই। আবার ডাকলাম, তবু সাড়া নেই। সাড়া নেই কেন? কি করছে ও? পা টিপে টিপে গেলাম। পর্দা সরিয়ে আস্তে দরজা ঠেলে দেখলাম—দরজাটা ভেতর থেকে আটকানো। দেখেই মাথা গরম হয়ে গেল। হাসনুহেনা ও মাধবীলতার মাঝখানে একটা জানালা। পূর্বদিকের বৃষ্টি হলে জলের ছাটে বিছানা ভেজে, তাই ওটা অনেক সময়ই বন্ধ থাকে। তখনো ছিল। দক্ষিণ দিকে দুটো বড় বড় জানালা। এ দুটো প্রায়ই খোলা থাকে। বৃষ্টির ছাঁটের জল গেলেও বিছানা ভিজে না। মেঝেতে পড়ে গড়িয়ে যায় ঢালুর দিকে। কিন্তু জানালা দুটোর নিচের দিকটা আগাছা জঙ্গলে ভর্তি। হাসনুহেনার গন্ধে সাপ আসতে পারে—তাই কেউ রাতের বেলায় ওখানে যায় না। কিন্তু তখন আমার মনে সাপের ভয় নেই। ঘরের মধ্যে যে সাপটা রয়েছে সেটা হযতো এতক্ষণে আমার স্বামীকে দংশন করতে উদ্যত হয়েছে। আমার বুকের ভেতরটায় একটা অজানা সংশয় কেঁপে কেঁপে থেমে যাচ্ছিল। আমি চেপে চেপে শ্বাস ফেলছি, সাবধানে মেপে মেপে পা ফেলছি—ঘরের সাপটা যেন টের না পায়। একটা ভেরেন্ডা গাছ জানালার খানিকটা ঢেকে ছিল। আস্তে আস্তে তার পাতার ডালাগুলো ভেঙে পথ পরিষ্কার করলাম। তারপর ভেরেন্ডা গাছের ফাঁক দিয়ে যা দেখলাম আমার রক্ত যেন জমে বরফ হয়ে গেল। রক্তচলাচল বন্ধ হয়ে গেল। বুকের ভেতরটায় কে যেন পাথর চাপা দিয়ে আমায় দম নিতে দিচ্ছে না, পা দুটো যেন মাটিতে সেঁধিয়ে গেছে।

কতক্ষণ এভাবে স্তব্ধ নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম বলতে পারব না। একবার ভাবলাম—প্রাণপণে চিৎকার করি। লোকজন আসে আসুক। দেখুক সবাই। বিশ্বাসঘাতক—ভাল মানুষ দেখে চিনে রাখুক। পরক্ষণেই বাধা এল ভেতর থেকে। না—এ কলঙ্কের কালি আমাকে, আমার ভবিষ্যতকে স্পর্শ করবে।

হঠাৎ কানে এল—মেয়েটা কেঁদে উঠেছে। ও আজকাল মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখে কেঁদে ওঠে। গায়ে হাত বুলিয়ে দিলে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। মনে হয়েছিল তার কান্নায়ও যেন আতংকের বিভীষিকা।

ভগবান, আজ আর চুম্বনের শব্দ শোনা নয়, অনুমান নয়। নিজের চোখে দেখা। যেমনি সংগোপনে এসেছিলাম তেমনি ফিরে এলাম। খাবার তেমনি ঢাকা পড়ে রইল।

মেয়েটাকে ভাঙা বুকে জড়িয়ে, চোখের জলে বালিশ ভিজিয়ে কখন কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, জানি না।

পরদিন যমুনা চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে চা বানাতে এলে তার মুখের পানে তাকিয়ে শিউরে উঠলাম। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের মুখখানির থুতনির কাছে এক জায়গায় রক্ত জমাট হয়ে কালসিটে দাগ পড়ে আছে। একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, সাবধানে থেকো। ঘরের বাইরে যেও না আজ। সে বোধহয় বুঝতে পারেনি, ফ্যালফ্যাল করে আমার পানে তাকিয়ে রইল।

খুব সংযত মানুষও তার সদ্য অনুষ্ঠিত অপরাধের দুর্বলতাকে বোধ করি চেপে রাখতে পারে না। চোখে-মুখে চলনে-বলনে কৃত অপরাধের চিহ্ন ফুটে উঠবেই। অবশ্য এটা সকলের চোখে পড়ে না, হয়তো কারো কারো চোখে পড়ে।

যমুনার মুখের পানে তাকিয়েই আমার চোখে গত রাতের দৃশ্যটি ছবির মতো ভেসে উঠেছিল। আমার স্বামী তাকিয়ায় হেলান দিয়ে শুয়ে ছিলেন—সামনে টেবিলের উপরই জ্বলন্ত হ্যারিকেনটা এই নির্লজ্জতাকে বিদ্রূপ করার জন্যে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছিল আর যমুনা তাঁর বুকের উপর উপুড় হয়ে মুখে মুখ লাগিয়ে পড়ে ছিল। তারই চিহ্ন তার থুতনিতে।

ও খানিকক্ষণ এভাবে চেয়ে থেকে কৌতূহলী হয়ে বললে,—'কেন?' আমার মনে হয়েছিল,—তার এই 'কেন'র মধ্যে কিছু জানবার স্পৃহা ছিল না। শুধু কথার পৃষ্ঠে কথা বলা। কিন্তু আমার কাছে মূল্যবান। বললাম—'আয়নায় মুখ দেখে এস।'

যমুনা যেন কুঁকড়ে গেল। পলকে যেন সে তার সমস্ত মুখে মুঠো মুঠো ছাই মেখে সাদা করে দিয়েছিল। বিস্তীর্ণ চোখ দুটো নামিয়ে নিয়ে অসম্ভব ইচ্ছাশক্তি দ্বারা নিজের ফ্যাকাশে বিবর্ণ মুখখানিকে স্বাভাবিক করার জন্যে প্রাণপণে হাসি ফোটাতে চাইল—'ও এজন্য' অর্থাৎ এ কিছুই না। কিন্তু তার এত বড় বুকের পাটা নেই যে সত্যকে মিথ্যে প্রমাণের জন্যে দৌড়ে গিয়ে আয়নায় মুখ দেখে এসে আমাকে চ্যালেঞ্জ জানাবে। এঁটো বাসন ধুয়ে এসে দেখি, সত্যি সত্যি আয়নার মুখ দেখছে যমুনা। আমার উপস্থিতি টের পেয়ে নিজের মনে নিজেকেই যেন আমি শুনতে পাই—এমন-ভাবে বলছে, 'ইস্ ক'দিন দুশ্চিন্তায় আর ছোটাছুটিতে শরীরটা ভেঙে গেছে।'

আমার আর সহ্য হলো না। সত্যকে অস্বীকার করার এই নির্লজ্জ মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে অকস্মাৎ আমার মনটা বিদ্রোহ করে উঠল—রেগে তীক্ষ্ন হয়ে বললাম—'দাগটা কিন্তু মোছেনি। থুতনিটা চোখ দিয়ে দ্যাখো।' বলে হাতের বাসনগুলো একটু জোরের সঙ্গেই দাওয়ার ওপর রাখলাম।

এইভাবেই আমাদের সখ্য প্রেমে বিরোধ বাধল। এতদিন যাকে হিতৈষী ভাবতাম, সন্দেহটা মাঝে মাঝে মনকে দোল দিয়ে যেত মাত্র, স্থায়ী হয়ে মনের আঙিনায় গেঁড়ে বসতে পারেনি, আজ তা ভিন্ন রূপ হয়ে দেখা দিল। তাঁদের অভিন্নহৃদয়েষু সম্পর্কটা যখন কোনোমতেই রুখতে পারলাম না—তখন একদিন সময় বুঝে হেসে হেসে

বললাম—'তোমরা যখন এতখানিই এগিয়ে গিয়েছ, তখন পাকাপাকি ব্যাপারটা ভাদ্র মাসের আগেই সেরে ফেল না কেন ?'

এমনিভাবে কথাটা সোজাসুজি তার মুখের উপর বলতে পারব একথা আমিও একটু আগেও ভাবতে পারিনি। বোধ হয় যমুনাও পারেনি। বলল 'তার মানে ?'

দাগ হয়তো কাল মিলিয়ে যাবে কিন্তু চিঠি ও ফটো নিশ্চয়ই মিলিয়ে যাবে না। সেসব হয়তো সে জানে না, তাই বোধহয় মানে জানতে চায়। তার মানে জানতে চাওয়ার ঢং দেখে আমার মনে হয়েছিল, মানে বলতে না পারলে এক্ষুণি এক ছোবলে আমাকে শেষ করে দেবে। তাই হাসি পেল এবং হাসিটাকে রূঢ়ভাবে না চেপে সমস্ত মুখে ছড়িয়ে দিয়ে বললাম—'মানে ভাদ্র মাসে হিন্দুর ঘরে কতগুলি শুভ কাজ হয় না—তাই বলছিলাম।' পরে গম্ভীর হয়ে বললাম—'আমি বাধা দেব না! কথা দিচ্ছি। তিনি যদি সুখী হন, বাধা দেব না। বাধা হব না।'

আমার মনে হয় কি জানেন ? মনে হয় মেয়েরা সবচেয়ে বেশী দুর্বল তার স্বামী ও সন্তানের ব্যাপারে। তাই শপথের মতো কথাগুলি যখন বলছিলাম, তখন আমার বুকের মধ্যে কী ধরনের একটা যন্ত্রণা হচ্ছিল তা আপনাকে বোঝাতে পারব না। শেষের কথাটার সময় বোধহয় আমার উচ্চারণটাও ভেঙে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছিল। অবরুদ্ধ কান্নার একটা প্রচণ্ড ঢেউ যেন সমস্ত যুক্তিতর্কের বাধা ভেঙেচুরে ঠেলে এসে আমার কর্ণমূলে আঘাত করছিল। আমার মনে আছে—আমি আর এক লহমাও সেই পাপিষ্ঠার সুমুখে দাঁড়াতে পারছিলাম না। ঘৃণায় আমার-সমস্ত মনুষ্যত্ব, সমস্ত সভ্যতা, সমস্ত পবিত্রতা, সমস্ত বিশ্বাসের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্যে ছুটে চলে এলাম তার সামনে থেকে।

* * *

ক্ষুব্ধ বিষণ্নমনে আরো কিছুদিন কাটালুম। দেখতে ইচ্ছে হলো, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

সত্যি বলছি, আমার এ প্রতীক্ষা ব্যর্থ হয়নি। কিন্তু আমি খুবই আশ্চর্য আমার স্বামী ও যমুনার ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে—এক নং আসামী আমাকে এখনো পর্যন্ত কোনো কথাই বলেননি। প্রায়ই আমি আতঙ্কে থাকতাম—আজই বোধহয় আমাকে একচোট নেবেন। কিন্তু না। এখনো পর্যন্ত একটু নাসিকা গর্জনের মতো গর্জনও নয়। সময় বুঝে ও সময় করে চার পাতার চিঠির খাম নিয়ে বসলাম। খুলে দেখি—চার পাতা নয় দু'পাতা করে দু'জনের দুটো চিঠিই খামে পুরে রাখা হয়েছিল।

ওরা দু'জনেই বাড়ি নেই। মামণি ইস্কুলে। তবুও একটা গাছের পাতা পড়লেও ফিরে তাকাই কেউ এল কিনা। গেটের দরজা অবশ্য দেয়া আছে—তবুও সতর্কতা, কারণ কাজটা তো জঘন্য। পরের চিঠি লুকিয়ে পড়া অতি নিকৃষ্ট পাপ। অথচ তাই করতে হচ্ছে। শুধু ওদের ন্যাকামিপনার জন্যে। দিনরাত যাকে ঠোঁটে করে রাখা হয়, কথা বলার জন্য তাকে আবার চিঠি লিখে প্রেম নিবেদন করতে হয় ? এঁদের এসব কাণ্ড দেখে ঘেন্না ধরে না, বলুন তো ?

যমুনা লিখেছে—'তুমি আমার চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছ। ভালোবাসা যে এমন নির্মম—এই তেইশ বছরের জীবনে তা আগে জানিনে। তুমি আমার সত্তাকে নিঙড়ে নিয়ে যাচ্ছ প্রতি মুহূর্তে। ঘুম থেকে উঠে তোমাকে না দেখলে কী এক আশ্চর্য শূন্যতায় ভেঙে পড়ি, তুমি তা জান না। তাই প্রথমে তোমার ঘরে যাই শুধু চোখে দেখব বলে, কিন্তু দিদি যেদিন আগে ওঠে সেদিন যেতে পারি না। কিন্তু তখন আমার অবস্থা কেমন হয় তোমাকে বোঝাতে পারব না। এভাবে আর কতকাল চলবে? আমি আর পারি না। তুমি যদি দিদির সঙ্গে ভালভাবে কথা বলতে তা হ'লে রেজেস্ট্রি বিয়ের কথা বলতে এত অসুবিধা হ'তো না। জমির ব্যাপারটাও তাকে বলা দরকার ছিল। সংসারে কিছু বাস্তব বুদ্ধি নিয়ে চলতে হয়। তোমার সব আছে; বৈষয়িক বুদ্ধি কিছু নেই। সেজন্যই তোমাকে আগলে রাখি। দিদি তা পারলে আমার প্রয়োজন হতো না। আমার বিশ্বাস দিদি আপত্তি করবে না। দিদির সঙ্গে অশান্তি করলে আমার ক্ষতি হবে বেশী। এটা জেনে রেখো। আমি সর্বস্ব দিয়ে তোমাকে পেতে চাই এবং তা পরিপূর্ণভাবেই। চুরি করে পেতে চাই না। তোমার কবিতা ও তোমাকে আলাদা করে দেখি না—তুমি আমার পিপাসার সমুদ্র। আমি নদী। তোমাতে লীন হয়েই আমার পূর্ণতা। মুখে এত কথা বলতে পারি না, তাই লিখে জানালুম। ভুল হলে ক্ষমা কর—ইতি তোমার—'যমুনা'।

রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা বই থেকে একলাইন উদ্ধৃতি দিয়ে প্রেয়সীর চিঠির জবাব দিয়েছেন আমার স্বামী—'কেতকী হচ্ছে ঘড়ায় তোলা জল, তাকে নিত্য ঢালব, নিত্য ব্যবহার করব, আর লাবণ্য হচ্ছে মানস সরোবর—তাতে আমার মন সাঁতার কাটবে।' কবির চিঠির দু'পংক্তি পড়েই মনে হয়েছিল এর আগেও যমুনা চিঠি দিয়েছিল—তারই উত্তর কবির এই চিঠি। যমুনা কবির মানস সরোবর হয়ে থাকতে রাজী নয়। সে তার প্রেমিককে পরিপূর্ণভাবে পেতে চায়। সে তার কেতকীর মতো ঘড়ায় তোলা জল হতে চায়—নিত্য যার ঢালাঢালি, নিত্য যার ব্যবহার। তাই তার রেজেস্ট্রি বিবাহের প্রস্তাব। কিন্তু কবি এতখানি সাহস দেখাতে পারেননি বলেই-ক্ষোভে যমুনা বৈষয়িক বাস্তব বুদ্ধির পরামর্শ দিয়ে বলেছে দিদির মতের প্রয়োজন—আর একাজটা সে তাঁকে দিয়েই করতে চাইছে। চতুর যমুনা এজন্য প্রলোভনের ফাঁদও পেতেছে—পাবলিশারের দোকান করার জন্য জমি বিক্রীর টাকা ঢেলে দেবে প্রাণনাথের পায়ে। বলুন—এরকম চিঠি পড়ে কার মাথা ঠিক থাকে। সেই মুহূর্তে আমার মাথা ঠিক ছিল কিনা মনে নেই—শুধু মনে আছে ঐ চিঠি পড়ার পর আমার বাকশক্তি লোপ পেয়ে গিয়েছিল। আমি পাথরের মতো নিথর হয়ে গিয়েছিলাম। আমার পরিষ্কার মনে আছে—পৃথিবীতে আর এক লহমাও বাঁচতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। এই অবস্থায় কোনো স্ত্রী কি এর পরও বাঁচার স্বপ্ন দেখতে পারে?

শুনেছি কবি-সাহিত্যিক, শিল্পী-ডাক্তার, বৈজ্ঞানিকদের স্ত্রীরা নাকি স্বামীকে নিয়ে সুখী হন না। তাঁরা সুখী হন—স্বামীর যশ-মান, বিত্ত-বৈভব, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-

বান্ধব নিয়ে। সুখী হন গৃহিণীর মর্যাদায় নিজেকে অধিষ্ঠিত দেখে। সংসারে স্বীয় নেতৃত্বে একটা দৃঢ়ভিত্তিক আর্থিক বনিয়াদের উপর—অতীতের সুখস্মৃতি ও ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিয়ে। আমার কি আছে? কিছুই নেই। শুধু তাই নয়, এই নয়টাকে কেন্দ্র করে আজ আমি উপহাসের পাত্রী। তাই আর বাঁচতে ইচ্ছে হচ্ছে না। মানুষ যদি ভবিষ্যতের স্বপ্ন না দেখে তবে সে কেমন করে বাঁচবে বলুন! মানুষ ছাড়া অন্য জীবেরা যে ভাবে বাঁচে মানুষ সেভাবে বাঁচতে পারে না।

নিজেব জীবন দিয়ে যা উপলব্ধি করলাম—তাতে অনায়াসে বুঝতে পারছি—বিপিনের কচি বৌটা কেন গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল।

আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলুম—আমার মনের মধ্যে একটা দুর্বোধ্য অন্ধকার ক্রমেই যেন আরো ঘন হয়ে এগিয়ে আসছে। কোনামতেই আলো জ্বালাতে পারছি না।

তাকে যে অন্ধের মতো বিশ্বাস করেছিলাম, আজ বুঝেছি তা বিশ্বাস নয়, আমার মূঢ়তা। প্রতিদিনের দগ্ধ যন্ত্রণা। যখন গায়ের রঙ পালটাতে শুরু হল—তখন আহারের প্রবৃত্তিও নষ্ট হয়ে গেল। আমার মনের অজ্ঞাতেই ক্ষয়ের চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠল। আয়নার সামনে সিঁথিতে সিঁদুর পরতে গিয়ে নিজেকে দেখে নিজেই চমকে উঠলাম। নিটোল পুষ্ট দেহখানি যে এত সহজেই এমন শীর্ণ হয়ে যাবে—তাজা গোলাপের মতো গায়ের রঙ বাসি গোলাপের মতো শুকনো, ফ্যাকাশে হয়ে যেতে পারে তা আগে ভাবিনি। জানি না, সেদিন আয়নায় নিজেকে দেখে কেন চোখ দিয়ে দু'ফোটা জল গড়িয়ে পড়েছিল।

বিকেল থেকেই শরীরটা ভাল লাগছিল না। কি খেয়াল হলো ক্যালেণ্ডার দেখতে উঠে গেলাম। পূবদিকের দেয়ালে মা কালীর ছবিসহ একটা বাংলা ক্যালেণ্ডার ছিল। দেখলাম আজ কৃষ্ণা একাদশী। মা কালীর ছবিটার দিকে তাকিয়ে প্রতিদিনই আমি সন্ধ্যা-প্রদীপ দেখাই। প্রতিদিনই একটা চন্দন ধূপকাঠি জ্বালিয়ে আরতির মতো করে হাত ঘোরাই। তারপর দেয়ালের ছোট গর্তে কাঠিটা পুঁতে রাখি। হাত জোড় করে মাকে প্রণাম করি। আজ হঠাৎ মনে হলো—আমি না থাকলে মায়ের কাছে কেউ ধূপ জ্বালাবে না। একথা ভাবতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। এ বাড়িতে লক্ষ্মীর আসন পাতাও নিষেধ। তাই ক্যালেণ্ডারের মায়ের ছবিতেই আমি মনে মনে পুজো করি। সে পুজোও কেউ করবে না। একথা ভাবতেই আবার দু'চোখ জলে ঝাপসা হয়ে এসেছিল। আঁচলে চোখ মুছে ফিরে আসতেই দেখি মামণি স্কুল থেকে কলকল শব্দে ফিরে আসছে। পেছনে যমুনা। যাবার সময় সে অন্যদের সঙ্গে স্কুলে যায়। ফেরার সময় যমুনাই তাকে রোজ নিয়ে আসে। স্কুলের জামা পাজামা খুলে সাধারণ জামাপ্যাণ্ট পরিয়ে খেতে দেয়। আজ দিল না। স্বামীর শরীরটা নাকি ক'দিন ভাল যাচ্ছিল না। তাই সে মেয়েকে ঘরের দরজায় পৌঁছে দিয়ে চলে গেল তাঁর কাছে। বেশ কিছুদিন যমুনাই আমার স্বামীর জিম্মাদারী নিয়েছে। নতুন করে স্বামীর অধিকার রক্ষার বাক্‌বিতণ্ডায় যেতে আমার আর বিন্দুমাত্রও প্রবৃত্তি ছিল না। তাড়াতাড়ি সংসারের

কাজ শেষ করে সন্ধের কিছু পরেই মামণিকে খাইয়ে-দাইয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লাম। আমার শরীরটা ক্লান্ত হলেও চোখে ঘুম এল না। বোধহয় আমার অজ্ঞাতেই একটা মহৎ কাজ সম্পন্ন করার জন্যে আমার মন সযত্নে দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। আমাকে কেউ না ডাকলেও আমি বেশ বুঝতে পারছিলুম—সেই কাজে আমার সাহায্য করা উচিত। শোয়া থেকে উঠে বসলাম। মশারীর ভেতর থেকেই টেবিলে রাখা হ্যারিকেনটার পলতে বাড়িয়ে দিয়ে মশারীর ভেতরটা দেখলাম। না, ভেতরে মশা নেই। পাখা দিয়ে মামণিকে আরেকবার হাওয়া দিয়ে তার ঘুমন্ত মুখখানি নিরীক্ষণ করে দেখলাম। মামণির মুখখানিতে স্বামীর মুখের আদল আছে। ওর ঘুমন্ত শরীরটায় আবার হাত বুলিয়ে দিলাম। বুকের ভেতর থেকে একটা নিঃশ্বাস দীর্ঘসময় নিয়ে ধীরে ধীরে ফেলে দিয়ে ওর চুলের গোড়ায় একটা চুমু খেলাম। তারপর বিছানা ছেড়ে বাইরে এসে দেখি, টেবিল ঘড়িতে রাত এগারটা। চুপি চুপি উঠোন ডিঙিয়ে স্বামীকে দেখতে গেলাম। অসুস্থ বলে দু'দিন তিনি বাইরে বেরুননি। বের হলেও আমার চোখে পড়েনি। পর্দাটা সরিয়ে কপাটের ফাঁক দিয়ে দেখতে চেষ্টা করলাম। দেখতে পারলাম না। সেদিনের মতো আবার সেই জঙ্গলের পথ ভেঙে দক্ষিণের জানালার ফাঁক দিয়ে কয়েক হাত দূর থেকে দেখলাম। ঘরের আলোটা একেবারে কমিয়ে রাখা হয়েছে। দু'টি ছায়ামূর্তি পরস্পরকে জড়িয়ে কণ্ঠলগ্ন হয়ে আছে। আমার বুকের ভিতর থেকে আবার একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসতে চাইছিল। আমি তাকে রোধ করলাম। এমন সুন্দর দৃশ্য নৈসর্গিক দৃশ্যের মতো নিঃশব্দ থাকাই মানায়। আমি দূর থেকেই আমার স্বামীকে হাতজোড় করে চোখ বুজে প্রণাম করলাম। তারপর ধীরে ধীরে সন্তর্পণে সরে এলাম।

আমি ভালবাসতে জানি না বলে যারা আমাকে অপবাদ দিয়েছিল আজ তাদের প্রতি আমার কোনো অভিমান নাই। কাউকে ভালবাসতে পারিনি বলেও কোনো দুঃখ নাই। কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নাই। হিংসা-বিদ্বেষ, জ্বালা-যন্ত্রণায় আমি আর দগ্ধ হচ্ছি না। আমি শান্তির সন্ধান পেয়ে গেছি। উঠোনে দাঁড়িয়ে গাছ-গাছালি বাড়ি-ঘর সব ছায়া ছায়া দেখছি। কৃষ্ণা একাদশীর অন্ধকারে সব ডুবে গেছে। আমার চারিদিকের পৃথিবী একেবারে নিঃস্তব্ধ। দূরে বে-রসিক ব্যাঙেরা শুধু ঘেঁ-ঘঁ করছে। আকাশের দিকে তাকালুম। লক্ষ লক্ষ তারা আমাকে নিঃশব্দে চোখের ইশারায় ডাকছে। সহস্র সহস্র চুমকি পরা শাড়িতে মহাকাশের কোন মহারাণী নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছেন। আকাশের পূব-দক্ষিণ কোণে একখণ্ড কালো মেঘ সেই ঘুমন্ত রমণীর চুলের মতো ছড়িয়ে আছে। ঘরে এলুম—মা কালীর দিকে তাকালুম, তাঁর ঘনকালো ছড়ানো চুলের দিকে তাকালুম, মনে হলো এই মা-ই আকাশে ঘুমিয়ে আছেন। সন্ধেবেলায় ধূপ-দীপ দেয়ার সময় মাকে বলেছিলুম, মা, আজ তোমার কাছে আমি যা। সেই মা আমার জন্যে অপেক্ষা করে করে ঘুমিয়ে পড়েছেন। না, আর দেরী নয়। অনেক দেরী হয়ে গেছে। কাঠের চেয়ারটি ঘরের মধ্যিখানে পাতলুম। না, কেউ নেই।

চারিদিকে নিঃস্তব্ধ অন্ধকার। ঘরে এসে দরজাটা খিল দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে তাড়াতাড়ি শাড়ি-ব্লাউজটা গা থেকে খুলে ফেললুম। শুধু সায়া আর বডিস পরে কেমন দেখায় আয়নায় দেখলুম। মুখে স্নো-পাউডার মাখলুম। কাজল ও সিঁদুর পরলুম। হ্যারিকেনটা হাতে নিয়ে—পাতকুয়োর জন্য যমুনা যে দড়িটি কিনে এনেছিল—সেটা খাটের নিচে থেকে বার করে আনলুম। দড়িটা হাতে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতার এক পংক্তি মনে পড়ল—'মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সম।' আজ আমার প্রেমিকের সন্ধান পেয়ে গেছি। তার সঙ্গে কণ্ঠলগ্ন হ'ব। একটা অপূর্ব আনন্দে মনটা নাচতে লাগল। আমার ভালবাসার পাত্রের ঠিকানা পেয়ে গেছি, তাঁকে নিয়ে মায়ের কাছে চলে যাব। একটা মোমের টুকরো ছিল, জ্বালিয়ে দিলুম। একটা ধূপ জ্বালিয়ে ক্যালেণ্ডারের পাশে পুঁতে রেখে মায়ের ছবিকে আবার প্রণাম করলুম। তারপর চেয়ার টুল বেয়ে উঠে ঘরের কড়িকাঠের সঙ্গে দড়িটা বেঁধে নিচের দিকে হাতখানেক ঝুলিয়ে হড়কা গিরো দিয়ে দেখলুম, হড়কা গিরো গলায় পরে পা দিয়ে টুলটা ঠেলে সরিয়ে দিলে কাজ হয় কি না। হয়।

নেমে এসে আবার মশারীটা একটু তুলে মেয়েটাকে আবার একটু বাতাস করলুম। যাতে সে গরমে জেগে না ওঠে। মশারীর বাইরে এসে চারিদিক তাকিয়ে দেখলুম। না, কোনো কাজ বাকী নেই। সব ঠিক আছে। হঠাৎ মনে পড়ল যাঁরা ও-ঘরে কণ্ঠলগ্ন হয়ে আছে তাঁদের কিছু বলা হয়নি। একটুকরো কাগজে লিখলুম, 'তোমরা সুখে থাক। আমার মেয়েটাকে তোমাদের হাতে দিয়ে গেলুম। দেখো। ইতি—
শিখা।'

বিয়ের পর গঙ্গা নামের পরিবর্তে শিখা নামটি উনিই আমাকে দিয়েছিলেন। লিপিকা নাম রেখেছিল ওঁর বন্ধু সমীরবাবু। আমি তাঁর জীবনে শিখা হতে পারিনি বলে লিপিকা নামই ব্যবহার করতুম। এতে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন কি না সে খবর কোনোদিনই রাখিনি। আজ শেষ বিদায় বেলায় তাঁর দেওয়া শিখা নাম দিয়েই—ইতি টানলাম। চিরকুটখানি হ্যারিকেন চাপা দিয়ে হ্যারিকেনটা নিভিয়ে দিলাম। মোমের স্নিগ্ধ আলোয় আমি চলে যাব। গলায় ফাঁসীর দড়ি পরেও একটু অপেক্ষা করছি,—আলোটা নিভে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি যাব—যাতে মেয়েটা ঘুম ভেঙে আমাকে ঝুলন্ত অবস্থায় প্রথম না দেখে।

শান্তির কোলে ঢলে পড়ার জন্যে শুভলগ্নের অপেক্ষা করছিলুম। মোমটা গলে গলে জ্বলে যাচ্ছে। জ্বলে যাচ্ছে কিন্তু আলো দিচ্ছে। বুকে দহনজ্বালা নিয়েও মোমের টুকরোটা আলো দিচ্ছে। আমি দহনজ্বালা নিয়ে আলো দিতে পারিনি। মোমটা যেন বলছে তুমি নিভে যাচ্ছ কেন? জ্বলেজ্বলেই আলো দিতে হয়।

হঠাৎ একটা চাপা হাসির শব্দে চমকে উঠলাম। আমার মনে হলো সাপের ছোবলের মতো সেই শব্দ। এবং তা উঠোনেই। আবার সেই হাসি। সঙ্গে সঙ্গে চুম্বনের শব্দ।

জ্বলতে জ্বলতেই আলো দিতে হয়—কথাটা ঘুরপাক খাচ্ছিল মনে। গলায়

পরানো ফাঁসটা খুলে ঘাড় ফিরে দরজার দিকে তাকালুম। দরজা খিল দেওয়াই আছে। পতিদেবতার অনুচ্চ কণ্ঠ। আস্তে ধাক্কা দাও, কড়া নাড়। রাত অনেক হয়েছে। মেঘটা মাথার উপর উঠে আসছে। আবার চুম্বনের শব্দ।

হঠাৎ মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। ওঁরা আমাকে শান্তিতে মরতেও দেবে না। ওদের অকৃতজ্ঞতায় মনের ভেতরে যেন একটা ঘৃণার আর্তনাদ আমার শিরা-উপশিরায় তড়িৎ-বেগে ছোটাছুটি আরম্ভ করে দিল। আমার সমস্ত প্রতিজ্ঞা যেন একটা প্রচণ্ড ভূমিকম্পে টলমল করতে লাগল। আমার মনে হ'ল আমি যেন একটা বিস্ফোরক দ্রব্য। আমার মধ্যে যেন একটা তীব্র দাহিকাশক্তি আছে। মানুষের অন্যায়ের বিরুদ্ধে, ব্যভিচারের বিরুদ্ধে, নীচতার বিরুদ্ধে, ঘৃণ্য চক্রান্তের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণায় এই মুহূর্তেই ফেটে পড়তে চাইছি।

পলকে ক্রোধে অন্ধ হয়ে গেলাম। মৃত্যু আর শ্যামসম মনে হলো না। অকস্মাৎ মনে হলো—অধর্মের বিরুদ্ধে হিংসার দাবানল জ্বালানোর ন্যায়ত অধিকার আমারও আছে। সুখ-শান্তি-সোহাগে আমারও বাঁচার অধিকার আছে। আমার স্বামী, আমার কন্যা, আমার সুখের নীড়। সে কে? বিষ্ঠার কীট। মুহূর্তে এক নতুন চেতনা উপলব্ধি করলাম। আমি কবি-পত্নী—যাঁর লেখায় স্ফুলিঙ্গ ঝরে—আমি সেই কবির স্ত্রী। কবি হলেন বহ্নি, আমি তার শিখা।

প্রচণ্ড কড়্‌কড়্ শব্দে বাজ পড়ল খুব কাছেই। কানে তালা লাগার মতো অবস্থা। ঘর-দরজা আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তাসুদ্ধ সব কেঁপে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে বাজ পড়ার মতোই আমার মেয়ে ঠাঁ ঠাঁ করে চিৎকার করে উঠল।

অন্যদিকে বাইরে থেকে যমুনা দরজার কড়া নেড়ে দরজা খোলার তাগাদা দিচ্ছিল। বাজ পড়ার শব্দ, মেয়ের চিৎকার, যমুনার কড়ানাড়া। সেই মুহূর্তে কয়েক লহমা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলাম।

কিন্তু তা কয়েক লহমাই। পরক্ষণেই দড়ি ছেড়ে দিয়ে টুল চেয়ার থেকে নেমে ছুটে গিয়ে আলো জেলে মেয়েকে কোলে নিয়ে এসে দরজা খুলে দিয়ে যমুনার মুখোমুখী দাঁড়িয়ে ক্ষুব্ধস্বরে বলেছিলাম, 'তোমার অভিসার শেষ হলো? আমার শেষ হলো না।'

বাইরে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছিল। যমুনা ঘরে ঢুকে চেয়ারের উপর এভাবে টুল রাখা দেখে বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিল। সে আমার অর্ধাবৃত দেহ ও কড়িকাঠে-ফাঁসের দড়ি ঝোলানো দেখে বোধহয় হতবাক্ হয়ে গিয়েছিল। আতঙ্কে ও বিস্ময়ে আমাকে ও ঝুলন্ত দড়িটা দেখছিল। বললাম, 'কী দেখছ? ভেবেছিলাম তোমাকে সব দিয়ে যাব—স্বামী, সন্তান, আর ভাবি সন্তানের মা হওয়ার অধিকার।'

তার মুখে কথা সরছিল না। মেয়েকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে দরজা এঁটে আবার তার সমুখে এসে দাঁড়িয়ে কঠোর দৃঢ়স্বরে বলেছিলাম—'পরে ভেবে দেখলাম নারীধর্মের প্রতি অবিচার হবে। তাই তোমাকে দিয়ে যেতে পারলাম না। আর

ক্ষমা করতেও পারলাম না'—বলেই অন্ধ ক্রোধে, যে গালে একটু আগে সোহাগের আবীর মেখে এসেছিল—সেই গালে খুব কষে একটা চড় বসিয়ে দিলাম। আমার সমস্ত ক্রোধ যে তার উপর গিয়ে পড়বে একটু আগেও একথা ভাবতে পারিনি। শুধু তাই নয়—সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত শক্তি একত্রিত করে ক্রুদ্ধা ভুজঙ্গিনীর মতো গর্জে উঠে বলেছিলাম তুমি যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছ তার জন্য আরো শাস্তি পেতে হবে। কাল রাত পোহাতে না পোহাতে আমার সমস্ত ঘেন্না নিয়ে যেখান থেকে এসেছ সেখানে চলে যেও।

আমার বক্তব্য ঝড়ের বেগে শেষ করে দিয়ে বিজয়িনীর মতো খাটে গিয়ে বসেছিলুম। সে বোধহয় অভাবনীয় এ ঘটনা ও আমার ক্রোধ দেখে ভীত- সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। তাই চপেটাঘাতের জায়গাটা বাঁহাতে চেপে ধরে নতমুখে পাথরের মতো নিস্পন্দ হয়ে গিয়েছিল।

যমুনার নির্লজ্জ আদিখ্যেতা ভাবটায় আমি এতই ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম যে দরজাটা সশব্দে বন্ধ করার সময় কোনও দৃক্‌পাত করার সময়ও ছিল না, বোধ হয় কলঙ্ক ঢাকার প্রয়োজনও বোধ করিনি। আমার পতিদেবতা যে তার প্রেয়সী প্রিয়ার দুর্গতিটাকে স্বচক্ষে দেখার আশায় বাইরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিলেন—সেকথা বুঝতে পারলাম তখন— যখন জোরে জোরে কড়া নেড়ে বজ্রকণ্ঠে আমার নাম ধরে ডেকে দরজা খোলার হুকুম করলেন। খুলে দিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিলাম। মুখে কথা ছিল না—কিন্তু মনে ছিল—হ্যাঁ তুমি এস। এস তোমার ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে, আমার কাছে এস। তবুও এস! তোমাকে যদি আদরে সোহাগে না-ই পাই,—তবে ভয়ঙ্কর রূপেই যেন পাই। মনে মনে এসব কথা নিয়ে অদ্ভুত সাহসে তাঁর সমুখেই দাঁড়িয়ে ছিলাম।

তিনি একবার আমার প্রতি ক্রোধের দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাঁর প্রেয়সীর নত মুখখানি তুলে ধরে, জোর করে যমুনার চাপা দেওয়া হাতটা সরিয়ে বাঁ-হাতে আলোটা তুলে দেখে বললেন—'ইস্ পাঁচটা আঙ্গুলই ফুটে উঠেছে।'

চুপ করে থাকতে পারলাম না। বিদ্রূপের বিষ ঢেলে তীক্ষ্নস্বরে বললাম—'চুম্বনের দাগের পাশে একেবারে খারাপ দেখাবে না।' বুদ্ধিজীবীরা যেমন নিজের দুষ্কর্ম ঢাকার জন্যে অভিযোগকারীকেই ক্রোধ দেখান, তেমনি আমার স্বামীও তাঁর চোখে ক্রোধের অনল ঢেলে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। কিন্তু তাঁর ক্রোধকে কোনমাত্র আমল না দিয়েই লজ্জা ঢাকার জন্য দ্রুত সরে গিয়ে সায়া-বডিস পরা দেহটাকে ছেড়ে রাখা শাড়িটা দিয়েই পেঁচিয়ে নিলুম।

তিনি আমার এমন প্রলয়ঙ্কর রূপ পূর্বে দেখেননি। তিনি অপরাধী হয়েও আমাকেই শাসিয়ে যাবেন—এটাই তো রীতি ছিল, আমি উলটো ফণা তুলতে পারি, এমনটা বোধ হয় কল্পনাও করেননি। তাই যতখানি রূঢ় তাঁকে দেখবো বলে মনে করেছিলাম ততখানি রূঢ় হতে দেখলাম না। সম্ভবত একসময় কড়িকাঠে ঝুলানো দড়িটাও দেখেছিলেন।

পরে আমার দিকে তাকিয়ে ভৎ'সনার সুরে বললেন—'না, তুমি একটা কেলেঙ্কারী না করে ছাড়লে না, ছিঃ!' আমার মুখের বাঁধন আজ খুলে গেছলো—'এটা কেলেঙ্কারী নয়, কেলেঙ্কারী বন্ধ করার ভূমিকা। এ ভূমিকাটুকু না থাকলে বড় জাতের কেলেঙ্কারীটা সকলের কাছে 'এত বড়' হয়ে উঠত বলে দুই হাত যথাসম্ভব বিস্তার করে দেখালুম এবং পরক্ষণেই যমুনার একটা হাত ধরে টেনে হিড়্‌হিড়্‌ করে তাকে তার বিছানায় এনে ফেলে দিয়ে বললাম—'এখনো হয়নি কিছু—একটি কথাও বলবে না' বলে তার মুখের সামনে তর্জনি তুলে শাসিয়ে দিলুম। আমার স্বামী আমার বাক্যবাণে জর্জরিত হবার ভয়ে আরেকবার একটা 'ছিঃ' বলে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। যমুনা বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে কাঁদছিল। আমি যখন আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম তখনও সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। অনেকক্ষণ তার কান্না শুনেছিলাম। তার উপর আমার রাগের মাত্রা তখনো কমেনি। বললাম—'তোমার অনেক সৌভাগ্য, আমি যখন রোজ রাত্রে বিছানায় পড়ে কাঁদতুম তখন কেউ শুনতো না। আজ তোমার কান্না আমি শুনছি। তোমার আরো সৌভাগ্য যে, তুমি যে সুখ ভোগ করে কাঁদছ আমি যদি তার এক শতাংশও পেতাম—আর তার বিনিময়ে এর চেয়ে ঢের বেশী শাস্তি পেতাম তাহলেও এর চেয়ে কম কাঁদতুম না।'

আস্তে আস্তে তার কান্নার বেগ কমে এলে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললে—'তুমি এতো নিষ্ঠুর!'

অভিভাবিকার মতো বললাম—'দয়ামায়া থাকলে কি অন্যায়ের শাস্তি দিতে নেই?' আমি যেন আজ প্রগল্‌ভা। কথা বললেই জবাব। যমুনা আর কিছু বললে না। আরো কিছুক্ষণ কাঁদল। নিদ্রাহীন রজনী টেবিল ঘড়ির টিক্‌ টিক্‌ শব্দে আমারই মতো অন্ধকারে গা ভাসিয়ে দিয়ে বয়ে গেল।

এই গেল আমার জীবন নাট্যের আরেক অঙ্ক।

আমার মতো সাধারণ নারীর জীবনেও কত বৈচিত্র্যময় দুর্যোগপূর্ণ ঘটনা ঘটে কে তার হিসেব রাখে। কে তার কাহিনী শোনে। আপনার মতো সহৃদয় শ্রোতা পেয়েছি বলেই না হৃদয়ের পুঞ্জীভূত বেদনার ভার লাঘব করতে চাইছি। আপনি ধৈর্য ধরে আমার কথা শুনছেন বলে আপনার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই।

তারপর শুনুন—

অতি প্রত্যুষে বললে বোধ হয় ঠিক হয় না। রাত্রির শেষ যামই বলা চলে, বিছানা ছেড়ে পা টিপে টিপে এসে ফাঁসীর দড়িটা কেটে ফেললাম। দরজা খুলে বাইরে এসে দেখি পূবের আকাশ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। রক্তিম আভার রেশ তখনো পড়েনি। কবির ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখি—আধখানা খোলা দুয়ার। কৌতূহল হল। ঘরের ভেতর মুখ বাড়িয়ে দেখি—বাবু ধড়াচূড়া পরে তৈরী হচ্ছেন। বললাম—পালানোর আয়োজন নাকি? এসময়ে অকস্মাৎ আমাকে দেখে অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলেন। পরে মুখখানি কঠিন করে গম্ভীর স্বরে বললেন—'পালাব? কেন, কার ভয়ে? খুন করেছি না ডাকাতি করেছি?'

মনের অজ্ঞাতে মনে হল কে যেন তাঁর এই সাধারণ কথার জবাব দিয়ে বলেছিল, খুনের আসামী-ই তো হতে যাচ্ছিলে।

জামা-জুতো সবই পরা হয়েছিল, খাতা-কলম বোধ হয় খুঁজছিলেন, এসময় আমি এসে অনর্থ ঘটালাম—বিরক্ত হবারই কথা। চোখে মুখে সেই বিরক্তি ভাবই তো ফুটে উঠেছিল। আমার বুকের ভেতরটা দুরু দুরু করছিল। যমুনাকে ঐভাবে মারা বোধহয় তার মনে লেগেছে। অথবা ফাঁসীর দাঁড় টাঙ্গানো দেখে হয়তো আমার মতো পাপিষ্ঠা থেকে দূরে থাকার জন্যেই চলে যাচ্ছিলেন। মাঝে মাঝে তাঁর বিবাগী হওয়ার কথা সমীরবাবুর কাছেও শুনেছি। শাশুড়ী ঠাকরুণের কাছেও শুনেছি। কাজেই আতঙ্কিত হয়েছিলাম। তাই নির্লজ্জ হয়েই ঘরে ঢুকে দু'হাতে তাঁকে জাপটে ধরলাম। গায়ে বেশ জ্বর। বললাম—'এই জ্বর নিয়ে এই শেষ রাত্রে কোথায় যাচ্ছ?' তিনি আমার কথার জবাব না দিয়ে—হাত ছাড়ানোর জন্য জোর করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ চেষ্টা, পর বললেন—'তুমি কি আমাকে বেঁধে রাখতে পারবে?' কণ্ঠে তার অভিমানের গাঢ় স্বর। আমি চমকে উঠলাম। তার মুখের পানে তাকিয়ে চোখের ওপর চোখ পড়ল। আমি ছেড়ে দিয়ে কেঁদে ফেললাম। ধস্তাধস্তিতে তিনি বোধহয় ক্লান্ত হয়েছিলেন। ধপ করে খাটের ওপর বসে পড়লেন। আমি তার দু'পায়ে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতেই বললাম—'আমাকে ক্ষমা কর। আর করব না।' বিস্মিত হয়ে পাথরের মতো বসে ছিলেন। আমি তাঁর দু'হাঁটুর মাঝখানে মাথা ঘষতে ঘষতে বার বার ক্ষমা চাইতে লাগলাম—'আর কিছু বলব না। আর কিছু করব না। তোমাকে আমি বেঁধে রাখতে পারব না—তুমি যাবে কেন? আমি যাব। আমাকে দিয়ে তোমার জীবন কোন দিনই পূর্ণ হবে না গো' বলে আর্তনাদের মতো অনেক কথাই মুখ থেকে বের হয়ে আসছিল। তাঁর পায়ের গোড়ালি শুদ্ধু বুকের মধ্যে চেপে ধরে বললাম—'তোমাকে যেতে দেব না। আমি তোমার কোন কাজেই লাগব না—সে তো বহুদিন আগেই জানি। তাই এক পাশে নিজেকে সরিয়ে রেখেছিলাম,—কিন্তু নিজের ওপর নিজেরই ঘৃণা যখন আমাকে প্রতিক্ষণই দগ্ধ করছিল, তা সইতে না পেরে মরতে চাইছিলাম। মরতেও পারলাম না। তুমি ক্ষমা না করলে—বার বার ভেঙে যাচ্ছিলাম। কিছুক্ষণ বাদে কান্নার বেগ কমলে আবার চোখ তুলে বললাম—বল ক্ষমা করলে। বল। নইলে পাগল হয়ে যাব।'

আমার তপ্ত চোখের জলে পাথর বোধ হয় ঘামতে লাগল। তিনি আমাকে টেনে তার কোলের মধ্যে আমার মাথাটা চেপে ধরে হাত বুলোতে লাগলেন। মনের অজ্ঞাতেই তুমি সুম্বোধনের মধ্য দিয়ে স্বাধিকার বিস্তার করে স্বামীর সস্নেহ ভালবাসার পরশ পেয়ে গলে গেলাম। ভুলে গেলাম বিদ্রোহ করার শপথ। মনের সকল ক্ষোভ, সকল অহংকার চূর্ণ হয়ে গেল। ভুলে গেলাম নারীসত্তার সদম্ভ ঘোষণার প্রত্যয়ের কথা। মৃত্যুনীল জীবনের অপরাজিত শক্তির কথা। মনের মধ্যে ঢেউ খেলে গেল কবির সেই কথা—"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।" প্রত্যুষের স্নিগ্ধ

পরশের মতো আমি যেন তার পরশে সজীব হয়ে উঠলাম। ভাদ্রের ভরা যৌবনের লালিত্য যেন আমার চারিদিকে উপচে পড়ছে। সেই সমুদ্রে অবগাহনের আমন্ত্রণ এসেছে আমারও। আমি মিছে অভিমানে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না।

এক সময় আমার কান্নার তালে তালে কেঁপে ওঠা দেহটাও থেমে গেল। তিনি তাঁর জানু থেকে টেনে তুলে আমার সমস্ত মুখখানিকে তুলে ধরলেন তাঁর মুখের দিকে। আমি অবাক বিস্ময়ে দেখলাম—এক অপরূপ সুন্দর প্রভাত সূর্য।

কতক্ষণ এভাবে আমরা ছিলাম মনে নেই। তবে একথা বেশ মনে আছে, যখন স্বামীর ঘর থেকে চলে আসি তখন বোধহয় মধুপায়ী অলিকুল ফুলবনে গুনগুন করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

যমুনাকে যেতে দিলাম না। বলেছিলাম—'তুমি চলে গেলে চলবে কেন? তাঁকে কে দেখবে?'

এতবড় কাণ্ডের পরও তার ওপর আমার নির্ভরতা দেখে সে একেবারে থ হয়ে গিয়েছিল। আমার মনে হয়েছিল তার চোখে কোনো ভাষা নেই। শুধু ব্যাখ্যাহীন বিস্ময়। হয়ত ভেবেছিল কী করে আমার এমন সুবুদ্ধি হল অথবা আমি কি সত্যিই বলছি না বিদ্রূপ করছি। অথবা সে কিছুই ভাবছিল না—শুধু শুধু তাকিয়ে ছিল—এমনি। আর তার সদ্য পরা পোশাকী শাড়িটা টান মেরে খুলে ফেললাম। সে হঠাৎ আমার পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলেছিল—'দিদি আমি ভুল করেছিলাম তুমি আমাকে ক্ষমা কর।'

মনে মনে আমিও বলেছিলাম—শুধু তুমি ভুল করনি, আমিও করেছিলাম। আমি আমার স্বামীকে কবি বলে, সাহিত্যিক বলে, শিল্পী বলে ভয়ে সংকোচে মিছিমিছি দূরে দূরে ঘুরে অভিমানে ফুলেছিলাম। কবি হলেও যে তিনি মানুষ—এটা আমি যেন ভুলেও ভাবতুম না। মানুষের শিল্পীসত্তা ও মানবসত্তা যে অভিন্ন এ কথা—কিছুতেই উপলব্ধি করতে পারিনি—এটাই আমার দুর্ভাগ্য। যমুনা একদিন বলেছিল তিনি তোমাকেও ভালবাসেন। আমি বিশ্বাস করিনি। কবি ও মানুষ এই দুই সত্তাকে দুর্জ্ঞেয় দুর্বোধ্য মনে করে যত বেশী উদাসীন ছিলাম, তার চেয়ে ঢের বেশী উদাসীন ছিলাম মানুষটি সম্পর্কেও। এখানেই ছিল আমার ত্রুটি।

একথাও সত্যি, যমুনা আমার যত ক্ষতিই করে থাকুক—উপকার করেছে তার চেয়ে ঢের বেশী। আমার মধ্যে সচেতনা তৈরী করতে তার এই ক্রিয়াকলাপ কম কার্যকর হয়নি। সে আমাকে বারংবার আঘাত করে কোথায় আমার খাদ তাই দেখিয়ে দিয়েছে। আমার স্বামীর মধ্যে যে মহান মানুষটি লুকিয়ে ছিল—যাকে কোন দিনই খুঁজে দেখিনি, সে আমাকে তাই দেখিয়ে দিয়েছিল। সে জন্যে, মনে মনে তার প্রতি আমার একটা কৃতজ্ঞতা-বোধ আমার অজ্ঞাতেই এসে গিয়েছিল। সেজন্য তাকে বাধা দিয়েছি চলে যেতে।

আমার ষোল বছর বয়সে যদি নারীসুলভ চেতনা না-ই এসে থাকে তাতে আশ্চর্যের

কি আছে? কিন্তু যদি কোনদিনই না আসে তা হলে সেটা আশ্চর্য বই কি। চেতনার উপস্থিতি অনুপস্থিতি আমার ভুলশুদ্ধির উপরে নির্ভর করে না; কিন্তু চব্বিশ বছর বয়সী হয়েও যদি পুরুষকে সারাক্ষণ আমার মধ্যে আকর্ষণ করতে না পারি,—নারী হয়ে এটা অক্ষমতা নয় কি? ক্ষুধা আছে, ক্ষুধাকে প্রকাশ করা চেতনার দৈন্যতাই প্রকাশ করে না কি?

নারী রূপবতী হয়েও পুরুষকে আকর্ষণ করার জন্যে সে যুগে যুগে নিরাভরণ থাকেনি। বিচিত্র বর্ণে বিচিত্র আভরণে নিজেকে করে তুলতে চেয়েছে অসামান্যা রূপবতী। চিরন্তন কালপ্রবাহে এনেছে বারে বারে সমাজ জীবনে নতুন জোয়ার। কত লক্ষ কোটি মনে এনেছে অনুপ্রেরণা। বীণার ঝংকার অনুরণিত হয়েছে যুগ-যুগান্তর ধরে—নারীর রূপ-চিন্তা ও চেতনাকে কেন্দ্র করে।

সর্বকালের আধুনিকা হয়ে সে সমাজকে, জীবনকে করে রেখেছে গতিশীলা। কিশোরী থেকে যৌবনের অপরাহ্নে ক্রমাগত আকর্ষণ করে চলেছে পুরুষের চিত্ত চেতনাকে। পুরুষ ধরা দিয়েছে, ঘর বেঁধেছে, উভয়ের যৌথ প্রয়াসে গড়ে উঠেছে সমাজ, রাষ্ট্র,—নিত্য-নতুন রীতিনীতি। এক কথায় সৃষ্টি করেছে মানুষের জন্য নব নব বিধান। নর-নারী শ্রমের ফসলে যেমন জীবিকার সংস্থান খুঁজে পেয়েছে, তেমনি সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে উত্তরণের জন্য সৃষ্টি করেছে সঙ্গীত-নৃত্য-সাহিত্য; এঁকেছে জীবনের ছবি, নব নব আঙ্গিকে। জীবনকে নিয়ে যেতে চাইছে এক অনির্বচনীয় আনন্দলোকে। এই আশ্চর্য রচনায় আমার কোন অবদান নেই।

কেন নেই এ কথার জবাব আমি দিতে পারব না, তবে একথা আজ নিঃসন্দেহে বলতে পারি,—যমুনা আমাকে তার অজান্তে দিয়েছে সেই চেতনা। সে তার কাম্যকে নিবিড় করে পাওয়ার জন্য নিত্যনতুন সাজে, নিত্যনতুন বাক্য বিন্যাসে কবির শিল্পচর্চার রসগ্রাহী হয়ে, তাঁকে মানুষের সামনে তুলে ধরার জন্য প্রয়াস চালিয়ে বিশ্বাসযোগ্যতা করেছে অর্জন। চোখের সামনে তার এই পরিক্রমা আমার স্থবির জীবনকে নতুন চেতনায় উদ্বোধন করেছে।

গ্রাসাচ্ছাদন ও পরিধেয় খুদ-কণা যা পেতাম—তাকেই শ্রেষ্ঠ পাওয়া বলে মেনে নিয়ে নিঃশব্দে এই স্থবিরত্বের অতল গহ্বরে ঢেলে দিতুম। অধিকার, দাবী ইত্যাদি শব্দগুলো উচ্চারণের কল্পনাও করতে পারতুম না।

যমুনার দেওয়া আঘাত, ফাঁসীর দড়ি গলায় পরে যমুনার সঞ্চারণ—জীবনকে আস্বাদনের জন্য আমাকেও প্রলুব্ধ করেছিল। তাকেই কবিগুরু ভাষা দিয়েছিলেন 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে।' এক অমিত শক্তিশালী আত্মপ্রত্যয়ের নিশানা দিয়েছিল ঐ পংক্তিটি।

আমার স্বামী, আমার ঘর, আমার সংসার, আমার-ই সব। এই যে নতুন প্রভাত—এই যে সোনার মতো ঝলমল করা নতুন সূর্যের আলো—এ সব আমার। আমার

অনুগ্রহে থাকতে হবে সবাইকে। স্বামীর স্নেহ-ভালবাসার পরশে আমি আজ হীরের টুকরোর মতো উজ্জ্বল।

চব্বিশের শুরুতে যে নব চেতনার উদ্বোধন হল,—তাকে কাজে লাগাতে তৎপর হয়ে উঠলাম যেমন, তেমনি আমার অধিকার সম্বন্ধে সতর্ক দৃষ্টি—প্রতি মুহূর্তকে পর্যবেক্ষণ করব। যমুনার যে সর্বগ্রাসী ভোগের লালসা তাকে আমি প্রত্যাঘাতে পরাস্ত করেও বিতাড়িত করিনি। কারণ, একাধিক। তার মধ্যে এটাও একটা কারণ যে তার মধ্যে যে-সব ভাল বা মহৎ গুণগুলি আছে তাকে কাজে লাগাব।

একদিন এক ফকির এসেছিল বাড়িতে। কি উৎসবের জন্য সাহায্য চাইছিলেন। সাহায্য নিয়ে চলে যাওয়ার সময় বলেছিলেন—'লাউ কুমড়ো বীজ পুঁতেছ। গাছ উঠেছে মাটি ফুঁড়ে—এখন তাদের লালন করো মা ; লালন করলে তো ফুল আসবে, ফল ফলবে।' তখন আমার মনে হয়েছিল—মানুষের বেলাও তাই। মা বাবা একদিন শিক্ষার বীজ পুঁতেছিলেন—কিন্তু তাকে আমি আর লালন করিনি। যত্ন করিনি। নইলে জীবন আমার ফুলে ফলে পূর্ণ হয়ে উঠতো এতদিনে। ঠাকুমা বলেছিলেন তাই থাক, বাড়িতে পড়াই ভাল, বড় হলে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে লেখাপড়া শিখবে। ইচ্ছে করলে কি এ বাড়িতে লেখাপড়া করতে পারতুম না ? প্রথম প্রথম তো তিনি বলতেনই। সারা দুপুর তো কোন কাজ নেই। লেখাপড়া করার চেষ্টা করলেও দোষ কি ? দোষের না হলেও আমি সে-সব কথায় কান দিইনি।

আজ মনে হচ্ছে ঠাকুমার কথাকে—ফকির আমার চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। তবু আমি বুঝিনি। যমুনা আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে—তৃষ্ণা থাকলে কি হবে, লেখাপড়া জানা না থাকলে জ্ঞানের সমুদ্র স্পর্শ করা বড় কঠিন। ফকির বলেছিলেন, লালন করতে—বাহনি দিতে। বাঁশের মাচার মতো করে তার উপর কঞ্চি বিছিয়ে দিতে।

মানুষের বেলাও কি তাই নয়। শিক্ষা—অর্থাৎ লেখা-পড়া হচ্ছে শিক্ষার বাহন। আমার এই আগ্রহের কথা শুনে স্বামী খুশি হলেন। তিনিই যমুনাকে ভার দিলেন পড়ানোর। ভালই হ'ল। যমুনাও আটকে গেল আমার কাছে। সেই সঙ্গে আমার আর যমুনার সম্পর্কই হয়ে উঠল—সংযম ও সমীহ ভাবের।

দিনরাত কঠোর শ্রমে আমার দেহ ভাঙতে লাগল। আমি তো রামকৃষ্ণ ঠাকুর কিংবা মা সারদার মতো অতিমেধা নিয়ে জন্ম নিইনি। তাই চব্বিশ ঘণ্টা দিন-রাত্রির মাত্র চার ঘণ্টা রাখলুম নিজের ব্যক্তিগত কাজের জন্যে—বাকীটা সবই দিয়েছিলুম পাঠ্যপুস্তকে। যেখানে যমুনা আটকে যেত—তখন সে-ই নিয়ে যেত আমাকে স্বামীর কাছে। তিনি খুশী মনেই পড়াতেন আমাকে।

কী একটা অদৃশ্য শক্তি যেন আমাদের উচ্ছৃঙ্খল সংসারটাকে একটা কঠোর নিয়মের বিধানে বেঁধে ফেলেছিল। প্রচণ্ড আর্থিক অনটনও সে বিধান ভাঙতে পারেনি।

বলতে গেলে সংসারের ষোল আনা কাজই যমুনাকেই করতে হতো। কী এমন একটা ঘটনা ঘটে গিয়েছিল—যার ফলে উচ্ছৃঙ্খল মানুষটাও অনেকখানি নিয়মনীতি মেনে চলতে শুরু করেছিলেন? ভাল ছেলের মতো দুপুরের পরে বেরোন; ফেরেন রাত সাড়ে আটটা-নটায়। বদ্-অভ্যাসের অনেক কিছুই বাতিল হয়ে গেছে। কোথায় একটা পাবলিশার কোম্পানিতে স্কুলের পাঠ্যবই রচনা, মুদ্রণ ও বিক্রী করার দায়িত্বও তাঁর। ফলে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য কিছুটা ফিরে এসেছে। পরস্পরের মধ্যে সন্দেহ অবিশ্বাস যেন চিরতরে দূর হয়ে গেল। একটা খুশী খুশী ভাব আমাদের সবার মধ্যে।

যমুনা দুটো টিউশানি করে। দুটোই বিকেলে। যেত চারটায়, ফিরত সাড়ে সাত-আটটায়। স্বামী এসে তাকে ঘরেই দেখতেন। প্রায় শনিবারেই ফিরত না। বাড়ি চলে যেত; বাপের কাছে। মাঝে মাঝে যেতও না। তার মধ্যেও কোন কোন রবিবারে আমরা সবাই মিলে বেড়াতে যেতুম। কঠোর পরিশ্রমের পর বেশ লাগত। মামণি আমার হাতধরে হাঁটত। এটা কি, ওটা কি হাজার প্রশ্ন করত। যমুনা ও আমার স্বামী দুজনে হাঁটত। বসত। বসলে সবাই গোল হয়ে বসতাম। বাদাম ভাজা খেতাম। কোন দিন লেকের পাড়ে, কোনদিন গঙ্গার ধারে, কোন দিন ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল-এর সামনের মাঠে। ওরা একা বেরুলে লোকনিন্দার হত। স্ত্রী সঙ্গে থাকলে দোষ নেই। আমি তো জানি আমার স্বামীর সঙ্গে যমুনার কি সম্পর্ক। ওরা দুজনে হাঁটত, কথা বলত, হাসত। আমি দোষের মনে করতাম না। বিবাহিতা পুরুষের সঙ্গে একটি অবিবাহিতা মেয়ের এভাবে প্রকাশ্যে মেলামেশা তখনো সমাজের চোখে নির্দোষ নয়। তথাকথিত আমাদের সমাজ এটাকে অবৈধ মনে করলেও আমি করলাম না। বৈধ-অবৈধ সবই মানুষের তৈরী। আমি এখন বুঝেছি, অন্তর যেটাকে সত্যি বলে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায় সেটাই তো সত্যি। একদিন এ-কথাটাকে মেনে নিতে পারিনি বলেই তো নিজেও দগ্ধ হয়েছি, অপরকেও করেছি। অন্তরের পবিত্রতা, ভালোবাসা, কথাগুলোর যে তাৎপর্য আছে তা জেনেও মনে মনে স্বীকার করিনি। ভাবতাম দেহের স্পর্শে এসব একাকার হয়ে যায়। যৌন সম্পর্কই সব। অন্য সব কথার কথা। "কেতকী আমার ঘড়ায় তোলা জল, লাবণ্য আমার মানস সরোবর. তাতে আমার মন সাঁতার কেটে বেড়াবে"—কবিগুরুর এই-সত্যকে মেনে নিতে আমার মন বিদ্রোহ করে উঠত। কিন্তু আজ। নানা বিষয়ের আলোচনা, বই-পত্র পড়ে বুঝেছি যৌন সম্পর্কটা জৈবিক ব্যাপার। এর বিরোধিতা একটা সংস্কার মাত্র।

সেই সংস্কারকে কেউ যদি কুসংস্কার মনে করেন, করতে পারেন। আমি যুক্তি দিয়ে বুঝেছি—যমুনার সঙ্গে তাঁর যদি কোন দিন দৈহিক সম্পর্ক ঘটেও থাকে, তা হলেও তিনি আমাকে ভালোবাসেন। যমুনাকেও ভালোবাসেন। আগে তো অনেকে একাধিক বিয়ে করতেন। তাঁরা কি তাঁদের স্ত্রীদের ভালবাসতেন না? কিংবা স্ত্রী স্বামীকে? নাকি চার পাঁচটি ছেলে-মেয়েকে ভালোবাসেন না? আসলে ভালবাসার রকমফের আছে। ভালবাসার সঙ্গে যৌন সম্পর্কের কোন সম্পর্ক নেই—এটা একটা জৈবিক ক্রিয়া।

এটা না হলে চলে না—এমন নয়। এই যে আমি বিয়ের আট বছরে একবার সেই সুযোগ এসেছিল। সেই স্মৃতি রোমন্থন করে তো বেঁচে আছি। যা না পেয়ে আমার হৃদয় মরুভূমি হয়ে গিয়েছিল—তা স্বামীর স্নেহ ভালোবাসা, স্ত্রী হিসেবে মর্যাদা। আত্মীয়-স্বজনের কাছে সুগৃহিণীর স্বীকৃতি। স্বামীর অবহেলায় তা কখনো সম্ভব নয়। ভালোবাসা নেই, মায়া-মমতা নেই, দায়-দায়িত্ব নেই অথচ পশুর মতো রতিক্রিয়া—যন্ত্রণা—এটাকে মানুষের কাঙ্ক্ষিত বলে মনে করাটাই ভুল। জ্ঞান এই ভুলটা ধরিয়ে দেয়।

কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে তো ব্যাখ্যা করলাম—যৌন সম্পর্কের সঙ্গে প্রেম ভালোবাসার কোন সম্পর্ক নেই—তবে আমার ভালবাসার মানুষটাকে নিয়ে আমার সামনেই যদি আর কেউ দৈহিক সম্পর্কের ক্রিয়াদি সম্পন্ন করে, তাতে আমার মধ্যে ঈর্ষা জাগে কেন? যদি এটাও জৈবিক কারণে ঘটে, অথবা সংস্কার—তবে সেই সংস্কার আমারও আছে। বোধ হয় কবিগুরুও সেই সংস্কার থেকে মুক্ত নন। এ প্রসঙ্গে আমি বলব এই সংস্কারই শিল্প-সাহিত্যের মূলধন।

আমার ক্ষুদ্র মনে সেই সংস্কার মাঝে মাঝে উঁকিঝুঁকি মারতে চায়। ওদের অবাধ মেলামেশা করতে দিয়েছি—কিন্তু আগের মতো অন্ধকারে নয়। আমার সতর্ক দৃষ্টির মধ্যেই ওরা ঘোরাফেরা করুক।

একদিন যমুনা তার ভালোবাসার অহংকার নিয়ে আমাকে বলেছিল তুমি ভালো-বাসতে পারনি—বিয়ে করেছ। আমি বিয়ে করিনি, ভালোবেসেছি। ভালবাসা দিয়েছি; পেয়েছিও। তার প্রমাণ—তার বাকী কথাগুলো বলতে দিইনি। সেদিন তার ভালবাসার উৎকট অহংকারকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে ঘৃণা করেছিলাম। রাগ করে শুধু বলেছিলাম মা-বাবার কাছে এই শিক্ষা পাইনি বলেই স্বামীর মতো রত্নে ভাগ দিতে কুণ্ঠা করিনি; জবাব শুনে যমুনা চুপসে গিয়েছিল।

সে সব পুরোনো কথা। তবু আমার কৌতূহলী মন যমুনার নিখাদ ভালো-বাসাকে যেন আরো যাচাই করতে চায়।

একদিন যমুনা ছাত্র পড়িয়ে ফিরতে দেরী করেছিল। স্বামী বাড়ি এসে তাকে না দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে আমাকে বললেন 'ও কি কিছু বলে গেছে?' মাথা নেড়ে জানালুম—না। উনি আর কিছু বলেননি। কিন্তু বুঝতে পারছিলাম তিনি ওর জন্য যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। আমিও উদ্বেগ বোধ করছিলুম।

যমুনা এলো সাড়ে নটায়। হাতমুখ ধুয়ে রান্নাঘরে গিয়ে কাজে হাত দিল। আমি ও মামণি নিজ নিজ পড়া নিয়ে ব্যস্ত। খাওয়া-দাওয়ার পর তিনি ওকে আমার সামনেই সতর্ক করে দিয়ে বললেন—টিউশানি কর, চাকরি কর, যা কিছু কর না কেন—আটটার মধ্যে বাড়ি ফিরতে হবে। তাঁর গম্ভীর স্বরের কথাকটি আদেশের মতো শোনাল। আমার মনে আছে সে রাত্রে তিনি আর যমুনাকে কোন কথাই বলেননি। তাতেই বুঝলাম তিনি খুব ক্ষুব্ধ।

এরপর যমুনা বেশ কদিন ঠিকমতোই আসাযাওয়া করছিল। কিন্তু পরের সপ্তাহে শনিবারে বাড়ি না গিয়ে, গেল রবিবার বিকেলে এবং ফিরল সোমবার বিকেলে। সেদিনই সে একটা অঘটন ঘটাল। ঘরে ঢুকেই অন্যদিনের মতো তাড়াতাড়ি কাপড়-জামা ছেড়ে বাথরুমে চলে গেল। আমি ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মিতব্যয় পড়ছিলাম। অকস্মাৎ তার ছাড়া কাপড়ের দিকে নজর পড়ল ? আমার নজর অর্থহীন নজর। —আসলে ওকে বলতে চাইছিলাম, সকালে এলে না কেন। কিন্তু সে এত ব্যস্ত ছিল যে বলার সুযোগ পেলাম না। হঠাৎই কী একটা ভাঁজ করা কাগজ পড়ে আছে দেখলাম। কৌতুক বোধ করলাম—একটু আগেই তো ঝাঁট দিয়েছি সারাঘরে। ওটা এলো কোথা থেকে ? যেন নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই উঠে গেলুম। পরক্ষণেই মনে হয়েছিল—এটা সন্দেহবাতিক মনের স্বভাব। তবুও ভাঁজ করা কাগজটুকু তুলে নিলাম। মনে মনে ভাবছিলাম এখনো চিঠি চালাচালি। বাড়িতে পড়তে অসুবিধে বলে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। দই দেখলেই চুনের কথা মনে পড়ার মতো আর কি। খুলে দেখি– হ্যাঁ এখানি চিঠিই, তবে সেটা আমার স্বামীর দেওয়া নয়—যমুনার বোধ হয় এক নং প্রেমিকের চিঠি। তাড়াতাড়ি লুকিয়ে ফেলে যথারীতি পড়ায় মন দিলাম। কারণ ও যেন বুঝতে না পারে আমি পড়া ছেড়ে উঠেছি। যমুনা তোয়ালেতে হাত মুখ মুছতে মুছতে বললে 'চারটে বেজে গেল—মামণি এখনো এল না কেন ?'

কপট উদাসীনভাবে জবাব দিলাম—'কী জানি !' অর্থাৎ চাইছি যমুনা চলে যাক, তাহ'লে চিঠিখানি পড়তে পারি। যমুনা আমাকে মেয়ে সম্বন্ধে উদাসীন হওয়ায় দু'কথা বেশ শুনিয়ে দিয়ে বললে—'বাঃ, বেশ মানুষ। মেয়ে কেন এখনো ফিরল না—তার জন্য একটু চিন্তাও নেই। ধন্য মা তুমি।' বলে—আবার গায়ে আরেকটি শাড়ি পেঁচিয়ে দ্রুত বের হয়ে গেল—যেন মেয়েটা ওরই, যত মাথাব্যথা তারই। আসলে যে মামণিদের ইস্কুলে বাৎসরিক স্পোর্টস্ হবে সেকথা যমুনার বোধ হয় মনেই ছিল না। আমি সুযোগ পেয়ে রুদ্ধনিঃশ্বাসে শ্যামের চিঠিখানি পড়লুম। চিঠিখানিতে প্রথমে 'প্রিয়তমাসু' লেখা হয়েছিল। পরে সেটা কেটে 'কল্যাণীয়া' লেখা হয়েছে। তারপর ডট্ ডট্ দিয়ে শুরু।…"পর পর তোমার দু'খানি চিঠিই পেয়েছি। বর্তমানে আমার আর কিছু করার নেই। তুমি যে কেলেঙ্কারী করে গিয়েছ,—তা কোন বিবাহিত স্ত্রী-ও করে না। সে করলে লোকে বলত উটকো ঝামেলা হটানোর জন্যে করতে বাধ্য হয়েছে। তোমার জন্যে আজও আমি মুখ দেখাতে পারি না। আজ দেড় বছর বাদেও স্ত্রী সেই খোঁটা দিতে ছাড়ে না।…আর আজ তুমি সহায় সম্বল-হীনাও নয়। শুনেছি যেখানে আছ সেখানে একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা নাকি করেছ। তা' ভালই করেছ। তবে তোমার পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রীর যে টাকা ব্যবসায়ে দেবে মনে করেছ—তা জলে দেওয়া হবে। কারণ—আমি শুনেছি ও লোক সুবিধের না। নিজের পৈতৃক সম্পত্তি মদ খেয়ে উড়িয়ে দিয়েছে। অবশ্য বলতে পারি তোমার বাবা বিয়ের সময় ওই সম্পত্তি বরকে যৌতুক হিসেবে দিতেন। তখন নষ্ট করলে কেউ তোমাকে

কিছু বলত না। দ্যাখ, উপযুক্ত পাত্র হলে সমস্তই রক্ষা পায়—নইলে অপাত্রেরা দুধ বিক্রী করে মদ খায়। যা-হোক এসব আমার শোনা কথা। আর এসব তোমার কোন মেয়েবন্ধুর কাছেই শুনেছি।…তুমি প্রায় দু'মাস আমার কাছে ছিলে—তার সব কটি রাত্রিই সুখে কাটিয়েছ। স্ত্রী হাসপাতাল থেকে ফিরলে তার সঙ্গে যদি ঐরূপ ভাগাভাগির ব্যাপারে ঝগড়া না করতে তা হ'লে বোধ হয় কোন অশান্তি হত না। তোমাকে তো আমি স্ত্রী-র মর্যাদায়ই রেখেছিলাম। রেজেস্টারী বিয়ের ব্যাপারে মালার সম্মতি তো পেয়েছিলামই। তুমি অপেক্ষা করতে পারলে না।

জলের রং দেখে সে বুঝেছিল তুমি বিষ মিশিয়ে দিয়েছ। কিন্তু বিষের শিশিটা তোমার ব্যাগে না পেলে ওর কথা কি কেউ বিশ্বাস করত? যাক্, সবই ভগবানের ইচ্ছা। তিনি যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন।

তিনি তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করেছেন ও করবেন।…তবে হ্যাঁ আজও আমি তোমাকে ভালবাসি। কিন্তু সে কথা প্রকাশ্যে বলতে পারব না। সে মুখ আমার নাই…তুমি যা চেয়েছ তা' বর্তমানে দিতে পারব না। কারণ আজ মাস তিনেক হল কারখানা লক-আউট। কবে খুলবে—খুলবে কি না জানি না। মন খুব খারাপ। বাড়িতে অসুখ-বিসুখ লেগেই আছে। সামান্য জমির উপর নির্ভর করে সংসার চলে না। তোমাকে কথা দিয়েছিলুম কোনদিন বিমুখ করব না, সে কথা আমি ভুলিনি। ··আগামী শনিবার দুটোর সময় কলকাতায় পূরবী সিনেমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে। তখন সাধ্যমত কিছু দেব—আমার শরীর একপ্রকার। ইতি—তোমার শ্যাম।"

চিঠি পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার বুকের ভেতর একটা কাঁপন এসে গিয়েছিল। পড়ার শেষে কাঁপনটা অনুভূত হল না। আমি পাথরে পরিণত হয়ে গেলাম। হয়ত পিঠে একটা মশা রক্ত খেয়ে আমার অচেতনতায় মোটা হয়ে গেছিল। আমি ওকে নির্বাক হয়ে দেখছি—মারতে বা তাড়াতে পারছি না। হঠাৎ মনের সিদ্ধান্তটা যেন মুখ দিয়ে বের হয়ে এল—'কী সাংঘাতিক মেয়ে ও!' পরক্ষণে একথাও মনে উঁকি দিয়েছিল—চিঠিটা কি ওকেই উদ্দেশ করে লেখা। যমুনা কি এতখানি নীচ। যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। একটু বাদে সম্বিত ফিরে এল। ভাবলাম,—এখনই যমুনা সম্বন্ধে সাবধান হওয়া উচিত—নইলে অঘটন ঘটলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। আমার যেন সমস্ত-বিশ্বাস আবার চূর্ণ হয়ে গেল। চিঠিখানি আমার স্বামীর হাতে পড়লে—কি ঘটতে পারে তা যেন আমি কল্পনায় দেখতে পেয়ে শিউরে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার একথাও মনে হল—প্রবেশিকা দেওয়া আর হয়ে উঠবে না। আমাদের পারিবারিক জীবনটায় একটা উলটপালট ঘটে যাবে। আমি ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারছিলাম না। হঠাৎ মনে হল যমুনা এক্ষুণি এসে যাবে। পেছনের জানালার পাট খুলে দেখলাম—হাঁ যমুনা ছুটে আসছে। মেয়ে তো সঙ্গে থাকবে না জানা কথাই। তাড়াতাড়ি চিঠিখানি লুকিয়ে ফেললাম "ব্যাকরণ কৌমুদী"র ভেতর। তারপর যেমন পড়া মুখস্থ করছিলাম—তেমনি করতে লাগলাম।

ঝড়ের মতো যমুনা ঘরে ঢুকল—প্রথমেই জড় করা ছাড়া জামাকাপড়গুলো ঝেড়ে দেখল। আমি যেন কিছু বুঝিনি এমন ভান করে বললাম—'কি হল মামণি এল না?' যমুনা আমার কথা শুনতে পায়নি। দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করায় তার হারানো মানিক খুঁজতে খুঁজতেই বললে—'না ওদের আজ স্পোর্ট হচ্ছে। সাড়ে পাঁচটায় শেষ হবে।' যমুনা টেবিলের তলায় দেখল, চেয়ার সরিয়ে দেখল, খাটের নিচে দেখল—ওর খোঁজা-খুজি দেখে বলতে হয় মনে করে বললাম—'কিছু হারিয়েছ? কি খুঁজছ?' সে এবার আমার দিকে মুখ তুলে চেয়ে বলল—'হ্যাঁ। একটা দু'টাকার নোট। বাসে আসার সময় কণ্ডাকটার দিয়েছিল—ব্যাটা নিলে না—বললে খুচরো দিন দিদি। কি করব শেষে হাতের কুড়িটা পয়সাই দিলুম। টাকাটা ব্লাউজের ভেতর রেখেছিলাম।' আমি তাকে বুদ্ধি দিয়ে বললাম—'কোনও ব্যাগে রাখলে না কেন?'

—'যা পকেট কাটার দল! ব্যাগ তাদের সামনে খুলি আর কি? তোমার যেমন বুদ্ধি!' বলে সারাঘর খুঁজতে লাগল। শেষে বাথরুম, রান্নাঘর, উঠোন, ডালিম-তলা, পাতকুয়োর চাতাল কোথাও বাদ দিল না। শেষে হতাশ হয়ে বললে—'দু' দুটো টাকা কি কম?' তার টাকা হারানোয় আমি যেন দুঃখিত হয়ে গেলাম। 'কি আর করবে। ব্যাগে রাখনি তো?' ব্যাগটা এসে দশবার খুঁজেছে। তারপর টেবিলে রেখেছিল। আমার কথায় রাগ করে ব্যাগটা আমার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে—'দ্যাখো না। আমি তো দেখেছি। ব্যাগের ভেতর যাবে কেন। ব্যাগে তো রাখিনি। আর তাছাড়া বাস থেকে নেমেও আমি বডিসের নিচে যে আছে—তা' হাত দিয়েও দেখেছি।' সান্ত্বনা দিয়ে বললাম—'আসার সময় কোথাও উপুড় হওনি তো!' যমুনা একটু দাঁড়াল, ভাবল—'হ্যাঁ ঝুমোদের বাড়ির পাশে কুলকাঁটা ফেলে রেখেছিল'—বলেই সে দৌড়ল! ঝুমোদের বাড়ির পাশে পথে খুঁজতে।

আমি সুযোগ পেলাম—তাড়াতাড়ি বইয়ের পাতার ভেতর থেকে চিঠিটা বের করে আলমারির নিজের ড্রয়ারে রেখে চাবি দিয়ে রাখলুম। কী জানি—ও যদি আমাকেই সন্দেহ করে। আমি পেয়েছি বলে যদি আমার আড়ালে বইখাতা ঘাঁটাঘাটি করে? সাবধানের মার নেই।

চিঠিখানি স্বামীর হাতে এখনই দেব কি না—এটা একটা ভাবনার বিষয়—কিন্তু তার আগে সে পড়েছে কি না সেটা জানা দরকার। পরদিন ইচ্ছে করেই তার সামনে বাংলা ক্যালেন্ডার দেখছিলুম—স্বগতভাবে অথচ যমুনাকে শুনিয়ে বললাম—'শনিবারই তিথি পড়েছে—।'

—'কি পড়েছে দিদি'—যমুনা প্রশ্ন করে।

বললাম—'মা-মণির জন্মতিথি দেখছিলুম—কোন্‌দিন পড়েছে। এই শনিবারে তুমি বাড়ি যাবে না।'

যমুনার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তবুও বললে—'কতক্ষণ থেকে কতক্ষণ তিথি?'

শুক্রবার রাত ৮টা ২৩ মিনিট থেকে চতুর্দশী লাগছে—শনিবার রাত ৯টা ২ মিনিট পর্যন্ত। ও তো চতুর্দশীতেই হয়েছে।

যমুনা বললে—'জন্মতিথি কেন? জন্মদিন তো? রাত বারটার পর হলেই পরের দিন রবিবার হতে পারে। মাস্টারমশাইও বাড়ি থাকবেন। আমিও।'

'—তুমিও মানে?' ইচ্ছে করেই তীক্ষ্ণস্বরে প্রশ্ন করলাম।

—'বম্বে থেকে ছোটমামা এসেছেন—শনিবার বিকেলে যাবেন আমাদের বাড়িতে আবার রবিবার ভোরেই চলে যাবেন বহরমপুরে।' যমুনা অক্লেশে বানিয়ে বানিয়ে বলল মিথ্যে কথাগুলো। আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। সে চিঠিখানি পড়েছে। তবুও বললাম—তা কি আছে। তুমি পরে বহরমপুর গিয়েই না হয় দেখা করবে মামার সঙ্গে।' সে সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিবাদ জানিয়ে বললে—'না না তা কি সম্ভব? বহরমপুর কি কাছে? তাছাড়া ওখান থেকে যদি অন্য কোথাও চলে যায় তা'হলে আমার টাকা পাওয়া আর হবে না।'

দেখলাম—এখন যা বলবে, তার সবটাই সে মিথ্যে কথা বলবে। তাই ইতি টানার জন্যে বললাম—'তা তোমার মাস্টারমশাই কি জানেন? তাঁকে বলেছ?'

—'না। ওঁকে যাবার দিন বললেই হবে।' নিশ্চিন্ত হয়ে জবাব দিয়েছিল যমুনা। কতখানি অধিকার কতখানি দখল থাকলে ও-কথা বলতে পারা যায়। এখানেই বোঝা যায় কতখানি বিশ্বাস আদায় করে নিয়েছে সে। সে যে মাঝে মাঝে টিউশানি করে ৯টার পরেও বাড়ি ফিরত—তখনই বোধ হয় তার এক নম্বর প্রেমিকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে ফিরত। অবশ্যই এসব আমার অনুমান। অনুমানের উপর নির্ভর করে কোন মন্তব্য না করাই ভালো। শুধু বললাম—'তুমি চলে গেলে আমার খুব অসুবিধে হবে আর কি? একা সব সামাল দিতে পারব কেন?'

– 'কেন কি করতে চাও সেদিন?' সে আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করে।

—'ভেবেছি ওর বয়সী পাড়ার ছেলেমেয়েদের একটু পায়েস আর লুচি করে দেব। আর একটা কি দুটো করে মিষ্টি।'

—'এত সব না করে দুটো করে মিষ্টি দিলেই ল্যাঠা চুকে যায়।' আমার শ্রম লাঘব ও ওর না থাকার অসুবিধের জন্য উপদেশ দেয় সে।

মা-মণির জন্মতিথি উদ্‌যাপনের কথা পরদিন স্বামীকে বলে দিলুম। কি কি করব, তাও বললুম। শুনে তিনি খুশী হয়ে বললেন—'এসব করতে টাকা পাবে কোথায়?' আমি হাসতে হাসতে বললাম—'কেন তুমি দেবে?'

—'কতটাকা খরচ করচো?'

—'হিসেব করিনি। যা তুমি পার দিও। বাকীটা লক্ষ্মীকান্ত দেবে।' তিনি নিঃশব্দে হাসলেন। পরে 'বেশ বেশ' বলে নিজের সন্তোষ জানালেন। যমুনা সেদিন থাকবে না চলে যাবে আমি কিছুই ওঁকে বলিনি।

শনিবার সকাল থেকেই আমার ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেল।

যমুনাও হাত লাগাল। ফুল-চন্দন-দূর্বা, কাজল মালা কাঁচা হলুদ, নতুন বাহারী জামা-প্যাণ্ট, রুপোর মল। বাটায় সব সাজিয়ে চান করতে চলে গেল যমুনা। ওর চান করতে একটু সময় লাগে। সেই ফাঁকে বুকের যন্ত্রণা হালকা করতে গেলুম ও-ঘরে স্বামীর কাছে। তিনি খাতায় একটা কবিতা লিখছিলেন তা কেটে ঠিক করলেন। আমি তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে দেখছিলুম নিঃশব্দে। তারপর ওই কবিতা আবৃত্তি করছিলেন ঃ "তুমি যেন কোন্ তন্দ্রাহীন নয়নাভাষ

জীবনের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে মোর—

ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত ; যেন স্থির কম্পাস ॥

তবুও অবিরাম চলেছ বুকে রেখে

আমার উদ্দাম স্রোতধারা

অবক্ষয়ের সীমানা পেরিয়ে

আকাশ-সিঁড়ি ডিঙিয়ে উচ্চ কণ্ঠে ডেকে

মরমের মাঝে খোঁজো ভাষা—,

হতাশার মাঝে ধ্বনিয়া তোল—

নবজীবনের আশা,

প্রেয়সী আমার ॥

কোন মৌল গোধূলি যদি ওঠে আরক্ত হয়ে—

যদি থামে কিছু চিহ্ন তার—

এস তবে বাহিরে প্রেয়সী আমার।

ঐ মুখ, সবুজ প্রান্তর বিদেহী আত্মার—

অশ্রু ঘামে ভিজে যার ভূমি

কঠোর শ্রমে ধূসর দগ্ধ—

তারে কি দেবে তুমি বাসর আলিঙ্গন ?

হে প্রাণপ্রিয়া—কবিতা আমার—।

তোমার ক্লান্ত চরণে মাত্রাহীন ধ্বনি—

ছন্দহীন ছন্দ। শ্লথ কবরী ও অঞ্চল—

অজানা ফুলের গন্ধ, তবুও তুমি নয়নে আমার

কে বলিবে—কেন তুমি চির আকর্ষণ।"

আবৃত্তি করার সময়ই আস্তে আস্তে সমুখে গিয়ে দেখি তিনি চোখ বুঁজে আবৃত্তি করছেন। শেষ হলে চোখ খুলে আমার দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলেন। আমার মনে হয়েছিল তার সেই চাওয়া চোখে উদ্বেগ নেই, উদ্দেশ্য নেই, আগ্রহ নেই, যেন কোন অর্থও নেই—শুধু বিস্ময়। আমি তাঁর এমন আশ্চর্য সুন্দর চোখ আগে দেখিনি। সেদিন আমার মনে হল আমার স্বামী সত্যি সত্যিই একজন কবি। . কিন্তু কবিকে যে

আমার বাস্তব জগতে টেনে আনতে হবে। ইতস্তত করছিলাম। তিনি বোধহয় বুঝেছেন—আমি কিছু বলতে এসেছি। তাঁর বুক থেকে একটি নিঃশ্বাস নামল—বললেন—'কিছু বলবে?' সাহস পেলাম। বললাম—'কোনদিন তোমার কাছে কোন আব্দার করিনি আজ করব—বল রাখবে?'

তিনি খানিক চুপ করে থেকে ঠোঁটের কোণে একটু হাসি টেনে অভয় দিয়ে বললেন—'বল কি বলবে?'

শ্যামের চিঠিখানি তাঁর হাতে দিয়ে বললুম—'এটা পড়ে আমাকে ফেরৎ দেবে। আর এই চিঠির কথা কাউকে বলবে না।'

—'এটাই তোমার আব্দার? কে দিয়েছে? কোথায় পেলে?'

মাথা কাত করে জানালুম—'হ্যাঁ।' মুখে বললুম—'সে কথা পরে বলব।'

'আচ্ছা' বলে তিনি চিঠি পড়তে শুরু করলেন—আমি মুখের পানে তাকিয়ে রইলাম প্রতিক্রিয়া বুঝতে। এমন চিঠিতে কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে তার একটা অনুমান সকলেরই থাকে,—আমারও ছিল। কিন্তু সে অনুমানের সঙ্গে পুরোপুরি মেলেনি। পড়া শেষ হলে ক্ষণেক নিঃস্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। পরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে জিজ্ঞাসা করলেন—'কোথায় পেলে?'

যমুনা আসার সময় হয়েছে মনে করে উঁকি মেরে বাইরে দেখে নিয়ে 'সেকথা পরে বলব' বলে চিঠি না নিয়েই দ্রুত চলে এলুম।

অন্যদিনের চেয়ে ছাত্রী পড়ানোর অছিলায় একটু আগেই যমুনা প্রসাধনী নিয়ে বসে বললে—'মাস্টারমশাই আজ বেরুবে না? শরীর খারাপ নাকি!'

—'জানি না তো! কই কিছু বলেননি তো আমাকে!' বলে নিজের কাজে মন দিলুম। যমুনা সেজেগুজে ও-ঘরে গিয়ে কি বললে জানি না। কিন্তু তার মাস্টার মশায়ের গলা স্পষ্টই শুনতে পেলাম—'না না আজ আর বেরুব না—দেহটা ঠিক ভাল নেই। তাড়াতাড়ি ফিরে এস।' তাঁর কথা শুনে পেটের ভেতরটা শুদ্ধ মোচর দিয়ে উঠল—এখনো যমুনার প্রতি অগাধ বিশ্বাস? চিঠিটা কোন কাজেই এলো না? মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল। যমুনার বশীকরণের ক্ষমতা দেখে বিস্মিত ও আতঙ্কিত হয়ে গেলাম। একেবারে সাক্ষাৎ কালনাগিনী। ওঃ, কি ভুল করেছি! কিন্তু যমুনা চলে যাবার কিছুক্ষণ বাদে তিনিও ধড়াচুড়া পরে বের হয়ে গেলেন। আমি দ্বার পর্যন্ত এগিয়ে গেলাম কিন্তু কিছুই বলতে পারলাম না। আমার সুন্দর মনটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে লাগল। সন্ধে হয় হয় সময়েই তিনি বাড়ি ফিরলেন। খুব স্বাভাবিকভাবে আমন্ত্রিত বাচ্চাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন দেখে—বুঝলাম কিছুই হয়নি। কাজেই সে প্রসঙ্গ না তুলে স্বামী-স্ত্রীতে মিলে বাচ্চাদের পায়েস ও মিষ্টি খাইয়ে মা-মণির জন্মদিন পালন করলাম।

আমার সৌভাগ্য যে পরদিন তিনটেয় স্বামীকে চা দিতে গেলে বললেন—'চল

একটু ঘুরে আসি।' কোথা ঘুরতে যাব একথা জিজ্ঞেস করলাম না। শুধু অবিশ্বাস্য চোখে স্বামীর মুখের পানে তাকিয়ে রইলাম। এমনটাও আবার হয় নাকি।

—'কী হল দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যাও, তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও। মা-মণির একটা গরম জামা সঙ্গে নিও। সন্ধে হয়ে গেলে ঠাণ্ডা লাগতে পারে।'

মনটা আনন্দে দুলতে লাগল—আবার শঙ্কাও হল। অনেকটা পুরুষদের খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি গালে লাগলে যেমন হয়, এই আনন্দ সংবাদে তেমনই বোধ হয়েছিল।

বেলুর মঠে গঙ্গার ধারে সিঁড়িতে পা দুলিয়ে দুজনেই বসলাম। মা-মণি মুক্ত হাওয়ায় প্রজাপতির মতো সম-সঙ্গীদের সঙ্গে নাচতে লাগল। এমনভাবে প্রকাশ্য জায়গায় স্বামীর পাশে বসা আমার পক্ষে যে কী সৌভাগ্য—তা আমার ভগবান ছাড়া কেউ বুঝবে না। আমার মনে হয়েছিল—আমার জীবনে যত দুঃখ, যত কষ্ট, যত তাচ্ছিল্যই পেয়ে থাকি না কেন আজকের গৌরবে সবই ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।

এত বড় একটা গৌরবের আনন্দ পেয়েও আমাকে একটা 'সহজাত আড়ষ্ট ভাব' পেয়ে বসেছিল। কোনও কথা বলতে পারছিলুম না। সামনে বিস্তীর্ণ গঙ্গায় কোথাও নৌকা, কোথাও ছোট ছোট যন্ত্রচালিত জলযান হাঁসের মতো বুকে ঢেউ ভেঙে ঢেউ তুলে এদিক ওদিক চলে যাচ্ছিল। ও পাড়ে সবুজ বুক চিরে মাঝে মাঝে নগর উপনগরীর বাড়ি-ঘর শান বাঁধানো ঘাটের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। আমি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে ছিলুম।

প্রথম তিনিই কথা বললেন—'সত্যি বেশ লাগে না?' হ্যাঁ না কিছু বলতে পারলাম না। গঙ্গার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে রইলুম। বাতাসে তাঁর অবিন্যস্ত চুলগুলি গৌরবর্ণের প্রশস্ত ললাটের এপাশ-ওপাশ আছড়ে পড়ছিল। ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল তাঁর মায়াভরা চোখ দুটি। দূরে—অনেক দূরে প্রশস্ত দৃষ্টিতে তিনি চেয়ে আছেন। যেন কোন সুদূর অতীতের মুখস্মৃতি রোমন্থন করে চলেছেন। ঠিক সেই মুহূর্তে আমার মনে হয়েছিল এই পুরুষ সব নারীর সব কালের আকর্ষণ। কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললাম—'কী ভাবছ?' তিনি যেন চকিতে নিজেকে সামলে নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—'ভাবছি, যমুনা ও তার দ্বিতীয় স্বামীর কথা।'

আমি অবাক হয়ে বললাম—'মানে।'

—'তুমি যে চিঠিখানি দেখালে, সেটা তার দ্বিতীয় স্বামীর।' আমি আরো বিস্ময় প্রকাশ করে বললাম—'তার মানে আরো একজন ছিলেন!' তিনি অল্প হেসে বললেন—'ছিলেন না, এখনো আছেন।' খুব সহজভাবে বললেন তিনি।

—'ওমা, বিয়ে না করেই স্বামী করা যায় নাকি?' ছেলেমানুষের মতো প্রশ্ন করলাম। তিনি মৃদু হেসে পুনরায় বললেন—'যায়। পুরাণের গল্পকথা শোননি। সতী সাবিত্রী দময়ন্তী—এঁরা সবাই মনে মনে পতিত্বে বরণ করে নিয়েছিলেন—পরে

বিয়ে করেছিলেন। আসলে বিয়েটা তো একটা লৌকিক আচার। মনের দিক থেকে যাকে স্বামী ভাবা যায় সেই তো স্বামী।' তাঁর কথা শুনে হাসতে পারলুম না। বিয়ে না করেও স্বামী-করা বা বলা যায়—এ আবার কেমন কথা। ইচ্ছে হচ্ছিল বলি—তা'হলে তুমি যমুনার তৃতীয় স্বামী! কিন্তু বললাম না। একটু চুপ করে থেকে বললুম—'মন তো একটা। ওটা ক'টা মানুষকে ভাগ করে দেওয়া যায়? আমার কথা শুনে বোধ হয় কৌতুক বোধ করেছিলেন, চোখে হেসে বললেন—'ভাগ করতে হবে কেন, মনের চলাচল করতে তো আর ট্রাম বাসের ভাড়া দিতে হয় না। ওটার সর্বত্রই অবাধ গতি। যখন যেখানে খুশী প্রয়োজন হলেই যাওয়া চলে। পুরাণের খণ্ড রাজকন্যা শুশোভনার কথা শোনান?'

—'শুনেছি—ওটা অবাস্তব কল্পনা।'

'—কিন্তু যমুনা বাস্তব।' বলে আমার স্বামী কয়েক পলক আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন—আমি জবাবে কি বলি? বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল—সে ব্যভিচারিণী। কিন্তু বললুম না। শুধু একটা 'হুঁ' বলে হাতের চেটোতে থুতনি রেখে নিঃশব্দ হয়ে রইলুম। দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ। যেন কোথায় একটা জটিল সমস্যা দুজনেই মনে মনে সমাধান করতে চাইছিলুম।

মেয়েটা সবুজ ঘাসের উপর আরো পাঁচটা বাচ্চার সঙ্গে দৌড়ঝাঁপ করছে। এদের এই সুন্দর জীবন—হয়তো একদিন কীটের দংশনে কী ভয়ানক কুৎসিত হয়ে যেতে পারে—একথা আজ কেউ বলতে পারবে না।

কখন গঙ্গার দিক থেকে মঠের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসেছিলুম মনে নাই। একসময় নিজের অজ্ঞাতেই চোখ দুটো ধীরে ধীরে অদূরে সন্ন্যাসীর মতো সৌম্য শান্ত সুন্দর পবিত্র মন্দিরখানির দেওয়ালে গিয়ে দৃষ্টি নিশ্চল হয়ে গিয়েছিল টের পাইনি। মনে হল এই মন্দির কোন এক উদার হৃদয়ের প্রতীক। এখানে কোন লোভ, দ্বেষ, স্বার্থ ও অহংকারের উগ্রতার কোন চাঞ্চল্য নেই। শুধু ত্যাগ নির্লোভ হয়ে অন্তর বাহিরে বিমূর্ত হয়ে আছে। এই মন্দিরের প্রভাব শিশু বৃদ্ধ যুবা সবাইকে তো আকর্ষণ করবে। যমুনার মুখে শুনেছি—ও নাকি এখানে প্রায়ই আসত। আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম—ও কী করে এই পবিত্রতার আকর্ষণ থেকে নিজেকে দূরে রেখেছিল? পরক্ষণে মনে হয়েছিল ও পারে। সব পারে ও। ভোগের লালসায় সে অন্ধ। মন্দিরের পবিত্র রূপ তার চোখে পড়ার কথা নয়।

—'কী ভাবছো!' হঠাৎ স্বামীর প্রশ্নে চমকে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারিনি। পরে বললুম,—'কিছু না।'

তিনি বিশ্বাস করলেন না। বললেন,—'আমি জানি। তুমি ঐ মন্দিরের অভ্যন্তরের পবিত্রতা আর যমুনার অন্তরের কদর্যতাকে বিচার করছিলে।' আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম—কী করে তিনি বুঝলেন একথা! চোখে মুখে হাসি টেনে বললাম—'ঠিক তাই। কিন্তু কী করে বুঝলে একথাই ভাবছি?' কী করে বুঝলেন

একথা বলেননি তিনি? বললেন—'যমুনা ভুল করেনি। আমিও না। সংসারে সকলেই এক দৃষ্টিকোণ থেকে সত্যকে উপলব্ধি করে না। সকলেই বৈচিত্র্যময় জীবনের সন্ধানে মগ্ন হয়ে থাকে না। সকলেই বহুর মধ্যে একককে কিংবা একের মধ্যে বহুকে উপলব্ধি করে না। কিন্তু তাই বলে—এ কথাই সত্য, একথাও নির্বিবাদে মেনে নেওয়া যায় না। বস্তুতপক্ষে এটাই দ্বন্দ্বের মূল। কথা কটি বলে তিনি এক মুহূর্ত আমার পানে চেয়ে থেকে আবার বলতে লাগলেন—'সংসারে কিছুই অমিশ্র নয়। সবই মিশ্র। এই মিশ্র সময় ও বস্তু যুগমানসেও প্রতিক্রিয়া ঘটায়; তাই উপলব্ধি সকলের একই রকম হয়ে ওঠে না। বাইরে থেকে মনে হয় সবই বুঝি বিচ্ছিন্ন—পৃথক। কিন্তু সত্যি তাই নয়। মাটি-মানুষ পশু পাখি কীট-পতঙ্গ জল-বাতাস-আকাশ সবই এক অবিচ্ছিন্ন শক্তিতরঙ্গে পরিচালিত। যে শক্তিতরঙ্গ সৃষ্টি করে ইচ্ছাশক্তি, সে শক্তি তরঙ্গও কিন্তু আবর্তিত হতে থাকে কোটি কোটি শক্তিতরঙ্গ দ্বারা। সে এক জটিল ব্যাপার। কেউ বিচ্ছিন্ন নয়, কেউ অবিচ্ছন্ন নয়। পৃথিবীর পৃষ্ঠে বাস করি বলে পূর্ব-পশ্চিম বুঝি। এটা সত্য। কিন্তু মহাকাশে উঠলে বা বাস করলে—পূর্বও নেই পশ্চিমও নেই। আসলে আমরা নিজেদের সুবিধার জন্য সব কিছুকে খণ্ড খণ্ড করে দেখি।'

তিনি একটু চুপ করে থেকে পুনরায় বললেন—'যে কোটি কোটি শক্তিতরঙ্গের কথা বললাম তা-ও প্রতিনিয়ত সংঘর্ষে ধ্বংস ও সৃষ্টি হচ্ছে অনন্তকাল ধরে। এর আদিও নেই—অন্তও নেই—অর্থাৎ বস্তুকণা সমূহ সর্বক্ষণ ধ্বংস ও সৃষ্টি এক সঙ্গেই করে চলেছে। সে জন্যই কোন বস্তুকে চিরস্থায়ী হতে দেখছি না। বস্তুর ধর্ম—অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম। সকলেই নিজ নিজ অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অপরকে ধ্বংস করে। এই ধ্বংস করার প্রবৃত্তিটাই হচ্ছে হিংসা। হিংসা বস্তুর সহজাত ধর্ম। যেহেতু সমস্ত জগৎ বস্তু থেকে সৃষ্ট সেহেতু তার সহজাত ধর্ম নিয়ে সে সৃষ্টি হচ্ছে। জীবজগতে মানুষও বস্তু থেকে সৃষ্ট—তাই মানুষের সহজাত ধর্মও হিংসা। কিন্তু মানুষই একমাত্র প্রাণী যে—এই সহজাত ধর্মকে সে প্রকৃত জ্ঞান দ্বারা নিয়ন্ত্রণ বা বিনষ্ট করতে পারে। এই জ্ঞান বা মহাজ্ঞান দুভাবে অর্জিত হতে পারে—পরিবেশ ও প্রকৃতির লীলা দর্শনে উপলব্ধি দ্বারা এবং শিক্ষা, উপদেশ ও চর্চা দ্বারা। এই জ্ঞানের প্রকাশ ঘটে—প্রেম ভালোবাসায় সহানুভূতিশীল হয়ে কর্তব্য বা দায়িত্ব পালনে। পরিবেশ ও প্রকৃতির লীলা দর্শনে এই জ্ঞান অনেক সময় মানুষের অজ্ঞাতেই অর্জিত হতে দেখা যায়। আর যাদের শিক্ষা উপদেশও চর্চা দ্বারা এই জ্ঞান অর্জিত হয় তাদের যদি শিক্ষা পদ্ধতিতে সামাজিক দায়বোধের পাঠক্রম না থাকে বা ত্রুটিপূর্ণ থাকে তাদের জ্ঞান ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তা-ভাবনায় থাকে বলে, সহজেই স্বীয় স্বার্থরক্ষায় তৎপর হয়ে উঠতে দেখা যায়। আর এই দ্বিতীয় শ্রেণীর জ্ঞান অর্জন যদি অসমাপ্ত থাকে তা হলে তা অতিমাত্র বিকৃতি লাভ করতে পারে। যমুনার ক্ষেত্রে সম্ভবত তাই ঘটেছে।'

যমুনার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তাঁর কাছ থেকে এমন তাত্ত্বিক সারগর্ভ বক্তৃতো শুনেব আশা করিনি। সত্যি কথা বলতে কি, তাঁর এইসব তত্ত্বকথা আমি কিছুই বুঝিনি। যমুনা সম্পর্কে তাঁর মতটা আমি সোজাসুজি জানতে চেয়েছিলাম। তিনি কিন্তু সোজা পথে না গিয়ে মনে হয়েছিল প্রকারান্তরে তার পক্ষে সাফাই গাইলেন। অথচ আমার অজ্ঞাতে বিবাহ বাসরে তাঁর বন্ধুর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করেছি বলে মিথ্যে অভিযোগ তুলে আমাকে কি অপদস্থই না করেছিলেন, আর যমুনা—স্বিচারিণী না হয়ে একেবারে স্বৈরিণী হয়েও সে সতী লক্ষ্মী। হায় ভগবান! তুমি পুরুষদের কি ধাতু দিয়ে তৈরী করেছ? এমন নির্লজ্জ বিচার-বিশ্লেষণ। হবে না কেন, তুমিও তো পুরুষ!

ঠাকুর দেবতার স্থানে বসে ভগবানকে অভিযুক্ত করে—কান্না এসে গিয়েছিল আমার চোখে। স্বামীর মুখের উপর থেকে আমার চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে উথলে ওঠা চোখের জল আঁচলে মুছে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে সুদূর অতীত ও অদূর ভবিষ্যত যেন খুঁজছিলুম। না কোনো উপায় নেই। সুদূর অতীতেও কুন্তি, অহল্যা, মন্দোদরীর মতো আরো অনেক স্বৈরিণী আছেন যাঁরা সতী বলে জগতে পূজিতা হয়ে আছেন।

—'কি হল মুখ ঘুরিয়ে রইলে যে!' আমি তাঁর আচমকা প্রশ্নে চমকে উঠে তাড়াতাড়ি ফিরে মুখে হাসি টেনে মিথ্যা কথা বললুম—'মুখ ঘুরিয়ে না নিয়ে সারাক্ষণ তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে লোকে কি বলবে! তাই……।'
—'ও তাই', বলে তিনি হাসলেন, পরক্ষণে হাসি থামিয়ে বললেন— 'যমুনা কিন্তু তা ভাবে না। ও পরপুরুষকে ভালোবাসতে ও পরনিন্দাকে ভয় করে না। এখানেই পার্থক্য। মনে মনে একথার উত্তরে বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল, যে পুরুষের ঐ সব মেয়েদের বেলেল্লাপনা ভালো লাগে তাদের 'থু' দিতে ইচ্ছে করে আমার। কিন্তু বললাম না। শুধু যেন কিছু বুঝলুম না এমন হয়ে চুপ করে রইলাম। তিনি নিজেই বললেন— 'আমার কথাগুলো নিশ্চয়ই বোঝনি।' সঙ্গে সঙ্গেই ভয় হল আবার সেই তাত্ত্বিক কথা শুরু করবেন কি না। তাই বললুম, 'কিছু কিছু বুঝেছি।'

'—কিছু কিছু কেন?'

'এত কঠিন কথা সবই কি বোঝা যায়?' বলেই পুনরায় বললুম—'কিতু তুমি যাই বল না কেন—যমুনাকে আমি আর মেনে নিতে পারছি না।' মনের কথা সোজাসুজি বলে ফেললাম।

হঠাৎ তিনি একটু এগিয়ে এসে আমার কাঁধ ছুঁয়ে চুপি চুপি বললেন—'কেন? তুমি না ওকে ভালবাস?'

'—হ্যাঁ ভালবাসতুম। কারণ সে তোমাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে শিক্ষক বলে ভালবাসত বলে'—কান্নায় আমার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। একটু থেমে পুনরায় বললাম— 'এখন দেখছি এ ভালোবাসায় প্রেম নেই, যা আছে তা শুধু উৎকট ভোগের পিপাসা। পুরাণের সেই সুশোভনার মতো তার চরিত্র। একের পর এক পুরুষকে নিঙড়ে খাওয়া

এ কি ভালো? ঘেন্না ধরে না? পক্ষান্তরে তার রুচিটাকেও আমি ঘেন্না দিলুম এটা তিনি গায়ে মাখলেন না। উল্টে হাসছিলেন। তাঁর এই হাসি দেখে আমার ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছিল। একটু ক্রোধের সঙ্গেই বললাম—'ছিঃ, এমন মানুষকে বিয়ে করার কথা কী করে ভাবল?'

আমার কথায় তার চোখে-মুখে কোন পরিবর্তন দেখলুম না। নির্বিকার ভাবেই তিনি বললেন—'সে বিয়ের দাবী করেছিল—আমি মত দিয়েছি।'

দিয়েছিলামও নয়। দিয়েছি। এ যেন একেবারে অটল সিদ্ধান্ত। আমি আর সইতে পারছিলুম না। চড়া গলায় ঝাঁঝের সঙ্গে বললুম—'এজন্যই কি তুমি আমাকে এখানে নিয়ে এসেছ?' তিনি—মানে আমার স্বামী—যাকে হিন্দু রমণীরা পরম গুরু বলে ভাবে—সেই ভদ্রলোক নির্লজ্জ হয়ে বললেন—'যদি বলি হ্যাঁ।'

আমি কিছু বলতে পারছিলুম না ঘৃণায় লজ্জায় বুকের ভেতরটা ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছিল নিজেকে কোনোমতেই আর সামলাতে না পেরে মুখ ফিরিয়ে অঝোরে কাঁদলুম। কতক্ষণ মুখ নীচু করে কেঁদেছিলুম মনে নেই। যখন মুখ তুলে তাকালুম তখন দিনের আলো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। মেয়েটাকে দেখতে না পেয়ে হঠাৎ মনটা চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। উঠে ওকে খুঁজতে যাচ্ছিলুম। তিনি পেছন থেকে আঁচল ধরে টেনে বললেন—'যাচ্ছো কোথায়?'

ভাঙা গলায় বললুম—'মামণি কোথায় দেখি।'

—'ও ঠিক আছে, আমি দেখছি। কথাটা শুনে যাও!'

—'আর শোনার কি আছে। ও শ্যামের বৌকে বিষ খাওয়াতে চেয়েছিল। পারেনি। ধরা পড়ে পালিয়ে এসেছে। এবার আমাকে খাইয়ে পথের কাঁটা দূর করবে!'

—'আরে না না। তা কি সম্ভব!' নিরুদ্বেগে হাসতে হাসতে তিনি আমাকে প্রবোধ দিয়ে টেনে বসালেন। আমি তখনো বুঝিনি যে তিনি হেরে যাচ্ছিলেন। বললেন—'তাকে বিয়ে করা আমার প্রয়োজন। তাকে শয্যাসঙ্গিনী করার চেয়ে বিয়েটা অনেক বেশী প্রয়োজন। আর তা ছাড়া অনেক সময় লোকাচার ও হৃদয়াচারকে পরস্পর-বিরোধী মনে হয়। এটার সামঞ্জস্য বিধানের জন্যেই মানুষ ওটা করে। হৃদয়াচারটা গোপন—লোকাচারটা প্রকাশ্য। হৃদয়াচারটা জটিল—লোকাচারটা সহজ। মানুষ মাত্রই জটিলতা পরিহার করতে চায়। আমি তাই চেয়েছি।' আমার মন জটিল সহজ তত্ত্ব নিয়ে তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে চাইল না। কিন্তু প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের সুরেই বললাম—'পুস্তক প্রকাশের ব্যাপারটা কিন্তু এতে কিছুমাত্র সহজ হবে না।' চকিতে তিনি যেন আত্মসম্বিৎ ফিরে পেলেন—'না আর আত্মবিক্রয় নয়।'

'না-আর আত্মবিক্রয় নয়'—তাঁর এই স্বগত উক্তি—আমার মনকে সত্যি নাড়া দেয়নি। কার কাছে আত্মবিক্রয়, কি ধরনের আত্মবিক্রয় কোনো প্রশ্নই আমার মনকে আর ভাবাতে পারেনি। মাথা নিচু করে ভাবছিলাম কী হবে আমার পরিণতি?

তাঁর শিল্পসৃষ্টি যদি অপ্রকাশই থেকে গেল তবে যেমন তাঁর শ্রম ও সৃষ্টির সার্থকতা নেই—তেমনি তিনি যদি যমুনাকে ত্যাগ করে পূর্বৎ জীবনযাত্রায় ফিরে যেতে চান তা হলে আমার বেঁচে থাকারই বা সার্থকতা কোথায় ?

স্রষ্টার মনে আত্মপ্রকাশের কী আকুলতা—যদিও আমি তার কিছুমাত্র বুঝিনি তবু আমার মনে হয়েছিল, তাঁর সহজ ঋজু প্রশ্নটিকে আমি রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করায়—তিনি যেন তাঁর নিজেকেই ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন অন্ধকারের দিকে। তাঁর কাব্য ও শিল্প আর গ্রন্থিত হয়ে সূর্যের আলো দেখবে না। ঐ স্বগত উক্তি যেন সেই ইঙ্গিতই দিয়ে গেল।

যমুনার সঙ্গে তাঁর বিবাহ শুধু প্রয়োজননির্ভর, প্রেম-ভালোবাসা নির্ভর নয়। সন্তান, সংসার—সামাজিক মর্যাদা কোনো কিছুই নির্ভর নয়, শুধু প্রকাশনা-নির্ভর। আমি এই সহজ সত্যকে মেনে নিতে পারিনি। যমুনা কি মেনে নেবে? সে কি তার উত্তরাধিকারের দাবী করবে না? সে কি কবিপত্নী বলে সামাজিক মর্যাদার দাবী করবে না?

অন্যদিকে তিনি বলেছিলেন, তাকে তিনি শয্যা-সঙ্গিনীও করবেন না। শুধু টাকাটার জন্যই বিয়ে? সে তো ঋণ হিসেবেও নেওয়া যেতে পারে! তা-ও নয়। তবে কি অবাধ মেলামেশার লোকনিন্দার ভয়? সে ভয়ের পথ তো আমিই আগলে রেখেছি। তবে?

মুখ তুলে চেয়ে দেখলাম, তিনি আমার মুখের দিকেই চেয়ে আছেন। আমার একটা 'হ্যাঁ' তার বড় প্রয়োজন। নইলে তাঁর আরো বড় প্রয়োজন মিটবে না।

হায়রে পুরুষ। কুলটা বলে কত নারীকেই তোমরা অপবাদ দিয়ে কঠোর দণ্ড দিয়েছ। আর আজ প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও তাকেই তুমি স্ত্রীর আসনে বসিয়ে বলতে চাইছ—এ সতীলক্ষ্মীর বড় প্রয়োজন। ধিক্ তোমাদের চরিত্রকে! ধিক্! যে মহৎ কাজ উদ্ধারের নামে তুমি যে এ অহিত কাজ করতে চাইছ তা যে কোনো কালেই হিত হয়ে তোমার মুখোজ্জ্বল করবে না তা কি বোঝ না? যে নারী একাধিক পুরুষে উপগতা, ততোধিকে তাঁর যে কোনো আপত্তি থাকতে পারে না তা-ও কি বোঝ না! তোমার তত্ত্ব যদি তোমার স্ত্রী গ্রহণ করে অপর পুরুষে উপগতা হয়—তা'হলে কি তাকে তুমি ব্যভিচারিণী বলে পরিত্যাগ করবে না?

সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখে একটি দৃশ্য ভেসে উঠে—ব্যভিচারের প্রত্যক্ষ সাক্ষী হয়ে মিলিয়ে গেল তখনই। একদিন চানের পর বডিস পরার সময় দেখেছিলাম যমুনার দুধের বোটার রং ঘন কালো। ভেবেছিলাম কথাটা ওকে জিজ্ঞাসা করব। করি করি বলে আর করা হয়নি। এখন এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে যমুনা একসময় মা হতে গিয়েছিল। নইলে এমন কালো হবে কেন? তলপেটে ফাটা ফাটা কিসের দাগ তার? তাতেও সে কলঙ্কিনী নয়? তাই মুখ দিয়ে রূঢ়ভাবেই স্বামীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে জবাব দিয়েছিলাম—'ব্যভিচারিণী বলতে যে যে প্রমাণ দরকার তা ওর

মধ্যে সব কটি'ই বিদ্যমান। তুমি যদি সে প্রমাণ মানতে না চাও তবে বলব—তা যে একদিন সংক্রামক হয়ে তোমার সংসারে শিকড় গেড়ে বসবে না একথা অস্বীকার করবে কোন যুক্তি দিয়ে?' তিনি আমার কথা শুনে বললেন—'আজকাল তুমি খুব কথা কইতে শিখেছ!' যেন আমার অভিযোগগুলো শুধু কথার কথা—সত্য কিছু নেই। তিনি একটা 'হুঁ' বলে সমস্ত অভিযোগই উড়িয়ে দিতে চাইলেন। তাঁর খোঁচা মারা কথা ও 'হুঁ'র জবাব দিতে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম—'জীবনটাকে কোনোদিন ছোট করেও দেখিনি—আর বড় করেও ভাবিনি—একটা নির্দিষ্ট গণ্ডি দেওয়া সীমার বাইরে পা বাড়ানো মনে হয়েছিল পাপ। এখন দেখছি বড় করেও ভাবা যায়—জীবনের পাঠক্রমে এই শিক্ষারই ইঙ্গিত দেখছি'—বলে স্বামীর সম্মুখ থেকে দ্রুত সরে এলাম।

মামণিকে কোলে নিয়ে ফিরে এসে পুনরায় বললুম—'আর জীবনে নিত্য নতুনকে জানতে হবে, খুঁজতে হবে, জীবনের অপূর্ণতা আটকে আছে কোন্ চরায়। এতদিন এত কাছে থেকেও তোমাকে জানতে চাইনি—আজ হঠাৎ যখন এ জানাটার জন্য মনটা কৌতূহলী হয়ে উঠল—তখন তুমি বললে—না থাক্, আমি যদি তা না মানি এটা কি দোষের? তিনি আমার মুখের পানে কয়েক লহমা তাকিয়ে থেকে বললেন—'না দোষের নয়।'

তারপর আর কোনো কথা হলো না—মঠের চত্বর থেকে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস নিয়ে বের হয়ে এল ও। তাঁর নিঃশব্দ গম্ভীরতায় একটা অস্বচ্ছ বিষাদ যেন আমাদের চারপাশ ঘিরে রইল।

যমুনার দুই নম্বর স্বামীর চিঠিখানি আমার স্বামী ও যমুনার মধ্যে প্রচণ্ড বিরোধের সূচনা করবে বলে যে আশংকা করেছিলুম—এমনকি ওদের মধ্যে চিরদিনের মতো ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে বলে আমি যে শঙ্কিত ছিলুম, তার কিছুই হলো না দেখে বরং উনি সেই দুশ্চারিত্রা মেয়েটাকে বিয়ে করার উলটো প্রস্তাব দিয়ে সমস্যা সমাধানের উপায় বাতলেছিলেন, এসব দেখে শুনে আমি হতাশায় মুষড়ে পড়েছিলুম। এবং সেই সঙ্গে আমি যে ওদের মিলনের অন্তরায় বলে চিহ্নিত হয়ে গেলুম সেজন্যও আমার অনুশোচনার অন্ত ছিল না। বিষকন্যা যমুনা এখন যে আমাকে বিষ খাইয়ে কিংবা অন্য কোনো উপায়ে সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা না করবে এমন চিন্তা এক মুহূর্তও মন থেকে দূর করতে পারছি না।

বেলুড় মঠে গিয়ে আমাকে যেসব কথা বলা হয়েছে এবং প্রতিবাদে আমি যা' বলেছি এসব কথা যমুনা নিশ্চয়ই শুনতে পাবে এবং তারই পরিণতি হিসেবে শুধু সংসার নয়—জগৎ সংসার থেকেই বিদেয় নিতে হবে, এমন একটা দুশ্চিন্তা আমাকে পেয়ে বসেছে। সেই সঙ্গে আমার একথাও বার বার মনে হয়েছে আমি আমার স্বামীকে আদৌ চিনতে পারিনি। এটা আমার দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি হতে পারে বলুন।

কিন্তু দুর্ভাগ্য আর দুর্যোগই তো শেষ কথা হতে পারে না। জীবনের ধর্মই

বোধ হয় বাঁচার জন্যে সংগ্রাম করা। সেই সংগ্রাম হাতে পায়ে হতে পারে, বুদ্ধির হতে পারে। দৈহিক ও আর্থিক শক্তি থাকলে হয়তো—বুদ্ধির কথা ভাবতুম না। কিন্তু সেই শক্তি নারীজাতি বহুকাল পূর্বেই হারিয়েছে। নইলে কুলটা মেয়েটাকে কী করে তার লালসার জিহ্বা কেটে দিতে হয় দেখিয়ে দিতুম। আর আমার মহান আদর্শবাদী পতি দেবতাকেও বুঝিয়ে দিতুম যে সামাজিক অনুশাসনগুলো পূর্বপুরুষগণ অমনি অমনি করেনি। ঐসব অনুশাসন যেখানে যতটুকই শিথিল হয়েছে বা হবে সেখানেই শুধু লাম্পট্যই বাড়বে। সমাজের নিয়ম-শৃংখলা বলে কিছু থাকবে না।

তিনি নিজেই বলেছেন, যমুনার মধ্যে শিক্ষার বিকৃতি ঘটেছে—অথচ তিনিই সেই বিকৃতির পূজো করার জন্যে লালায়িত হয়ে উঠেছেন। কী অদ্ভুত চরিত্র ভদ্রলোকের, বলুন তো! বলছেন—তাঁর আত্মপ্রকাশের প্রয়োজনেই তাঁকে তার জীবনসঙ্গিনী করতে হবে। বলি—জীবনসঙ্গিনীর বাকীটা রয়েছে কি! আমার মত পেলেই তিনি এটাকে সামাজিক স্বীকৃতি দিতে পারেন। তাতে নাকি আমাদের সুখ-সমৃদ্ধির সীমা থাকবে না। এটা তাঁর হাস্যকর যুক্তি নয় কি? সংসার বা সমাজের নৈতিক অধঃপতন ঘটিয়ে আর্থিক উন্নতি যে উচ্ছন্ন যাওয়ার উন্নতি—একথা তিনি শিক্ষিত মানুষ হয়েও বুঝতে চাইছেন না কেন, আমার মাথায় তা' আসছে না। এসব দুশ্চিন্তায় আমার আহার নিদ্রা শিকেয় উঠল।

প্রবেশিকা দেওয়ার স্বপ্ন—স্বপ্নই রয়ে গেল। পড়াশোনায় আর মন বসাতে পারছি না। রান্না-বান্না, ঘর-সংসার কিছুই ভাল লাগছে না। কেবলই মনে হচ্ছিল এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচতে পারতুম! কখনো কখনো মনে হতো সমীরবাবুর ঠিকানা পেলে তাঁকে চিঠি দিয়ে জানাতুম, আমাকে যেন তিনি চিন্ময়ীদির কাছে দয়া করে ফেলে দিয়ে আসেন। পিতৃকুলে যদি কেউ থাকত সেখানে গিয়েও মা-মেয়ে কোনোমতে জীবন কাটাতুম! আশ্চর্য এখন আর আত্মহত্যার কথা মনে আসছিল না। বরং ফুলেফলে সোনার সংসারটা শুকিয়ে যাবে বলে কেবল আমার এই দুঃখে এই বৈরাগ্য—পালাই পালাই ভাব। 'কোনোমতে বাঁচতে পারলে যেন এর একটা বিহিত করা যাবে' যখন এমনই একটা মনের অবস্থা—তখন চিঠি এল অভিজিৎবাবুর। তিনি লিখেছেন—'নীলাঞ্জনবাবু যে পান্ডুলিপি ফেরত নিয়ে গেছেন—সেগুলি কিংবা অন্য গল্প-উপন্যাসের পান্ডুলিপি নিয়ে একদিন দেখা করুন। একজন Publishers-এর সঙ্গে কথা হয়েছে। এগারটা থেকে তিনটের মধ্যে আসবেন। নীলাঞ্জনবাবু বোধ হয় আমার ওপর রাগ করেছেন—কারণ তিনি আর দেখা করেননি!' পোস্টকার্ডে চার লাইন কথা লিখে আমন্ত্রণ জানালেন অভিজিৎবাবু। তাঁর চিঠি পেয়ে একটু আলোর নিশানা যেন দেখলাম—যদি লেখাগুলি সত্যি সত্যি ছাপানোর ব্যবস্থা করতে পারি—তবে যমুনাকে তাঁর আর কি প্রয়োজন! ঝাঁটা মেরে তাড়াব না তখন?

যমুনা পরদিন আসেনি। এসেছিল সোমবারে। এসে ওঘরে গিয়ে তার সঙ্গে কি ফিসফাস কথা বলছে—আমার জানতে আগ্রহ ছিল না। যখন সে বের হয়ে আসে

তখন স্বামীর কথা শুনতে পেলুম—'একদম দেরী করবে না।' অনেকটা হুঁশিয়ারীর মতো কণ্ঠস্বর। কিন্তু যমুনা এল রাত সাড়ে নটায়। কাজেই একটু কথা কাটাকাটি হলোই! আমার মনে হতো এটা স্বামীর আদিখ্যেতাপনা ছাড়া কিছুই নয়। ওর মতো মেয়ের ভয়ডরের কোন প্রশ্নই ওঠে না। আর একটা লক্ষ্য করার বিষয়—সেই শনিবারের পর থেকে তিনি আবার 'ঘর-বৈঠকা' হয়ে গেলেন। আর যমুনা প্রায় প্রতিদিনই ন'টা কি সাড়ে ন'টায় বাড়ি ফিরতে লাগল। অশান্তিটা যেন এখান থেকেই শুরু হয়ে গেল। প্রতিদিন দেরী করে বাড়ি ফেরা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক—আমার ভাল লাগত না। তবুও ওরা যখন কথা কাটাকাটি করত তখন আমার কানটা অমনি উৎকর্ণ হয়ে থাকত—বিশেষ করে যমুনার কথা শোনার জন্যে। একদিন যমুনাকে বলতে শুনলাম, 'আমি তোমাব স্ত্রী বা সম্পত্তি নয়। আমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ মানব না আমি।'

ও-ঘরে কথা চড়াগলায় হচ্ছে বলে এ-ঘর থেকেই শুনতে পেলাম। উনি তাকে নিয়মের বাঁধনে বাঁধতে চান। ও তা মানবে না। স্বৈরিণী কখনো তা মানে? ওর কথাটা এমন, স্ত্রী হলেই তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হাত দেওয়া চলতে পারে—অথবা তোমার অনুজ্ঞা বিনাবাক্যে শিরোধার্য বলে মেনে নিত। আর আমার স্বামীর কথাই বলি—তিনিই বা ওকে বাধ্য অনুগত রাখার জেদ ধরেন কেন? নাকি চাঁদ মুখখানি না দেখে থাকতে পারেন না। কিন্তু ওদের মধ্যে যাই ঘটুক আমার সঙ্গে যমুনার প্রকাশ্য কোনো কথা কাটাকাটি নেই। শুধু একদিন বলেছিলুম—'তুমি তাড়াতাড়ি এলে আমার একটু সুবিধে হয়।' সে বলেছিল—'জানি দিদি, কিন্তু উপায় নেই।' আমি আর কিছু বলিনি। এদিকে পতিদেবতা যেন কেমন হয়ে গেলেন। একটা উদাস বৈরাগ্য বৈরাগ্য ভাব। ঘরের বাইরে বারান্দায় সকাল-সন্ধে পায়চারি করা, মাঝে মাঝে বারান্দাব চালে লতিয়ে ওঠা যুঁই ফুলের লতাটা তুলে দেন। মাধবী যেন যুঁইকে পিষে দিতে না পারে সেজন্যে তাঁর বেয়াড়া বাড়-বাড়ন্ত লতাপাতাকে মুলের সঙ্গে বেঁধে রাখেন। মাঝে মাঝে বারান্দায় ইজিচেয়ার টেনে নিয়ে এসে দেহটা এলিয়ে দিয়ে কখনো আকাশের দিকে, কখনো উঠোনের দক্ষিণ কোণে বেলফুলের থোকা থোকা ফুল ও কলির দিকে চেয়ে থাকেন। লেখার পাটও নেই, পড়ার পাটও নেই। কেবল সেই সকাল বেলায় চা খাওয়ার সময় খবরের কাগজের ওপর একবার চোখ বুলান। ওঁকে দেখে আমার ভয় হয়। এমন অস্থির চঞ্চল মানুষটা যেন নিজেকে কোথায় হারিয়ে ফেলেছেন। আর এটা ঘটেছে সেই সোমবারে ফিরে এসে যমুনার ফিস্‌ফিস্ কথা বলার পর থেকেই। যেন একটা প্রচণ্ড আঘাতে তিনি গুঁড়িয়ে গেছেন।

খেতে দিলে খান। নইলে খাবার কথা—এমনকি চায়ের কথাও বলেন না। কেন হঠাৎ এমন নিস্পৃহ ভাব। প্রথমে আমি তার কিছুই বুঝি নাই। পরে মনে হয়েছিল—সেজন্য আমিই দায়ী। কেন না ঐ বেলুড় মঠের প্রস্তাব আমিই অগ্রাহ্য করেছি। সেখান থেকে আসার পরই আবার আগের মতো 'হ্যাঁ—না'র বেশী কথা আর বলেন

না। কিন্তু কয়েক দিন পর তিনি যমুনাকেও এড়িয়ে চলতে চাইছেন। তার সঙ্গেও সেই হৃদ্যতা যেন কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। কথা বললেই চটাচটি। যমুনার স্পষ্ট কথা—তোমার সংসারে শালীনতার মুখ চেয়ে চালাতে গেলে ঘরে বৌ হয়ে থাকতে হবে। সংসারের দায়-দায়িত্ব মাথায় নিয়ে এসব বিলাসী কথা শুনতে ভাল লাগে না। বাইরে আমি এত রাত কি করি চুপি চুপি গিয়ে দেখলেই পার।

যমুনার টান টান কথা। স্বামী মুখে কুলুপ এঁটে আছেন। যমুনার এতবড় দাপিয়ে কথা বলার কারণ কি আমার মাথায় তা কিছুতেই ঢুকছিল না। যমুনা যথারীতি তার মতো বলতে লাগল। আগের মতো সোহাগমাখা প্যালপ্যালিয়ে কথা বলা—যেন কবেই চুকে গেছে। যমুনার যত দাপট বাড়তে লাগল স্বামী যেন ততই মিইয়ে যেতে লাগলেন। এ যে গোখরা সাপ আর বেদেনী। মাথায় ধুলোপড়া ছুঁড়ে দিলেই হলো।—স্বামী একেবারে নিস্তেজ হয়ে চুপ মেরে যান।

যমুনা এখন আর ওঁর কাছে পড়ে থাকে না। সারাদিনে দুই তিনবার ত্বরিত যাওয়া আর আসা। শুধু তাই নয়, এখন আরো আগে আগে বের হয়, আরো রাত করে ফেরে। সঙ্গে সঙ্গে তার চালচলন পোশাক-আশাকও পালটে গেছে। নিত্য-নতুন শাড়ি আর ম্যাচ করা ফিনফিনে ব্লাউজ। মাথার সিঁথিটা আজকাল সোজা নয়। কার্তিক অঘ্রাণের সূর্য যেমন কাত হয়ে উঠে কাত হয়েই চলে যান। শেষে একদিন সিঁথির রেখাটাই উঠে গেল। কাপ্তান পুরুষদের মতো সমস্ত চুলই সোজাসুজি উলটে গেল। আগে ঠোঁটে লিপস্টিক লাগাত না, গালে রোজ পাউডারের ছোপ থাকত না, চোখের কোণে বাচ্চাদের মতো কাজলে সূক্ষ্ম টানা রেখাও থাকত না—এখন এসব না হলেই যেন নয়। ব্লাউজ ছোট হয়ে নাভির সীমানা ছাড়িয়ে ওপরে উঠে গেছে—শাড়ির কোঁচাটা নাভির বেশ নীচে নেমে তলপেট ও কোমরের মাংসের খাঁজ-এর জৌলুষ দর্শককে সহজেই আকর্ষণ করবে—এমনি তার পরিবর্তন! আমাকে নিয়ে তার বসার সময় নেই। স্বামীর লেখার কপি করার নামে গণ্ডা গণ্ডা চিঠি লেখে কাকে কে জানে! মোটকথা সব মিলিয়ে সে আমার কাছে বিষ হয়ে উঠেছে।

স্বামীর সমস্ত পাণ্ডুলিপি তার হেপাজতে। আলমারীর চাবিও তার কাছেই। কোন্‌টা কতটা হয়েছে সেই জানে।

এদিকে সংসার অচল হতে হতে যেটুকু সচল আছে তার সবটাই এখন যমুনার দয়ার ওপর।

এক সময় আমার মনে হয়েছিল—শ্যামের কাছ থেকে যদি সে টাকা কিছু পেয়েই থাকে, তা দিয়েই চালাচ্ছে সংসার। এখন মনে হচ্ছে, হয় জমি বিক্রি হয়ে গেছে, নয়—অন্য কোনো উপায়ের নতুন পথ পেয়েছে সে।

এদিকে সংসারে ডাল ভাত তেল নুন কোনোমতে জুটলেও আমাদের জন্যে মাথার নারকেল তেল, দাঁতের মাজন, গায়ে মাখা সাবান, কাপড় কাচা সাবান-সোডা, এসবের বড় বাড়ন্ত অবস্থা। ওর কিন্তু দামী গন্ধ তেল, দামী সাবান, কাপড় কাচার দামী

দু'রকমের নতুন বের হওয়া ডিটারজেণ্ট পাউডার, দু'তিন রকমের সেণ্ট পাউডারের ঘাটতি নেই।

বেশ চালাচ্ছে, বেশ চলছি। আমার কিছু বলার নেই। মেয়েটা মাঝে মাঝে গন্ধ তেল মাথায় দেবার আব্দার করলে একটু ছুঁইয়ে ওকে শান্ত করি। যমুনা প্রতিদিনই বের হওয়ার আগে ও-ঘরে একবার উঁকি দিয়ে 'যাচ্ছি' বলে চলে যায়। সেদিনও সে তৈরি হয়ে ওর মাস্টারমশাইকে দেখা দিতে যাচ্ছিল। সেদিন যেন ওকে আমি নতুন করে দেখলাম। এমন একটা মেরুন রংয়ের শাড়ি আর ব্লাউজ পরেছে যা দিয়ে শরীরের লোমও ঢাকা যায় না। এমনিতেই সে বুকের ডান দিকটা বড় একটা ঢাকে না—তার ওপর স্পঞ্জের বডিস। আমার এমন বিশ্রী লাগছিল, ওর দিকে যেন তাকাতে পারছি না। ওদিকে পায়ের পাতায় সায়ার ঝালর পায়ে পায়ে লটপট খাচ্ছে। ডান হাতে রিস্ট ওয়াচ, বাঁ হাতে একখানি বালা। কানে একজোড়া দুল। মাথার উল্টে গিয়ে পিঠে পাখির লেজের মতো চুলের ডগা রেশমী ফিতে দিয়ে বাঁধা। সব মিলিয়ে যাত্রাদলের আধুনিক নর্তকী। বললাম—'শাড়িটা পালটে নিলে হতো না?' সে ফোঁস করে উঠল।

—'কেন?'

—'দেখতে যেন কেমন কেমন লাগছে।'—যমুনাকে সমীহ করার মতো করে বললুম।

—'থাকো তো ঘরের কোণে, জানবে কি করে?'—বলেই সে গট্‌গট্ করে বের হয়ে গেল। স্বামীর ঘর থেকেও বের হয়ে গেলে তিনি জানালা দিয়ে ওর দিকে রোজের মতো আজও তাকিয়ে রইলেন। ভেবেছিলুম এমন উৎকট দৃষ্টিকটু পোশাকে যমুনাকে দেখে উনি তিরস্কার করবেন—কিন্তু করলেন না। বরং চাতকের মতো তাকিয়ে রইলেন। এইসব দৃশ্যে আমার বুকের ভেতর একটা দুঃসহ যন্ত্রণাবোধ করতুম। ওঁকে কি ও কিছু খাইয়ে ভেড়া বানিয়ে রেখেছে? এমন চরমতম খেয়ালি মানুষটা কেন এমন ব্যক্তিত্বশূন্য হয়ে ওর কাছে আত্মসমর্পণ করল, কৌতূহল হলো—জিজ্ঞেস করি। অবশ্য মনে অন্য কিছু উদ্দেশ্যও ছিল। আলমারীর একটা চাবি যমুনার কাছে থাকলেও আরেকটি চাবি ওঁর বিছানার নীচে আছে। সেটা কোনোমতে হস্তগত করতে পারলে—কোনো ফাঁকে আলমারী থেকে দু'চারটা পাণ্ডুলিপি সরিয়ে নিতুম।

এক শনিবার যমুনা বাড়ি চলে গেলে ইচ্ছে করেই সন্ধের পর চুপি চুপি ওর ঘরে গেলুম। তিনি বাইরে বারান্দায় ইজি চেয়ারে তন্দ্রাচ্ছন্ন।

চটপট্ তোশকের তলা থেকে চাবিটা তুলে নিলুম এবং বিছানা ঝেড়ে মুছে ঠিক করে পেতে দিয়ে বাইরে আসতেই বললেন—'আরেক কাপ চা দিয়ে যেও তো। বুঝলুম আমি চুপিচুপি গেলেও তিনি টের পেয়েছেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই চা এনে দিয়ে বললুম, 'শরীরটা কি ভালো যাচ্ছে না?'

তিনি নিরুত্তর। পুনরায় বললাম—'ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধপত্র খাওয়া দরকার। তোমার অসুখ হলে সংসারটাও যে অসুখে ভোগে।'

—'না তেমন কিছু না' বলে উঠে সোজা হয়ে বসে চায়ের কাপ তুলে নিলেন।

একদিন যমুনা অনেক রাত করে বাড়ি এল। এমনিতেই দেরী করে আসে বলে বাসস্টপ থেকে রিকশো করে আসে। রাত এগারটা বেজে গেছে—তার আসার নাম নেই। স্বামীর মতো আমিও উৎকণ্ঠিত হয়ে গেলুম। একবার ঘরে, একবার কখনও বাইরে পাক খেতে লাগলুম। তার দেরী দেখে আমার খুব বিরক্ত বোধ হচ্ছিল। ও না আসা পর্যন্ত তিনি খান না। তিনি না খেলে আমিও না। ও যে তা জানে না তা নয়। জেনে শুনে দেরী; ধিক তার ভালোবাসা! আর একথাও বলি, তুমি পুরুষ মানুষ তার ওপর শরীর ভাল নয়—তোমার না খেয়ে থাকার কি আছে?

এসব কিন্তু আগে দেখিনি—দেখছি ইদানিং। তুমি তার জন্যে বসে থাকবে কেন? সে তোমার এমন কে যে তার আগে খেলে মহাপাতকি হবে? অবশ্য আমার উৎকণ্ঠাটা অন্য কারণে। যে পোশাক-আশাকে চাল-চলনে বাইরের প্রলুব্ধ মাংসলোভী হায়নাদের আমন্ত্রণ করে—তার কিছু একটা হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য নয়। কিন্তু ভ্রষ্টা মেয়েরা কি পুরুষের লাম্পট্যকে ভয় করে? ভয় করলে রূপের বিজ্ঞাপন ছড়াবে কেন? কিন্তু ওকে নিয়ে যদি রাস্তাঘাটে এমন কিছু—ভগবান না করুন—ঘটেই যায় তবে কি এ বাড়ির মান-সম্মান যাবে না? লোকে তো জানে, ও নীলাঞ্জন-বাবুর শালী। তখন আমরা বা লোকের কাছে মুখ দেখাব কি করে? লোকেরা থুথু দেবে না! তিনি ওকে সাড়ে আটটার মধ্যে বাড়ি ফিরতে পইপই করে বলেন। এজন্যই বলে কি পোড়ামুখী—'আমার স্বাধীনতায় হাত দিও না।' আরে হতভাগি তোর স্বাধীনতার জন্য যদি আমাদের মুখে চুনকালি পড়ে—সেই স্বাধীনতা তুই তোর বাপের বাড়ি গিয়ে দেখা না?—এই ধরনের শালীন অশালীন ভাবনা চিন্তায় সময় কাটছিল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি এগারটা চল্লিশ হয়ে গেছে। স্বামীর ঘরে গিয়ে দেখি তিনি তখনো জেগে জেগে পড়ছেন। বললাম—'রাত পৌনে বারটা বাজে, এখনোও কি আসবে বলে মনে হয়? ও যদি বাড়ি চলে গিয়ে না থাকে তা'হলে কি এতোক্ষণে ফিরত না?' তিনি তাঁর টেবিল ঘড়ির দিকে তাকালেন। পরে বললেন—'এখন আর খাওয়ার রুচি নেই—সদর বন্ধ করে দিয়ে তুমি বরং কিছু মুখে দিয়ে শুয়ে পড় গিয়ে'—বলে টেবিলে ঢাকা দেওয়া জলের গেলাস তুলে এক ঢোক জল খেলেন। বাধা দিয়ে বললাম—'শুধু জল খেলে কেন? দুধ আছে, গরম করে দিচ্ছি।'

তাঁকে দুধ খাইয়ে যখন ফিরে আসছি ঠিক সেই সময় একখানি প্রাইভেট কার গেটের সামনে এসে দাঁড়াল। আমি তো অবাক। এ বাড়ির সামনে কোনোদিন কারো গাড়ি এসেছে এমন কথা মনে পড়ে না। কে এল এত রাত্রে! এ সময়ে এ গাড়ি! আমি ঠিক করতে পারছিলুম না কি করবো। ইতস্তত করছিলাম। উঠোনের

কোণ আর সদর গেট মাত্র কয়েক গজ দূরে। গেটের দরজা ভেতর থেকে চেপে রাখা ছিল—না খুললে সঠিক বোঝা যাবে না কে আসছে কিংবা এ বাড়িরই কিনা। কিন্তু এত রাত্রে আমি গিয়ে গেট খুলব? ইতস্তত এজন্যই। হ্যারিকেন হাতে নিয়ে স্বামীকে ডাকতে যাব—দেখি তিনিই বের হয়ে এলেন—'গাড়ির শব্দ হলো না?' বললাম—'হ্যাঁ।' সঙ্গে সঙ্গেই গেট ঠেলে খুলে এক ভদ্রলোক ডেকে বললেন—'এটা কি থারটি সেভেন নতুনপল্লী নীলাঞ্জন চৌধুরীর বাড়ি?' তিনি এগিয়ে গিয়ে বললেন—'হ্যাঁ আমিই নীলাঞ্জন চৌধুরী।'

—'আসুন আপনারা দুজনেই এদিকে আসুন। ভদ্রমহিলাকে নিয়ে যান।'

—আপনি বিশ্বাস করবেন না—ভদ্রলোকের মুখে কথাটা শুনে আমার হাত পা কাঁপছিল। কী জানি কী দুর্ঘটনা ঘটেছে। ব্যস্ত হয়ে দুজনেই এগিয়ে গেলুম। দেখলুম যমুনা অচৈতন্য হয়ে পেছনের সীটে পড়ে আছে। তাকে আমরা টেনে কোনো-মতে নামিয়ে এনে ঘরে শুইয়ে দিলুম। তিনি ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দেখেন গাড়ি স্টার্ট দিয়ে ভদ্রলোক চলে গেলেন। লোকটি কে, কত নম্বর গাড়ি কিছুই জানা গেল না। যমুনার কাপড়-চোপড় অবিন্যস্ত ছিল, ব্লাউজের বোতাম খোলা—বডিসের ফিতে বেল্ট খোলা। মুখে মদের উৎকট গন্ধ। তিনি ফিরে এসে ওর কাছে মুখ নিয়ে গন্ধ পেয়ে বললেন—'ওকে মেঝেতে মাদুর পেতে শুইয়ে দাও। নইলে বমিটমি করে বিছানা নষ্ট করতে পারে।'

সঠিক বুদ্ধি। তাই করলুম। তিনি মশারী টাঙ্গাতে নিষেধ করে তার দিকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে কিছুক্ষণ বাদে একটা 'ছিঃ' বলে বললেন—'এই হচ্ছে অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা।' তারপর একটা ওষুধ এনে আমার হাতে দিয়ে বললেন—'যখন জ্ঞান ফিরবে মুখ ধুইয়ে এটা খাইয়ে দিও। তখন স্বাভাবিকভাবে ঘুমিয়ে পড়বে।'

যখন তিনি যমুনার স্বাধীনতার এই অধঃপতন দেখে 'ছিঃ' বলে ঘৃণা প্রকাশ করেছিলেন তখন আমার অজানতে মন যেন বলে উঠেছিল, ঠাকুর এই ঘৃণা যেন ওকে 'তৃণসম দহে'। কিন্তু পরক্ষণেই ওষুধ এনে সযতনে ঘুম পাড়াতে বলে গেলেন। সত্যি, কী বিচিত্র এই মানুষটি। আমি যেন কিছুতেই আমার স্বামীদেবতাকে চিনতে পারছিনে। হায় ভগবান।

পরদিন যমুনা সুস্থ হলে ওকে ডেকে নিয়ে গেলেন নিজের ঘরে। ভাবলাম, এখন বোধহয় আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাবেন ওকে। কিন্তু না, কিছুই হলো না। শুধু আটক করে রাখলেন। যেন কিছুই হয়নি কাল রাত্রে। খাওয়া-দাওয়া স্বাভাবিক। ওর যখন টিউশানি যাবার সময় হল তখন যমুনার কণ্ঠ শুনলাম—'না আমাকে যেতেই হবে। সামনে ছাত্রদের পরীক্ষা।'

—'কাল তোমার শরীরটা ভাল ছিল না—তাই নিষেধ করছি।'

—'কাল ভাল ছিল না—আজ তো খারাপ নেই।—আমাকে বাধা দিও না বলছি!' উলটে ধমকের সুরে বললে যমুনা। আমি এক পা দু'পা করে এগিয়ে গিয়েছিলাম

দরজার কাছে—মুখ বাড়িয়ে বললুম—'তুমি তো জানো তুমি না আসা পর্যন্ত উনি খেতে বসেন না।' যমুনা আমার পানে একপলক তাকিয়ে বললে—'হু' কত ঢং-ই দেখলাম।' যমুনার গলায় তাচ্ছিল্যের সুর। কিন্তু স্বামী গায়ে মাখলেন না। এগিয়ে ওর হাত ধরে বললেন—'যেতে দেব, আগে আমাকে একটা কথা দাও।'

ছিঃ, একটা বাঘা পুরুষ মানুষ তুচ্ছ এক মেয়েমানুষের কাছে এত নীচু হয়ে যেতে পারে? আমি আর এক তিলও দাঁড়াতে পারলুম না। লজ্জায় মরে গিয়ে উঠোনের কোণে এসে দাঁড়িয়ে রইলুম।

—'কী কথা?' যমুনার কথা বলার ঢং শুনে মনে হলো ওর বয়সটা যেন ছাব্বিশ থেকে ষোলতে নেমে গেছে।

—'সত্যি বলছ তো?'

—'আরে বাবা, সত্যি সত্যি সত্যি। হলো তো? নাও, এবার বল কি কথা?'

বলুন তো—এসব ন্যাকামী দেখলে কার না গা জ্বলে।

গাঢ় স্বরে স্বামী বললেন—'প্রতিদিন রাত আটটা থেকে তোমাকে প্রত্যাশা করে থাকি—তুমি জান তোমাকে ছাড়া আমার একদণ্ড চলে না আর তুমি কোথায় গল্প করে আড্ডা দিয়ে যখন খুশী ফের। এটা আমি সহ্য করতে পারি না।' একটু থেমে তিনি আবার বললেন—'আমার রুগ্ন অসমর্থ দেহটা নিয়ে বসে থাকব—আর তুমি আমারই চোখের সামনে নিত্যনতুন সঙ্ সেজে অভিসারে বেরোবে'—স্বামীর কথা শেষ হতে দিল না যমুনা ফোঁস করে বলে উঠল—'দ্যাখ, তোমার মুখে যা আসে তাই বল না আমাকে।' ছুঁচাল সুরে জবাব দিল সে।

আমি পা টিপে টিপে আবার উত্তরের জানালার পাশে এসে আড়ি পেতে দাঁড়ালুম। ইচ্ছে করলেই জানালার আধভেজা কপাটের ফাঁক দিয়ে ওদের চোখ রাঙারাঙি নাটকটা দেখতে পারি। কিন্তু কাজটা যে গর্হিত—একথা বারবার মনে হওয়া সত্ত্বেও ওখান থেকে চলে আসতে পারলাম না।

—'তোমার চাল-চলনে পাড়ার দীনেনবাবু পর্যন্ত আমাকে'—স্বামীকে আবার বাধা দিয়ে হুংকার ছুঁড়ে বললে যমুনা—'কে দীনেনবাবু? থাক্, তোমার কোনো কথা শুনতে চাই না।'—তার দুচোখ যেন ক্রুদ্ধা গুঁই সাপের মতো লাল ও তীক্ষ্ণ—'তোমার মন এত ছোট—এত নীচ তুমি?' 'হ্যাঁ আমি ছোট নীচ'—উত্তাপ ও তীব্র শ্লেষের সঙ্গে জবাব দিলেন স্বামী। তারপর আরো কঠিন স্বরে হুকুম দিলেন—'রাত আটটা দশের মধ্যে, পনের নয়—যদি বাড়ি ফিরতে পার, যাও! অন্যথা হলে চলবে না। এটা আমার আদেশ।' আমি জানি আমার স্বামী সহজে উত্তেজিত হন না—হলে চরম পরিণতির জন্য তৈরী হয়েই হন। যমুনা জানে না তাঁর যে আরেক রূপ আছে এবং সেটা কী ভয়াবহ নির্মম সে পরিচয় সে পায়নি, তাই তাঁর আদেশকে ব্যঙ্গ করে কুহুকিনীর মতো—'আদেশ!' বলে হিহি করে হেসে উঠল। তার এই অশ্রদ্ধায় আমার বুকের ভিতরটা শংকায় কেঁপে উঠল। শরতের নিস্তব্ধ অপরাহ্নে তার এই হাসিটা যেন

নাগিনীর মতো এঁকে বেঁকে আকাশের নিঃসীম শূন্যে মিলিয়ে যেতে লাগল—আমার মনে হলো এখনই বুঝি চরম পরিণতি ঘটবে।

সিংহ ঘুমিয়ে ছিল, সে আজ জেগে উঠেছে—অন্তত তাঁর চোখ দেখে আমার তাই মনে হয়েছিল। তার বিশাল বুকের মধ্যে ক্রুদ্ধ নিঃশ্বাসের ঝড়। আমি শুনেছি তাঁর ভীষণ ভয়াল রূপের কথা। উন্মত্ত দাঙ্গাকারী দুই সম্প্রদায়ের মাঝখানে অকুতোভয়ে দাঁড়িয়ে—মুক্ত কৃপাণ ঘুরিয়ে প্রতিহত করেছিলেন দু'পক্ষকেই। যে মানুষটি এককালে নারীর সম্ভ্রম—দুষ্টের দমনে সিংহবিক্রমে লাফিয়ে পড়ে অত্যাচারীর মূল উচ্ছেদ করে লোকের কাছ থেকে খেতাব অর্জন করেছিলেন 'সিংহ চৌধুরী' নামে—সেই সিংহকেই তো আমার সামান্যা নারীদেহের শিকল বেঁধে ঘরবন্দী করতে কর্তব্যের তালিকা হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর মা। তার ফল শুভ কি অশুভ হয়েছিল জানি না—তবে এটুকু জানি—তাঁর স্বদেশীব্রত পালনে শুধু ব্যাহত হয়নি হতও হয়েছে। প্রকৃতির নিয়মে সব প্রাণীই যেমন বাঁচতে চায়—তিনিও বোধহয় বাঁচতে চেয়েছিলেন তাঁর চিত্ত-লোকের শিল্প সাধনায়। স্বাধীনতার পর চিন্ময়ীদি নাকি বলেছিলেন—আর আগ্নেয় অস্ত্র নয়—এখন থেকে অন্যায়-অবিচার-অত্যাচারের বিরুদ্ধে তোমার হাতিয়ার হোক কলম ও তুলি। সেখানে সভয়ে—আমি ছিলুম দূরে। তারপরে তাঁর উত্থান-পতনের প্রায় সব কথাই আপনাকে বলেছি—তারপর তাঁর নিভৃত জীবনে কাব্য ও শিল্প সাধনায় অঙ্গীভূত হয়ে এল এই পোড়ামুখী—ভালবাসার নিপুণ অভিনয়ে আবিষ্ট করে সেই সিংহটাকে আফিং খাইয়ে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল এতদিন। বিদ্রূপ ও তাচ্ছিল্যের কষাঘাতে আজ বোধহয় জেগে উঠেছে। তার নটীর মতো বেলেল্লাপনায় প্রচণ্ড শব্দে গর্জে উঠলেন তিনি—'চুপ রহ্ বেয়াদপ।'

এমান একটা কঠোর শব্দ উচ্চারণ করবেন—তাঁর প্রিয়াকে—একথা আমি ভাবতেও পারিনি। তার নাটুকে ভালবাসার মুখে এমন চাবুকের কষাঘাত মেরে জানিয়ে দিলেন সহ্যের সীমা শেষ হয়ে গেছে।

খানিক নিঃস্তব্ধতার পর যমুনার নাকে কান্না শুরু হয়ে গেল।

—'আমার স্বাধীনতা বলে কিছু নেই?'

—'না-নেই।' আমি সরে এলাম আমার ঘরের দরজার কাছে। তারপর মনে হলো যেন একটা ধস্তাধস্তি হচ্ছে ওঘরে। ছুটে গেলুম আবার জানলার পাশে। যমুনার শাড়িটা মাটিতে পড়ে আছে ব্লাউজটা বোধহয় ছেঁড়া হয়েছে, গালে এক পোঁচ কালি লেপে দেওয়া হয়েছে। আমি আর দাঁড়াতে পারিনি। আমার হাত পা থর থর করে কাঁপতে লাগল। কোনোমতে ঘরে এসে বসে পড়লুম।

কিন্তু ঝগড়াটা যেমন চড়া পর্দায় উঠেছিল তেমন রইল না। সন্ধে পর্যন্ত সারে-গা-মার মতো ওঠানামা করতে লাগল। আমি আর ও-ঘরে গেলুম না। সন্ধে না হতেই মামণির হাতে চায়ের কেট্‌লি ও দুটি কাপ পাঠিয়ে বললাম—'এগুলো দিয়ে এসে বিস্কুট দিয়ে আসবে।' পাঁচ বছরে পা দিয়েছে 'মণি'। ওকেও কাজে লাগালুম। আসলে

ওদের সামনে যেতে আমারই লজ্জা হচ্ছিল। মামণি ফিরে এলে চুপি চুপি বললুম—'কে নিয়েছে তোমার হাত থেকে।' ও কৃতার্থের হাসি হেসে বললে—'বাবু।' বুঝলুম নাটক এখনো চলবে। মামণিকে আবার পাঠালুম—ও-ঘর থেকে হ্যারিকেন আনতে। চিমান মুছে তেল ভরে আলো জ্বালিয়ে ওকে দিয়েই পাঠিয়ে দিলুম ও-ঘরে। ফিরে এলে পুনরায় বললুম—'তোর বাবু আর পিসি চা খেয়েছে দেখলি?' মামণি যেন বুঝতে পেরেছে একটা কিছু ঘটে গিয়েছে যার দরুন আমি ওকে চুপিচুপি কথা বলছি। ও তেমনি চুপি চুপি বললে—'না মা, খায়নি মাসি। সন্ধ্যাদীপ ধুনো চারিদিক দেখিয়ে এসে ওকে পড়তে বসিয়ে আবার দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়ালুম। মনে মনে ভাবছিলুম কোনোমতে দিনের খাওয়াটা হয়ে গেছিল ভাগ্যিস, নইলে কারো খাওয়া হতো না। রাতের খাওয়া হবে কিনা বলা যায় না। এমনি সব সাংসারিক চিন্তা-ভাবনা করছিলুম। হঠাৎ কানে এল। স্বামী বলছেন—'তুমি পরিষ্কার জেনে রেখো—আমি আমার পারিবারিক জীবনে কলুষতা ঢুকতে দেব না। তোমার-আমার প্রেম যত মহানই হোক—পারিবারিক জীবনে শৃঙ্খলা, সম্মান ও পবিত্রতা—এর চেয়ে ঢের বেশী মহান্।' তার কণ্ঠে এতই দৃঢ়তা ছিল যে, যে-কেউ কথাগুলো শুনলে বুঝতে পারবে যে এ ব্যাপারে তিনি আপোসের তিলমাত্র জায়গাও রাখেননি। একদিন যমুনা সম্পর্কে তিনি যে তাঁর তাত্ত্বিক দর্শনের যুক্তি খাড়া করেছিলেন—তার সঙ্গে তাঁর এই গোঁড়ামির কোনো মিলই আমি খুঁজে পেলাম না। কী আশ্চর্য এই বুদ্ধিজীবী মানসিকতা!

আসল কথা কি জানেন? আপনাদের-পুরুষদের মধ্যেই নারী সংক্রান্ত অন্ধ সংস্কার অনড় পাথরের যে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে চেপে বসে আছে, আপনারা শিক্ষাদীক্ষায় যতই মার্জিত হোন না কেন, যতই থিওরীটিক্যাল যুক্তি আওড়ান না কেন, সেলফ পয়েন্ট থেকে একচুলও সরতে রাজী নন। সেজন্যেই প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা-আদর-সোহাগ শব্দগুলো—সাহিত্যের অলংকার ছাড়া কিছুই নয় রূঢ় বাস্তবে। আপনারা নারীর নির্ভেজাল আত্মসমর্পণ ছাড়া কিছুই বোঝেন না।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না শেষ করে ক্ষুব্ধ স্বরে যমুনা বলছিল—'তোমাদের সমাজে পুরুষদের বেলায় ব্যক্তি স্বাধীনতার কোনো মাপকাঠি নেই। যত দোষ শুধু মেয়েদের বেলায়। তুমি আবার নিজেকে প্রগতিবাদী বলে দাবী করো? ছি!' যমুনা বোধহয় ধিক্কার দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল।

শত্রু হলেও মনে মনে সেদিন যমুনাকে বাহ্‌বা দিয়েছিলুম। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে যমুনাকে আরো কঠোর ভাষা উচ্চারণ করতে শুনেছিলুম—'এতদিন তোমাকে প্রতিভাদীপ্ত প্রগতির প্রতীক বলে মনে করেছিলুম—আজ দেখছি রাম শ্যাম যদু মধু থেকে কিছুমাত্র তফাৎ নয়। উপরটা শুধু নিকেল পালিশ। আঘাত লাগলেই আসল রূপ বেরিয়ে পড়ে।'

—'তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না'—স্বামীর কণ্ঠ খাদে নেমে এল। একটু থেমে

পুনরায় বলেছিলেন—'একটি কথা মনে রেখো, মেয়েরা এখনো পুরুষদের শিকারের বস্তু আর মেয়েরা এতই দুর্বল ও বোকা যে সেই শিকারী পুরুষদের মন নিয়ে খেলা করতে গিয়েই মরে।'

যমুনা ঋজু কণ্ঠে পালটা জবাব দিল—'তুমি বললে তর্ক করতে চাই না অথচ সেই তর্কই জুড়ে দিলে। আমি যদি বলি—প্রত্যেক পুরুষই মেয়েদের শিকারের একমাত্র নিশানা, পুরুষের জবরদস্তি ছাড়া নারীজীবন তৃপ্ত হয় না। তাহলে পুরুষকে ভয় করবে কেন? মেয়েরা কখনো পুরুষদের ভয় করে না। ভয় করে সে তোমাদের বিধানকে, ভণ্ডামীকে, অবিচারকে—কারণ সমস্ত সম্পদের মালিক তোমরাই।'

আমি কখন উঠোন পেরিয়ে ওদের ঝগড়া শোনার জন্যে দরজার পাশে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলুম মনে নেই, কিন্তু যমুনার তীক্ষ্ণ বাণে জর্জরিত স্বামীর নিরুত্তর মুখখানি দেখতে কেমন দেখাচ্ছিল কপাটের ফাঁক দিয়ে দেখতে চেষ্টা করছিলুম। দেখা গেল না। অনুমান করলুম—তাঁর মুখখানি বিবর্ণ। তিনি যে ক্রমশ হেরে যাচ্ছিলেন—যমুনার একটা তুচ্ছ কথার জবাব দিতে গিয়েই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তিনি হেরে যাচ্ছেন। বলছিলেন—'প্রগতি কথাটি মানুষ একদা যে অর্থে ব্যবহার করেছিল আজ সে অর্থে ব্যবহার করছে না। যেদিন নারীর হাতে সামাজিক কর্তৃত্ব ছিল সেদিন তার স্বাধীনতা ও প্রগতি যে অর্থে বোঝাত—আজ কি সেই অর্থে নারীর স্বাধীনতা প্রগতি বোঝাবে? আজ পুরুষের হাতে সামাজিক কর্তৃত্ব। তাই তাদের স্বার্থের স্বাধীনতায়, প্রগতি ব্যবহৃত হবে, এতে 'ছিঃ' বলার অবকাশ কোথায়? আমি কর্তা, এটা আমার আদেশ। অমান্য করলেই শাস্তি পেতে হবে। এর মধ্যে কোনো কিন্তু নেই।' স্বামী ঝড়ের মতো তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থন করে যা বললেন, যমুনা তার সবটা শুনেছে কিনা জানি না—কিন্তু শেষের দুটি লাইন যে মনোযোগ দিয়ে শুনেছে তার মধ্যে ভুল নেই। কারণ—'বেশ তাই হবে' বলে সে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এসে এ-ঘরে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে কেঁপে কেঁপে কাঁদতে লাগল।

আগেই বুঝেছিলুম এ বেলায় খাওয়ার পাট থাকবে না। তবে দুটো পরোটা আলু ভাজা নিয়ে গেলুম ও-ঘরে। সঙ্গে সঙ্গেই স্বামী জানিয়ে দিলেন—'কিচ্ছু না—কিচ্ছু খাব না।' দুপুরের যে কটা ভাত হাঁড়িতে ছিল—তাই গরম করে মেয়েটাকে দুধ-ভাত মেখে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে নিজের বই নিয়ে পড়তে বসলুম। কিন্তু মন কিছুতেই বইয়ের পড়ায় কান দিচ্ছিল না। কেবলই ওদের তর্কগুলি মাথার মধ্যে কিলবিল করছিল। মাঝে মাঝে আমার এমনও মনে হয়েছে—মচকাচ্ছে—ভাঙছে না তো। অথচ প্রতি মুহূর্তেই মনে হয়েছিল এই বুঝি ভেঙে যায়, এই বুঝি না ভেঙে যাচ্ছে না। কিছুক্ষণ বই উলটে-পালটেও যখন মনকে পাঠেচ্ছু করতে পারলুম না তখন বাধ্য হয়েই বিছানায় গিয়ে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লুম।

যমুনার কাঁপা কাঁপা কান্না তখনো থামেনি। ওর জন্যে এখন আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। কেন যে ওর জন্যে আমার মনটা নরম হয়ে গিয়েছিল জানি না। বিছানায়

শুয়ে শুয়ে হঠাৎ হঠাৎ আমার মনে হযেছিল—যমুনা যেন সবার—সব নারীর হয়ে সে লড়াই করেছে। এ জন্যে তার সমস্ত অপরাধই ক্ষমা করা যেতে পারে। আস্তে আস্তে ওকে ডাকলাম—'যমুনা।' কান্নাই চলছে। 'যমুনা। যমুনা।' কান্না থামিয়ে চুপ করে রইলো সে। বললাম—'কিছু না খেলে যে ঘুম আসছে না যমুনা।' যমুনা আঁচলে বোধহয় নাক চোখ মুছে ভাঙা ভাঙা গলায় বললে—'তুমি গিয়ে খাও দিদি, আমি খাব না।'

—'তা কি হয়? তোমরা দু'ঘরে দু'জন না খেয়ে উপোস দিয়ে থাকবে আমি খাবো—এটা কি পারি যমুনা।' 'যমুনা কাকুতি মিনতি করে জানালো—সে খাবে না।' কাজেই অনাহারে আমিও নিদ্রাহীন চোখে আকাশ-পাতাল ভাবনার সঙ্গে একথাও ভাবছিলুম—এই হচ্ছে মানুষ-মানুষীর প্রেম।

কত রাত জেগেছিলুম জানি না। যখন ঘুম ভাঙলো তখন বেলা হয়ে গেছে। যমুনা বিছানায় নেই। আলনার দিকে তাকিয়ে বুঝলুম সে চলে যায়নি। বাথরুমে মুখ ধুতে গিয়ে দেখি যমুনা ভেতর থেকে বন্ধ করে চান করচে। যখন বেরুল ভিজে কাপড় গায়ে জড়িয়ে তখন তাকে আশ্রমবাসী ঋষিকন্যার মতো পবিত্র মনে হয়েছিল। সে যে ইতিপূর্বে শ্যামবাবুর সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর মতো অবৈধভাবে জীবন-যাপন করেছে সেকথা ভুলেও মনে হলো না। বরং উলটোটাই মনে হয়েছিল। এখন সে কুমারীই আছে। তার দুধের বোঁটা কাল বলেই সে গর্ভবতী হয়েছিল এরই বা কোন্ বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তি আছে? আর তর্কের খাতিরে যদি ধরেই নিই তাহলেও বলব এতে তার কোনো অপরাধ নেই—কেন না এটা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও ঘটতে পারে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে যদি না হতো, তা হলে সে মা হওয়ার গৌরব থেকে নিজেকে বঞ্চিত করত না। জগতে বিবাহের পূর্বে বহু নারী মা হয়েছেন এবং তাদের সেই তথাকথিত অবৈধ সন্তানেরা জগতে অনেক অক্ষয় কীর্তিও রেখে গেছেন।

* * *

সদ্যস্নাতা যমুনাকে দেখে আমার মনে কেন যে এতগুলি কথা আলোচিত হয়েছিল জানি না। কেবলই আমার মনে হয়েছিল—তার বিরুদ্ধে আমার স্বামী যে অভিযোগ এনে কঠোর শাস্তি বিধান করেছেন এটা ঠিক হয়নি। কারণ সে তাঁর জন্যই সব করে চলেছে বলে তিনি বহুদিন বলেছেন। আর নিয়ম শৃঙ্খলার কথা? তা তো অন্য ভাবেও করতে পারত। এই তো এই মুহূর্তেই তো যমুনার টাকা নাহলে চলবে না। ঘরে যে সব বাড়-বাড়ন্ত। আমি তাড়াতাড়ি সকালের জলখাবার তৈরী করে ওকে ডাকলুম। এবং তার মাস্টারমশায়ের চা ও লুচি ও-ঘরে দিয়ে আসতে বললুম। সে বললে—'আমি আর ও-ঘরে যাব না, তুমি গিয়ে দিয়ে এস। নইলে মামণিকে দিয়ে পাঠিয়ে দাও।'

যমুনার যেন কিছুই হয়নি—এমন ভাব দেখিয়ে বাজারের ব্যাগ নিয়ে চলে গেল। তার জলখাবার স্পর্শও করল না—পড়ে রইল। কী আর বলব। না খেয়ে থাকাটা

আমাদের বাড়ির একটা রোগ। কোনোকিছু হলেই খাওয়া বন্ধ। আর সবই ঠিক চলবে।

কালকে যে পরিস্থিতি তৈরী হয়েছিল তাতে আমার মনে আশংকা ছিল যে যমুনা চলে যাবে। আজ বাজার করতে যাওয়ায় ভাবলাম—না ঠিকই আছে। না, যাবে কেন? সে এতো অবিবেচক নয়। সে জানে যে চলে গেলে এ সংসারটা একেবারে অচল হয়ে যাবে। উনি তো 'ঘরবৈঠকা' হয়ে পড়েছেন। ঘরে বসেই ছড়ি ঘুরাচ্ছিলেন। পুরুষ মানুষ এমন হলে চলে না। শরীর খারাপ হয়েছে ডাক্তার দেখাও, ওষুধ খাও। না তা-না কেবল শুয়ে বসে কাটানো। আমার একদম ভাল লাগে না।

দশটা সাড়ে-দশটা বাজতেই যমুনা বের হয়ে গেল। খেয়ে যেতে বললে সে বললে—'আসছি এক্ষুণি।' কিন্তু সে এল না।

যাবার সময় একবার ও-ঘরে উঁকি মেরেও দেখল না। তার ভালবাসার মানুষটা যে কাল থেকে কিছু খায়নি—এ খবর সে একবারও নিল না।

আমি দুপুরে চান করতে যাবার কথা বলতে গিয়ে দেখি সকালের খাবার এমনকি চা-ও পড়ে রয়েছে। আমি মনে মনে প্রমাদ গুণলাম। এখন আমার মুখেও অন্ন ওঠার পথ বন্ধ হয়ে গেল। গান্ধীজী যে কী মন্ত্র দিয়ে গেছেন এই স্বদেশীওয়ালাদের—আমার ভীষণ খারাপ লাগে। 'কী হলো খেলে না যে। যমুনাকে তো বিদেয় দিয়েচ—তা হ'লে কার ওপর রাগ করে খাবে না?' তিনি নির্লিপ্ত চোখে আমার মুখের দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে মুখ নামিয়ে নিলেন। কিছু বললেন না। আমি পুনঃপুন চান করতে যাওয়ার জেদ ধরলে—শুধু একটি কথা 'আমায় বিরক্ত কর না' বলে আমাকে বিদেয় করলেন। যমুনা দুটো বাজার আগেই ফিরে এল। বললে সে খাবে না—তারপর শাড়ি ব্লাউজ পালটে ছাত্রী পড়ানোর জন্য যথারীতি বের হয়ে গেলে—আমি পথ আগলে বাধা দিয়ে বলেছিলুম—'তুমি না খেলে উনি খাবেন না। উনি না খেলে আমিও খেতে পারি না। তোমরা যদি খাওয়া নিয়ে এমন করো তাহ'লে আমি কেমন করে থাকি বল।' সে বললে—'দুঃখিত।' তারপর কপাট ঠেলে চলে গেল। মনে মনে তার ওপর ক্ষুব্ধ হলুম। দু-দু'টা মানুষ কাল রাত থেকে অভুক্ত। সে বললে—'সেজন্য সে দুঃখিত!' এটা কি ভালবাসার কথা হলো! আমি তো আজ তার সঙ্গে কোন খারাপ ব্যবহার করিনি—তার অতবড় অপরাধ মার্জনা করে ছোট বোনের মতো ব্যবহার করছিলুম। ও-ঘরে গিয়ে দেখলুম তিনি ধনুভাঙার পণ নিয়ে বিছানায় পড়ে আছেন। বিরক্ত হবেন বলে ইতস্তত করছিলুম। শেষে বললুম—'যমুনা বোধ হয় বাইরে কোথাও খেয়েছে। বললে তো, তার জন্যে ভাবতে হবে না ঘরে সে খাবে না।' সত্য মিথ্যে মিলিয়ে বললুম। কিন্তু তিনি তথৈবচ। কি আর করব পেটে আগুন জ্বলছে। কয়েকটি চাল চিবিয়ে এক ঘটি জল খেয়ে পেট ভরালুম।

ও'র ঘরটা ক'দিন ধরেই যেন বিষণ্ণ মৌনতায় আচ্ছন্ন হয়ে ছিল। আজ সারা দিনটা যেন আরো বিস্বাদ লাগছিল। কাল সন্ধের পর থেকে যেন প্রাণহীন দেহের

অখণ্ড নিস্তব্ধতা। কবিতা পাঠ নেই। বন্ধু-বান্ধবী নেই। কবি শ্রেণীর লীলা-চাঞ্চল্যের আনাগোনা নেই। বিরহ-মিলনের তরঙ্গহিল্লোল নেই। কাব্যবীণার ঝংকার নিভৃতে নীরব। আর ঐ নীরব বিষণ্ণের ছোঁয়া লেগে সমস্ত বাড়িটাই যেন থমথমে হয়ে আছে। আমার মনের গভীরে সেই কবে থেকে এক অজ্ঞাত শংকা মাঝে মাঝেই উঁকি দেয়—কী জানি কখন কী হয় কে জানে? সূর্য অস্ত যাওয়ার আগে যে রোদটুকু গাছের ডগায় ছিল তাকেও যেন ক্রমেই বিষণ্ণতায় ঢেকে ফেলছিল। কী যেন একটা বিচ্ছিন্ন ব্যবধান ক্রমেই বিরাট হাঁ করে বাড়িটাকে গ্রাস করতে আসছে। তাকে প্রতিরোধ করার আমার সমস্ত শক্তিই যেন নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। ক্ষুধা তৃষ্ণা মরে গিয়েছে। শুধু একটা রিক্ত বিস্বাদ ভয়ে ভয়ে এ বাড়িতে প্রবেশ করছে। একটা মারাত্মক পরিণতি ছাড়া যেন এর নিষ্কৃতি নেই।

যমুনা ফিরে এল ঠিক সময়েই। আমি ঘড়ি দেখলুম—আটা দশ তখনো হয়নি। যাক্, মনে মনে স্বস্তিবোধ করলুম। কাপড়-জামা ছেড়ে হাত-মুখ ধুয়ে যমুনা ঘরে আসতেই বললুম—'চল, রান্নাঘরে সবাই এক সঙ্গে বসে খাব।' সে আমার মুখের পানে কয়েক পলক চেয়ে থেকে বললে—'না আমি খাব না। শুতে দিয়েছ এই ঢের। আমার তো এ বাড়িতে থাকার কথা নয়। আমার উপর তোমার কৃপা আছে বলেই আর কটা দিন থাকব। শুধু আসব।' বলতে বলতে তার দু'চোখ জলে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেল। প্রত্যাখানের আঘাত কী যে কঠিন আমি তা জানি। আর জানি বলেই যমুনার হৃদয়যন্ত্রণাকে অনুভব করতে পেরেছিলুম। দাঁড়াতে পারলুম না ওর সামনে। সরে এলুম। ওর যন্ত্রণা আমার চোখে জল এনে দিল।

রাত্রিটা কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশীর রাত। চারদিক অন্ধকারে ডুবে আছে। তল্লাটের অনেক রাস্তায় অনেক বাড়িতে আলো আসেনি। এ নতুন পল্লীর অনেক প্লটই ফাঁকা পড়ে রয়েছে। কয়েকটি বাড়ি আধখেচড়া তৈরী হয়ে পড়ে আছে। এ জন্যে এখানে অন্ধকার রাতটা আরো বেশী অন্ধকার বলে মনে হয়। আশে-পাশের দু-চারটা বাড়ির লোকেরা এই শীত শীত রাতের অন্ধকারকে ভয় পায় বলেই যেন সকাল সকাল ঘরের দরজা বন্ধ করে বিছানা নেয়। আমাদের বাড়িটাই ব্যতিক্রম। যমুনা দেরীতে ফেরে বলেই আমরা অনেক রাত অবধি জেগে থাকি। আগে তার মাস্টারমশাইও বেশী রাতে ফিরতেন। কিন্তু সেদিন যমুনা রাত আটটায় বাড়ি ফিরে এলে ভেবেছিলুম তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়ব। কাল রাতে তো কারোরই ঘুম হয়নি। কিন্তু মানুষের দুর্মতি যখন পিছু নেয় তখন কি শান্ত স্বস্তি জায়গা পায়? পড়ার টেবিলে বসে বসে বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছিলুম। হঠাৎ মনে হলো অনেক সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—যা-ই হোক না কেন পরীক্ষার পড়া তৈরী করতে হবেই। চোখ ঘুরিয়ে বইয়ের পাতায় নিয়ে এলুম। কিন্তু মন দিতে পারছিলুম না। একবার যমুনার দিকে চোখ তুলে তাকালুম। সে বিছানায় ঘুমন্ত

মামণির চুলগুলি আঙ্গুল দিয়ে চালনা চেলে দিচ্ছিল। আমার মনে হলো সন্তানহীনা রমণীর স্নেহ এমনি করেই ঝরে পড়ে। আমার বেশ ভাল লাগছিল। অকস্মাৎ ভারী পায়ের শব্দ শুনে চমকে দেখি—আমার স্বামী। তার এই অকস্মাৎ আগমনে আমার ভেতরটা কেন কেঁপে উঠল বুঝতে পারিনি। তাঁর নিজের বাড়ি, নিজের ঘর—তবু তাকে সাড়া না দিয়ে কোনো দিন এ ঘরে ঢুকতে দেখিনি। যমুনা যেমন ছিল তেমনই রইল। তিনি কিছুক্ষণ যমুনার দিকে চুপ করে চেয়ে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে শান্ত স্বরে বললেন—'আমাকে না খাইয়ে রেখে কী শাস্তি পাচ্ছ—তাই জিজ্ঞেস করছি তোমাকে?' যমুনা যেন প্রথমে কথাটা বুঝতেই পারেনি—তেমনি উক্তি করল—'আমাকে বলচেন?' 'ভিক্ষুকের মতো তোমার কাছেই দাঁড়িয়ে যখন কথা বলছি—তখন ওকথা বলে কি লাভ? সোজা বল কি শান্তি পাচ্ছ তুমি?' স্বামী গাঢ় স্বরে কথাগুলি বললেন তাকে।

—'তার যখন ছিঁড়ে গেছে তখন এ প্রশ্ন অবান্তর নয় কি?' যমুনা তেমনি নিলিপ্ত কণ্ঠে ধীরে ধীরে কথা কয়টি বলল।

—'তার, কিসের তার?' ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন স্বামী। যমুনা এবার মুখ তুলে তাকিয়ে বললে—'স্নেহের ভালবাসার তার।'

তিনি মৃদু হেসে বললেন—'ভালবাসার তার কি এত সহজেই ছিঁড়ে যায় যমুনা!' যমুনার মুখে হাসির লেশমাত্র নেই। বললে—'পুরুষদের বিচারে এটা সহজ। নারীর বিচারে এটা মর্মান্তিক।'

—'ছেঁড়া তার কি জোড়া লাগানো যায় না?'

—'হয়তো যায়—তবে সুর আর তেমন করে বাজবে না। জোড়া দিয়ে যদি সুর আর নাই বাজে তবে লোক দেখানোর জোড়া কি প্রয়োজন আছে—আমি জানি না।'

কথা কয়টি বলার সময় যমুনার গলাটা যেন বেশ ভার ভার মনে হয়েছিল। যেন খুব কষ্টে কথা কয়টি উচ্চারণ করেছিল। আমার স্বামী আমারই সামনে হঠাৎ নতজানু হওয়ার মতো হয়ে আবেগে শিশুর মতো ভেঙে পড়ে ওর হাত চেপে ধরে বললেন—'আমার ভালবাসাকে যদি অস্বীকার করতে চাও কর কিন্তু অশ্রদ্ধা কর না, যমুনা।' যমুনা উঠে বসে গ্রীবা বাঁকিয়ে দৃঢ়স্বরে বললে—'যে সম্পর্ক কাল রাত্রে আপনি নিজের হাতে ছিন্ন করে দিয়েছেন তার জন্যে এই আকুতি কেন নীলাঞ্জনবাবু?'

তিনি যেন তাড়িতাঘাতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন—'সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছি? আমি?'

—'হ্যাঁ আপনি। ওটা তারের সম্পর্ক বলেই ছিন্ন হয়ে গেছে, রক্তের সম্পর্ক হলে ছিন্ন হতো না।'

—'এ জন্যে দায়ী কে?' স্বামী প্রশ্ন করলেন।

—দায়ী আপনি।' যমুনা দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিল।

—'দায়ী যদি আমি হতুম তা'হলে যেমন তুমি ইডেন গার্ডেনে ঘাসের গালিচায়

গা এলিয়ে আকাশের দিকে চোখ রেখে বলেছিল—আমি সব দিতে পারি—পারি না শুধু মন। সেদিনই আমার বিশ্বাস ভেঙে যাওয়া উচিত ছিল।' বললেন আমার স্বামী।

—'প্রথমে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে যে পরে ফিরিয়ে নেয়—জগতে কোন্ হতভাগিনী আছে তবুও তাঁকে দেহ ও মন দিয়ে ভালবাসা দেবে?' কথাগুলো বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়ল যমুনা। 'আমি তোমাকে কী দিইনি! আমাকে রিক্ত করে, নিঃস্ব করে দিয়ে আজ তাড়িয়ে দিয়েছ—আবার এসেছ না কি করতে?' বলে যমুনা আবার মুখে কাপড় চাপা দিয়ে কাঁদতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে সে আরো বললে—'ভালবেসেছি বলে মরেছি। এ জন্যে সারাজীবন দুঃখ ভোগ করে যেতে হবে, তাই বলে আত্মসম্মান খুইয়ে মিথ্যে অপবাদ মাথায় নিয়ে তোমার পায়ের কাছে পড়ে থাকব না আমি।' কিছু ক্ষোভ, কিছু ক্রোধ, কিছু গ্লানি তার দেহ-মনে মিশে এক অদ্ভুত কণ্ঠস্বরে উচ্চারিত হলো যমুনার কথাগুলো।

স্বামী সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যমুনার কান্নায় ভেঙেপড়া ক্ষত বিক্ষত ও কম্পিত দেহটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে রূঢ়ভাবে বললেন—'মিথ্যে অপবাদ! যে শনিবার শত বাধা নিষেধ সত্ত্বেও বাড়ি যাবার নাম করে পূরবী সিনেমার সামনে তোমার দ্বিতীয় স্বামী শ্যামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে শ্যামের বন্ধুর সঙ্গে প্যাভেল হোটেলে রাত্রিবাস করতে গেলে সেটাও কি মিথ্যে অপবাদ?'

যমুনা পলকে কান্না ভুলে নাগিনীর মতো ফণা তুলল—'কী বললে? কি বললে তুমি? হোটেলে—আমি হোটেলে রাত্রিবাস করেছিলাম?' স্বামী সহস্রাক্ষ হয়ে উঠে বললেন—'শুধু রাত্রিবাস করনি, এক শয্যায় শুয়ে মধু যামিনীও উদ্‌যাপন করেছ—এ ফটোটা কি তার নিদর্শন নয়?' বলে পকেট থেকে একটা ফটো তার কোলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। পাদুটো আমার টলছিল, মাথা ঘুরছিল। যমুনা নিঃস্তব্ধ। আমি কী দেখছি। নিজেকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছি না। এ কি আমার চোখের সামনে কোন ঘটনা—না কোন বিয়োগান্ত নাটক!

নাটকের নায়ক-নায়িকার আকর্ষণীয় সংলাপ ও দৃশ্য। কখন যে আমি আমার পড়ার টেবিল থেকে সরে এসে প্রথম শ্রেণীর দর্শকের স্থানে দাঁড়িয়েছিলুম সে কথা মনে নেই। যমুনার কোলের ওপর ছুঁড়ে ফেলা ৩"×৪" সাইজের আলোকচিত্রটি দেখে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেল। সম্পূর্ণ উলঙ্গ আলিঙ্গনবদ্ধ যমুনা ও তার দ্বিতীয় স্বামীর বন্ধু। নোংরামীর এমন জাজ্বল্যমান প্রমাণ থাকায় প্রথমটা আমি বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলুম। এ-ও কি সম্ভব? আলোকচিত্রের যথার্থতা সম্পর্কে একটু উপুর হয়ে দেখতে গিয়েই স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। মনে হল পৃথিবীটা যেন দুলছে। ঘৃণা—ঘৃণা! ঘরের বাতাসটুকু বুঝি ঘৃণায় লজ্জায় আমার মতো স্তম্ভিত হয়ে কুঁকড়ে গিয়েছিল। যমুনাই কি না অন্য কেউ ভাল করে ফটোটা দেখার জন্য হ্যারিকেনটা তুলে ধরে আহাম্মুকের মতো যমুনার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। কাল থেকে আমি

ওর কথা শুনে, যুক্তি শুনে মনে মনে যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছিলুম—এখন সেজন্যে অনুশোচনা হচ্ছে। আমার লজ্জা হচ্ছে এজন্যে যে ভেবেছিলাম ওকে আমি চিনেছি। ও সত্যি নিষ্পাপ। ওকে আজ সকালে ঋষিকন্যার পবিত্রতা দিয়ে বিচার করেছিলুম। ছিঃ, আমি একটা আহম্মক নয়? সেই মুহূর্তে মনে হয়েছে কাল রাত্রে আমার স্বামী ওকে যে বলেছিলেন—তোমার আমার প্রেম যতই মহান হোক তার চেয়ে ঢের বেশী মহান আমার পারিবারিক পবিত্রতা। তাকে আমি কলুষিত হতে কিছুতেই দেব না। এখন সে কথার তাৎপর্য বুঝে স্বামীর প্রতি আমার শ্রদ্ধায় ভক্তিতে মাথাটা আপনিই নুইয়ে এলো।

যমুনার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বারে বারেই সেই কদর্য চিত্রটা চোখে ভেসে ওঠায় আমি ধীরে ধীরে ওখান থেকে নিজেকে সরিয়ে রান্নাঘরে নিয়ে এলুম। ঐ কদর্য চিত্রটা দেখে আমার মনে এমন প্রতিক্রিয়া হয়েছিল যে কতক্ষণ আমি রান্নাঘরের কপাটে ঠেস দিয়ে ছিলুম মনে নেই। আমার যে কোন হুঁশ ছিল সেকথাও মনে নেই। মনের এমনই অবস্থা হয়েছিল যে একটু 'ছিঃ' বলার শক্তি ও প্রবৃত্তি কোনটাই ছিল না।

—'তোমার আর কিছু বলার আছে?' বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে স্বামী প্রশ্ন করলেন যমুনাকে। শুনে আমি চমকে উঠেছিলুম। রান্নাঘর থেকে বের হয়ে এ-ঘরে এলুম। যমুনা দ্বিধাহীন ঋজু কণ্ঠে উত্তর দিল—'আছে।' আমি বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলুম। এরপরও বলার থাকে! আমি উৎকর্ণ হয়ে রইলাম। এক লহমাও বিলম্ব নয়। যমুনা আরো ঋজু কণ্ঠে জবাব দিল—'তোমার সংস্রব থেকে আমি চিরদিনের মত চলে যেতে চাই।'

—'তোমাকে ধন্যবাদ। আর ঘৃণা প্রকাশ করে তোমাকে যে তাড়িয়ে দিতে হল না, তোমার এ সিদ্ধান্তে নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করেছি।' স্বামীর কণ্ঠে কোন জড়তা নেই। নিরর্থক একটা নিশ্চিত দুর্ঘটনা যেন স্বচ্ছন্দে এড়িয়ে গেলেন এমনি স্পষ্ট উচ্চারণ করলেন তিনি। যমুনা ক্ষিপ্র হস্তে তার কিছু টুকিটাকি জিনিসপত্র কাগজে জড়িয়ে নিয়ে বাইরের দিকে পা দিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে—'তুমি যাকে দেখছ সে আমার কেউ নয়। কিন্তু যে আমার স্বামী হতে পারত, ঐ ভদ্রলোকের বন্ধু—অঢেল পয়সার মালিক। তোমার কাব্য সাহিত্যকে জগতের সমুখে প্রকাশের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন—তারই জন্যে চুক্তি করেছিলুম তার সঙ্গে। এই তার প্রথম কিস্তি'—বলে স্বামীর পায়ের কাছে এক বাণ্ডিল টাকা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হনহন করে বেরিয়ে গেল সে।

আমি বা আমার স্বামী একটি কথাও আর বলতে পারলুম না ওকে। বলতে পারলুম না—এত রাত করে কোথায় যাচ্ছ, কাল ভোরে গেলেই বা কি দোষের? কিছুই বলতে পারলুম না। সে যে কথা বলে ঐ নোটের তাড়া ফেলে দিয়ে চলে গেল—তা নিয়ে আর কোন বাদপ্রতিবাদের অবসরও দিল না যমুনা।

প্রায় তিন বছর আগে এমনি একদিন পেটের ক্ষুধা নিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে আমার সঙ্গী হয়ে সমস্ত দায় নিজের মাথায় স্বেচ্ছায় নিয়েছিল—আর তিন বছর বাদে সেই পেটে ক্ষুধা নিয়েই চলে গেল। আমার খুব খারাপ লাগছিল। কি হতে গিয়ে কি হয়ে গেল। এ যেন কোন অদৃশ্য ভবিতব্যের খেলা—যা আগেভাগে অনুমান করা যায় না। ঘটে গেলে মনে হয় এমনটাইতো ঘটা উচিত।

গত দুদিনের অনাহার ও মানসিক ধকলে দেহটা প্রায় চলচ্ছক্তিহীন হয়ে পড়েছিল। তবুও কর্তব্যের দায় বহন করতে বিছানা ছেড়ে চা ও বিস্কুট নিয়ে স্বামীকে দিতে গিয়ে দেখি খবরের কাগজটার ওপর তিনি উপুর হয়ে আছেন। আমি চা দিয়ে চলে আসছিলুম। তিনি ডেকে বললেন – 'দ্যাখো তো ছবিটা' বলে কাগজটার ফটো ছবিটি আঙ্গুল দিয়ে নির্দেশ করে দেখালেন। দেখলুম—একটি ট্রেন দুর্ঘটনার ছবি। ছবির নিচে লেখা রয়েছে শিয়ালদহের কাছে দুর্ঘটনায় অজ্ঞাতনামা যুবতীর রেলে কাটা দ্বিখণ্ডিত দেহ। দেখে চমকে উঠলাম। যমুনার ঊর্ধ্বাঙ্গ কেটে এক পাশে, নিম্নাঙ্গ ছিটকে অন্য পাশে পড়ে আছে। যমুনার মাথাভর্তি সেই চুল, সেই চোখ, সেই মুখ। মুখে কোন উদ্বেগ নেই, আতংক নেই। প্রশান্ত চোখে তাকিয়ে আছে। আমি আর সহ্য করতে পারলুম না। আর্তনাদ করে উঠলাম। স্বামীর দিকে চোখ পড়তেই দেখি তাঁর দু'চোখ জলে পূর্ণ।

এক মুহূর্ত দেরী না করে ড্রয়ার থেকে যমুনার দেহদানের টাকার সেই বাণ্ডিল নিয়ে তিনি ছুটে বের হয়ে গেলেন। অনাহারে ক্লিষ্ট দুর্বল মানুষটা কি করে যে তড়িৎবেগে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে গেল! ভয়ে ও বিস্ময়ে আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

শুনতে কেমন লাগছে বলুন তো? নাটকীয় নয় কি? আছে। আরো আছে। এই পোড়াকপালীর কেমন করে কপাল পুড়ল। কেমন করে ভাগ্যের শেষ পরিণতি বিস্ময়কর ট্রাজেডিতে সমাপ্ত হল তাও শুনুন। কিন্তু এখন একটা প্রশ্ন জেগেছে আমার মনে। যমুনা কাকে ভালোবেসেছিল? তার মাস্টারমশাইকে না মাস্টার-মশাইয়ের শিল্প চেতনাকে? এবং মাস্টারমশাইও কি তাই? মানুষকে বাদ দিয়ে তার আদর্শকে? হৃদয়ের এই সংঘাতময় বিচিত্র নাট্যরূপকে আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না। অথচ আমি সমস্ত ঘটনারই বলতে গেলে প্রত্যক্ষদর্শী। এটা আমার চৈতন্যের পক্ষেও কম ট্রাজিডি নয় কি?

এসব থাক।

যে কথা বলার বাকী আছে—তারপর কয়েকটা দিন থমথমে ভাব থাকলেও শেষ অবধি আহার নিদ্রা—যাকে বলে—সংসারধর্ম চলতে লাগল। কিন্তু বড় প্রাণান্তকর অবস্থায়। কারণ স্বামীদেবতা আর স্বাভাবিক হলেন না। সেদিন যে টাকাগুলো নিয়ে উদভ্রান্তের মত ছুটে গিয়েছিলেন ফিরেছিলেন সন্ধের পর। টাকাগুলো

কি করেছিলেন জানি না। জিজ্ঞেস করতেও সাহস পাইনি। তাঁর শরীর এমন হয়েছে যে তাঁকে টাকা পয়সা তো দূরের কথা—সংসারের কোন কিছুই বলতে সাহস পাচ্ছিলাম না। ঐ দুর্ঘটনার ফলে তিনি যে এতবড় আঘাত পাবেন এ আমি ভাবতেও পারিনি। আর ভাবলেই বা কী হত। দুর্ঘটনার কথা কেউ আগে জানতে পারে নাকি? দুর্ঘটনা তো দুর্ঘটনাই। কিন্তু সত্যিই কি দুর্ঘটনা—না আত্মহত্যা? যমুনা আত্মহত্যা করবে কেন? ভালোবাসার মর্যাদা পায়নি বলে—না ভালোবাসার মর্যাদা দেখাতে? আমার মনে নানা কথাই উঠেছিল। কিন্তু কোন কথারই মীমাংসা করতে পারিনি। হয়তো দুটোই সত্যি।

শুনেছিলাম জমি বিক্রীতে তার বাড়ি থেকে বাধা এসেছিল। জমি বিক্রী নিয়ে নাকি এমন অবস্থা হয়েছিল—যে তার পারিবারিক সম্পর্ক ছিন্ন করে এখানেই সে চিরদিনের ঠিকানা করতে চেয়েছিল। বিয়ের প্রস্তাবটা এই সূত্র থেকেই এসেছিল নাকি। এ নিয়েই মাঝে মাঝে তর্কবিতর্ক বেধে যেত। আমি যে কিছু শুনিনি তা নয়। কিন্তু ঠিক বুঝতে পারিনি। আমি তার সমস্যাটাকে এভাবে ভাবিনি। ভেবেছি—আমার স্বামীর উপর তার ভোগের লালসার কথা নিয়ে। বেলুড়ে যেদিন আমার স্বামী তার পূর্ব ইতিহাস জানা সত্ত্বেও তার পক্ষেই ওকালতি করলেন সেই থেকে আমার অন্যভাবে বিচার করার মানসিকতা থাকে কি? কিন্তু এখন যে ভাবনার কথা লিখছি—তাও যে সঠিক সেকথাও বলতে পারব না। আমি শুধু আমার মনের অবস্থাটা আপনাকে বোঝানর জন্যে এসব লিখলাম।

তাঁকে যদি প্রশ্ন করতে পারতুম—তিনি যদি বলতেন তবে হয়ত আমার মনে এ ধরনের স্পন্দন দেখা দিত না। কিন্তু তাঁকে বলার মতো অবস্থা নেই। আমার মনে হয়েছিল যমুনা কুলটা হয়েও সে বিজয়িনী। মেয়ে যে এতখানি কাণ্ড করে টাকা সংগ্রহ করেছিল—কারণ সে হয়ত মনে করেছিল সে যখন বিবাহিত নয় তখন এ কলঙ্কের কালি তাঁর মাস্টারমশাইয়ের পরিবারকে স্পর্শ করতে পারবে না। যদি করে তবে পিতা-মাতাকেই করবে। অন্যথায় সে নিজেই হবে একা কলঙ্কের ভাগিদার। সে মাঝে মাঝে একা একা গাইত—

> 'এ ধূপ না পোড়ালে—গন্ধ কিছু নাহি ঢালে—
> এ দীপ না জ্বালালে দেয় না কিছুই আলো।'

আমার মনে হচ্ছিল ধূপ পোড়ানোর ও দীপ জ্বালানোর প্রস্তুতি ঐ গানেই সে আগে থেকে প্রকাশ করে গেছে। আমরা বুঝিনি। তার মাস্টারমশাই-ও বুঝেছিলেন বলে মনে হয় না। আজ তার জন্যে তিনি ভেঙে পড়েছেন। এখন হয়তো তিনি বুঝেছেন যমুনা তাঁকে না যত ভালোবাসত তার ঢের বেশী ভালোবাসত তাঁর কাব্য-সাহিত্য-শিল্পসত্তাকে—যাকে প্রকাশ করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে চুক্তি করেছিল নারীমাংস লোভীদের সঙ্গে। কিন্তু শেষরক্ষা হল কই। তিনিই তা চূর্ণ করে দিয়েছেন। যমুনা যখন সমস্ত কথা ভেঙে বলে দিয়ে, টাকাগুলো ওর দিকে ছুঁড়ে ফেলে—সেই দুপুররাত্রে

একবস্ত্রে চলে গেল—তিনি কি বাধা দিতে পারতেন না? আসলে—নারী সম্পর্কে পুরুষদের অহমিকাই এজন্যে দায়ী। নারীর ওপর খবরদারি করার এই মানসিকতা যুগ যুগান্তের। আধুনিক সভ্যতায়ও এর কোন হেরফের ঘটেনি। আপনাদের কোন কোন শাস্ত্রকার নারীকে নরকের দ্বারও বলেছেন। কেউ কেউ এমন দাম্ভিক উক্তিও পুঁথিতে লিখে গেছেন 'পুত্রার্থে ভার্য্যা'। এতেই বোঝা যায় নারীর প্রতি পুরুষের দরদ কতখানি। এই হীন মতবাদ যে অলক্ষ্যে আজও সমাজে ক্রিয়াশীল তার প্রমাণ আজো কেউ ঐ দাম্ভিক উক্তিকে মুছে দিতে অগ্রণী হননি। পুরুষরা নারীকে উপভোগের সময়েই প্রিয়া বলে,—নিজের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যেই তার নামের পেছনে দেবী শব্দ ব্যবহার করে, বা অপরের কাছে অচ্ছ্যুত রাখার জন্যই তার বিশেষ মর্যাদার কথা ঘোষণা করে। যে দু'চারজন সাধক নারীকে নরকের দ্বার মনে না করে মাতৃরূপে বন্দনা করে গেছেন বা করছেন তারা সমাজ কাঠামোয় কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। যদি পারতেন তবে ধনী-নির্ধন শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল পুরুষের কাছেই যুগ-যুগান্ত ধরে সে নিগৃহীতা হত না। অপর দিকে দেখুন নারীর যুগ যুগান্তরের ইতিহাস। সে শুধু দিয়েই গেল—কন্যা হয়ে, মা-হয়ে। এমন কি বার্ধক্যে—যখন তার দৈহিক শক্তি থাকে না তখনও প্রতি মুহূর্তে স্বামী পুত্রের কল্যাণে ভগবানের কাছে তাদের কল্যাণ কামনা করে অশ্রুসিক্ত নয়নে প্রার্থনা জানায়। কত ক্লেশ, কত অবজ্ঞা, কত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা অবিচার-অপবাদ-অত্যাচার মুখ বুঝে সহ্য করে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে যায়—ইতিহাসে তার বড় একটা স্বীকৃতিও দেখা যায় না। কোন সাহিত্যিক, কোন কবি, কোন ফকির, কোন দরবেশ, কোন গায়ক, কোন কথক কর্তৃক লাঞ্ছিতা, নির্যাতিতা, অত্যাচারিতা নারীদের কথা কাহিনী লোকগাথায় উল্লিখিত হয়ে আছে মাত্র। তার বেশী নয়। নারীর সেবাযত্ন পরিচর্যার পুরুষরা চিরকালের হকদার—এমন একটা ধারণা সব দেশে সব সমাজে বিদ্যমান। এর বিচ্যুতি ঘটলেই শাস্তি। যমুনার পূর্ব ইতিহাস আমার স্বামী জানতেন না। এমন কথা মনে হয় না। যেটুকু জানতেন না—পূরবী সিনেমাহলের সামনে দাঁড়ানোর কথা—শ্যামের চিঠিতে জেনেছেন। তবু তাঁকে বলতে শুনেছি—যমুনাকে ছাড়া তার একদণ্ডও চলে না। যমুনার স্বাধীনতার দাবী তিনি সহ্য করতে পারেননি। তাকে নিয়ন্ত্রিত রেখে নিঙড়ে নিতে চেয়েছিলেন। সে এই নিয়ন্ত্রণ মেনে নিতে অস্বীকার করার দরুনই তাকে তিনি আমার সমুখে শাস্তি দিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। কিন্তু যমুনা শাস্তি মাথা পেতে নেয়নি—প্রত্যাঘাত করে উলটো শাস্তি দিয়ে তাঁকে আজ একেবারে অচল করে দিয়ে গেছে। তাই না?

অবস্থা এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে—স্বামীর ওপর ভরসা করার আর কিছুই নেই। কিভাবে এই তিনটি প্রাণীর সংসারের প্রাত্যহিক অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা হবে—সেকথা একা আমাকেই ভাবতে হচ্ছে। স্বামীর অবস্থা প্রথম দু'দিন তো পাথরের মত নিশ্চল নিস্তব্ধ। সেই যে বিছানা নিয়েছিলেন,—এক কাপ দুধ খাওয়ানোর

জন্যেও তুলতে পারিনি। না চান, না খাওয়া, না উঠে-বসা—কোন কিছুর মধ্যেই তিনি ছিলেন না। আগে থেকেই তো অনাহারে ছিলেন, তারপর আরো দু'দিন। একেবারে তাকাতে পারা যেত না। ওঁর দিকে তাকালেই আমার ভয় হত। কী জানি কি হয়। আঘাতের যন্ত্রণা, চরম আত্মগ্লানী। হত্যার দায়ে চরম অপরাধ বোধ এসব কারণেই নাকি মানুষের মস্তিষ্কের কোষে বিকৃতি দেখা দেয়। আমি আতঙ্কিত। দিবারাত্রি এ-ঘরেই থাকার ব্যবস্থা করলুম।

শুনে আপনি আশ্চর্য হবেন—সাড়ে চার বছরের মামণিই যেন বুঝে গেছে আমাদের বাড়িতে একটা বড় রকমের ঘটনা ঘটে গিয়েছে। তার বাবার অবস্থাটা তো চোখের সামনেই দেখছে—এ সময় যে যমুনা মাসীর একান্ত দরকার—একথাটা মামণির মনেও জেগেছে। সে বারবারই বলেছে। মাসী কোথায়? বাড়ি গিয়েছে? আমি মাথা নেড়ে বলেছি—'হ্যাঁ।' তার পরের প্রশ্ন, 'কবে আসবে? আসে না কেন?' বাবার শরীর যে এত খারাপ—তাকে কেন খবর দিই না সে প্রশ্নও সে করেছে। নির্লজ্জের মতো একটা কথা না বলে পারলুম না—আমার কিন্তু বারবারই সমীরবাবুর কথা মনে হয়েছে। এসময় সমীরবাবু কলকাতা থাকলে একটা পোস্টকার্ড লিখে জানালেও কাজ হত। তাঁর বন্ধুর যা অবস্থা এখুনি ডাক্তার না দেখালে, একটা বিপদ ঘটে যেতে কতক্ষণ। সমীরবাবু কি না এসে পারতেন? কিন্তু এ আমার আকাশ-কুসুম ভাবনা। স্বামীর এই অবস্থা দেখে এবং কোন প্রতিকারের উপায় না দেখে আমিও যেন কেমন হয়ে গেলুম। বারবারই চোখে জল এসে সব ঝাপসা হয়ে যেত। তাঁর মুখে এক ফোঁটা জল দিতে পারলেও নিজের মুখে ছাইপাশ কিছু দিতে পারতুম। যা কিছু সামান্য রান্না করতুম, তাও মেয়েকে খাইয়ে বাকিটা পরদিন ফেলে দিতে হত। আহার গেছে, ঘুম গেছে, রয়ে গেছে শুধু আতঙ্ক—ভয়।

দুর্ঘটনার তৃতীয় দিনে তিনি নিজেই উঠলেন। টলতে টলতে বাথরুমে গেলেন। মামণিকে বাথরুমের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখলাম, চান হয়ে গেলে যেন আমাকে ডাকে। কী জানি পড়ে যান যদি, একেই দুর্বল। আমি তাড়াতাড়ি এসে স্টোভ ধরিয়ে দু'মুঠো চাল আর দুটো আলু সেদ্ধ চড়িয়ে দিলুম। দুধ তখনো আসেনি। কাঁচা আনাজ বলতে ঘরে কিছু নেই। ঘি আছে, তাই দিয়ে দু-গ্রাস যদি খাওয়ানো যায়। এসব ভাবতে ভাবতে তিনবার উঁকি দিলাম বাথরুমের দিকে। তিনি অনেকক্ষণ ধরে চান করলেন। বের হয়ে এলে ধরতে গেলুম, বললেন—'ছুঁয়ো না।' আমি তো অবাক। ভিজে কাপড়েই তুলসী তলায় বসলেন। বললেন—'দুটো' তিল আর আতপ চাল দাও। আমার বিস্ময় কাটলো। বুঝলাম, তেরাত্রির শ্রাদ্ধ করবেন তুলসী তলায়। সব উপকরণ এনে দিলুম। এনে দিলুম কয়েকটি কাঞ্চন ফুল। প্রদীপ ও ধূপকাঠি জেলে দিলুম—তারপর আর থাকতে পারলাম না। কান্নায় বুক ভেঙে এল। কিন্তু এই কান্নাটা কেন এসেছিল আমার বলতে পারব না। তবে একথা মনে

আছে আমি মনে মনে যমুনাকে বলেছিলুম,—তুমি সার্থক যমুনা, তোমার আত্মদান সার্থক।

যে মানুষটাকে তাঁর মাতৃবিয়োগের পর কোনদিন আহ্নিক করতে দেখিনি—যে লোক ঘরে লক্ষ্মীর আসন বসাতে নিজের স্ত্রীকেও দেয়নি—সে লোক যদি অকস্মাৎ তুলসীতলায় তিল তুলসী গঙ্গাজল হাতে নিয়ে যমুনার পরকালের সদ্‌গতি কামনা করেন—তা'তে অবাক না হয়ে পারা যায় কি ?

কিন্তু নিরীশ্বরবাদীরাও কি দুর্বল মুহূর্তে ঈশ্বরবাদী হয়ে পড়েন ? না এটাও সংস্কার। থাক্, এসব কথা। সময় পেলে পরে প্রশ্ন করবো। আরো কয়েকদিন বাদে তিনি একটু যেন স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন। অর্থাৎ আগের মতো নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে বিছানায় নির্জীবের মতো পড়ে থাকা নয়। একটু ওঠা, একটু বসা, পায়চারি করা, প্রয়োজনীয় দু' একটা কথা বলা এবং দুবেলা দু'মুঠো খেয়ে খবরের কাগজ, মাসিকপত্র ইত্যাদি পড়া ও বিছানায় শুয়ে সময় কাটানো। কিন্তু আমার চলবে কি করে? কোথা থেকে হাট-বাজার আসবে ? মাস গেলে দোকান বাকীর টাকা—গোয়ালার টাকা কোত্থেকে আসবে ? যমুনা সরে গিয়ে একটা কাজের কাজ হয়েছে। নেশা করা—এমন কি সিগারেট খাওয়াও বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু মানুষটা যে 'থবুথবু' হয়ে গেল তার কি করা ! কোনও পথ আমার সামনে খোলা নেই। নিজের এমন কিছু নেই যা বন্ধক দিয়ে কয়েকটা টাকাও যোগাড় করতে পারি। চিনুদির দেওয়া হার,—সে-ও তো বাড়ি করার সময় গেছে।

ভেবেছিলাম, যাক্ যা হবার হয়ে গেছে। এবার আমার সোনার সংসার সুখে-শান্তিতে স্নিগ্ধতায়-পবিত্রতায় নিবিড় হয়ে উঠবে। নাইবা পেলাম স্বামীর সোহাগ-ভালোবাসা, নাইবা পেলাম বিলাস জীবনের উপকরণ—তিনি কৃপণের মতো যা' দিয়েছেন তাকেই প্রাপ্য বলে মাথায় ঠেকিয়ে মা কালীর আশীর্বাদ বলে মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু চরম অভাব অনটনে ঐ আত্মতুষ্টিকে মাথায় তুলে রাখতে পারলুম না।

যমুনার মীনা করা আংটীটা আমার কাছে রেখেছিল কিছুদিন আগে। বলেছিল এটা আমার বড় হয়, তুমি পর। পরে এক সময় ছোট করে নেব। তার অন্যান্য অনেক জিনিসের মতো এটাও আর নেয়নি। তার ব্যবহৃত অব্যবহৃত সবই এখন এ বাড়ির আলমারিতে, আলনায়, টেবিলে। নিতান্ত নিরুপায় হয়েই আংটীটা তুলে নিলাম আলমারি থেকে। এটাকে চক্রবর্তী গিন্নীর কাছে রেখে কটা টাকা এনে আপাতত কাজ চালানো যাক্। কিন্তু তা' আর করতে হল না। বাড়ি থেকে বের হব মনে করেছিলাম—অমনি সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। খুলে দেখি—দুই সুন্দরীকে নামিয়ে দিয়ে রিক্‌শা চলে যাচ্ছে। ওরা রিক্‌শার দিকেই মুখ করে দাঁড়িয়ে ছিল বলে চিনতে পারিনি। দরজা খোলার আওয়াজ পেয়ে ফিরে তাকাতে দেখি অনুরাধা ও তার সঙ্গিনী। দু'জনেই বিবাহিতা ও সুন্দরী। অনুরাধাকে চিনি। সেই যে তাঁর জন্ম-দিনে এসেছিল। অন্যজনকে চিনি না। কিন্তু সে অনুরাধার থেকে আরো বেশী

সুন্দরী—আরো তন্বী। নমস্কার বিনিময় করে নিয়ে এলাম ঘরে। অনুরাধাই কথা বললে—ওকে তো তুমি চেন না বৌদি। এ হচ্ছে আমার বন্ধু নিরুপমা। নিরুপমা নামটা যেন শুনেছি শুনেছি মনে হয়েছিল। আমার বিস্মিত চোখ দেখে অনুরাধা বললে—'তুমি ওকে চিনবে না বৌদি। নিলুদা চেনেন। নিলুদা কোথায় ?' বলে সে এদিক ওদিক তাকিয়ে মামণিকে আদর করে কাছে টেনে বললে—'বাবা কোথায় মামণি ?' মামণি আঙ্গুল তুলে দেখাল ও-ঘরে। আমি হাতপাখা ওদের হাতে তুলে দিয়ে বললুম—'একটু হাওয়া খেয়ে ঠাণ্ডা হও। তারপর সব কথা হবে।' বলে স্বামীকে গিয়ে বললুম ওদের কথা। উ ন তড়াক করে উঠে বসলেন। তাড়াতাড়ি একটা জামা পরে বললে—'এ ঘরে নিয়ে এস।'

ওদের নিয়ে আসতে হয়নি—ওরা আমার পেছন পেছনই এসেছিল। ঘরে ঢুকে দু'জনেই যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল। অনুরাধা তার হাতের মিষ্টির প্যাকেটটা আমার হাতে দিয়ে—'একি! একি চেহারা হয়েছে আপনার ?' বলে এগিয়ে গিয়ে তাঁর পাশে বসে পড়ল। আব নিরুপমা চোখের বাঁধভাঙা জল ঢাকতে মাথা নিচু করে রইল। আমি স্পষ্ট দেখলুম নিরুপমার চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা জল নাক বেয়ে, গাল বেয়ে মেঝেতে টপ্‌টপ্ করে পড়ল। স্বামী হা সমুখে অর্থহীন দৃষ্টি মেলে একবার একে একবার ওকে দেখছিলেন। আমি নিরুপমার অবস্থাটা বুঝতে পেরে তাকে ধরে নিয়ে জানালার পাশে পাতা চেয়ারে বসিয়ে বললুম—'তুমি এখানে বস ভাই।' অশ্রু সংবরণের সুযোগ দিলাম তাকে। 'একটু জুড়িয়ে নাও।'

আমার তুলনায় ওরা দু'জনেই রাজরানী। অলঙ্কারস্ত্র জবরজং কিছু একটা না থাকলেও সবই মানানসই! আমি তো নিরাভরণ। হাতে গলায় কিছু নেই। শুধু কানে দুটো ফুল। আর যমুনার আংটিটা বাঁ হাতের পেটফোলা মধ্যমাতে। নিরুপমা চোখের জল মুছে বার বারই আমাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছিল। আমার খুব অস্বস্তি লাগছিল বলে, চলে এলাম এ-ঘরে। চা-বিস্কুট ও ওদের আনা মিষ্টি দিয়েই আপ্যায়ন করলুম ওদের।

এ ক'টা দিন বাড়িটা যে থমথমিয়ে ছিল, ওদের আসায় তা যেন আস্তে আস্তে কেটে গিয়েছিল।

আমি যখন চা দিতে গেলাম তখনই স্বামীর আড়ষ্টতা অনেকটা কেটে গেছে তবু তাঁর চুল-দাড়ির ও ভাঙা স্বাস্থ্যের জন্য যথেষ্ট বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। তিনি খাটে বসা। ওরা ও'র মুখোমুখি চেয়ার টেনে বসে কথা বলছিল। আমি চায়ের ট্রে নামিয়ে রাখতেই অনুরাধা আমার হাতে একটা খোলা খাম দিয়ে বললে—'নাও, রাখ। এটাতে তোমার বাড়ি তৈরির হিসেব ও বাড়তি টাকা আছে—বলে আর একটা ক্যালেণ্ডারের মতো মোড়ানো কাগজ দিয়ে বললে—এটাতে 'বাড়ির প্ল্যান ও দলিল আছে। এগুলি সমীরবাবু যখন কলকাতা এসেছিলেন তখন ওর কাছে দিয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন—ও যেন এগুলি আমার কাছে বাগবাজারে পৌঁছে দেয়। আমি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিই যেন।

কিন্তু নানা কারণে ভাই আমি আসতে পারিনি। ইতিমধ্যে ওর বিয়ে হয়ে গেছে। শ্বশুরবাড়ি ভবানীপুরেই। পুজোয় বাইরে গেছল নিরুপমারা। ফিরে এসে দেখা করতে এসেছিল আমার সঙ্গে। বললুম—তোর জিনিস পেঁছে দিতে পারিনি। শ্বশুর-বাড়ির সবার মন রাখতে বাইরে বেরুতে হয়।' বলে নিজে ত্রুটি ঢাকলো। আমি হাতের কাগজ ও খাম দেখিয়ে বলেছিলাম উনি দেখেছেন ? ও মাথা নেড়ে জানাল দেখেছে। মুখে বললে, তোমার কাছে দিতে বললে। মনে মনে ভগবানকে সহস্র ধন্যবাদ দিলুম। একটি কপর্দকও ছিল না। মা ঠিক মিলিয়ে দেন। কৃতজ্ঞতায় সেই অদৃশ্য ভগবান ও মা জননীকে মনে মনে প্রণাম করে ওখান থেকে চলে এলাম।

খামটা খুলে দেখি—শ' দেড়েক টাকা রয়েছে। বাঁচা গেল। দশটা টাকা বার করে রেখে বাকীটা আলমারিতে রেখে দিলুম। একটু বাদে অনুরাধা এ-ঘরে এসে আমার সঙ্গে রান্নাঘরে একটা পিঁড়ি টেনে বসে 'ওদের দু'জনকে একান্তে কথা বলতে দিয়ে এলুম' বলে ও হাসল মুখ বুজেই। বললাম—'ওমা এখানে কেন ? ঘরে গিয়ে বস'—বলে অনুরাধাকে প্রায় টেনে নিয়ে এসে আমার ঘরে ওকে বসিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে জানতে চাইলুম নিরুপমার পরিচয়। অনুরাধা ততোধিক বিস্ময় প্রকাশ করে বললে—'সে কি তুমি জান না ? যমুনাদি বলেনি ?' 'তা সেদিন জানিনে বলে এখন জানতে দোষ কি ভাই।'—বিনয় করেই বললুম। অনুরাধা কী ভাবল জানি না। বললে—'দোষের কিছু নয়। নিরুপমা ও আমরা থাকতুম ভবানীপুরে, নিলুদারা থাকতেন কালীঘাটে আশ্রমে। চিন্ময়ীদেবী বলে একজন বিপ্লবী নেত্রী ঐ আশ্রম করেছিলেন দেশের ছেলে-মেয়েদের মানুষ করতে। আমরা তখন বেশ ছোট। সেই থেকে পরিচয়।

দেশ স্বাধীন হয়ে গেলে আশ্রম তুলে দিয়ে চিন্ময়ীদেবী চলে গেল শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমে। কাজেই আর কারো সাথে কারো দেখা নেই। নিলুদার বিয়ের পর নিলুদা নিজেই দেখা করলেন আমার সঙ্গে আমাদের ভবানীপুরের বাড়িতে। আমার বিয়ে হল এই তো বার বছর। বাগবাজারে চ্যাটাজীঁদের বাড়িতে। নিরুর তখনো বিয়ে হয়নি। ওর কাছে গল্প করতুম তোমাদের। ও বললে, চল দেখে আসি। তাও হয়ে ওঠে না। শেষে সমীরবাবু যখন নিরুর কাছে কাগজপত্র আর টাকা দিয়ে গেল তখন আর না এসে উপায় কি।' বলে অনুরাধা মিষ্টি মিষ্টি হাসতে লাগল।—'সমীরবাবু তোমার শ্বশুরবাড়ি চেনেন না ?' সে সলজ্জ হাসি হেসে বললে—'হ্যাঁ চেনে। তবে। ভীষণ লাজুক কিনা তাই ওর কাছেই দিয়ে চলে গেছে।'

অনুরাধা সুন্দর সাফাই গাইল—সে নিজেও ধোয়া তুলসীপাতা রইল, বান্ধবীকেও রাখল সঙ্গে। কিন্তু কথাটা যে আগে সমীরবাবুর কাছেই শুনেছিলুম—নিরুপমা আকৃষ্ট হয়েছিল নীলুবাবুর প্রতি, আর সে নিজে সমীরবাবুর প্রতি। সে কথা আভাষ ইঙ্গিতেও বুঝতে না দিয়ে বললুম—'তুমি যে বললে, দু'জনকে একান্তে কথাবার্তা বলতে দিয়ে এলেম।' কথাটা শেষ করতে দিল না অনুরাধা। হঠাৎ কোথাও ভুল

হলে যেমন শোধন করার জন্যে লোকে বলে তেমনি, 'ও ! সেকথা ! ও বোধ হয় যমুনা সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেস করবে নিলুদাকে।' অনুরাধার খেলো যুক্তি শুনে আমার হাসি পেল। বললুম—'সেকথা জানার জন্যে একান্তে কেন?' সে বিজ্ঞের মতো করে বললে—'না না, সে কি হয়? যমুনার সঙ্গে নিলুদার ব্যক্তিগত ব্যাপার সবার সামনে সে বলবে কি করে?'

—'যমুনা সম্বন্ধে তার হঠাৎ এই কৌতূহল কেন?' আমার প্রশ্নে সে বিব্রত বোধ করে হেসে বললে—'এটা তো মেয়েদের স্বভাব, তুমি কি জান না?'

—'জানি কিন্তু এটা শুধু স্বভাবদোষেই হয় কি? তার পেছনে কি কোন সত্যিই থাকে না?'

অনুরাধা এবার হার মানল, বললে—'বাব্বা, তুমি দেখছি খুব ধার বৌদি!'

'—তার মানে?' বোকার মতো প্রশ্ন করলাম।

অনুরাধা শেষে স্বীকার করে বলল—'তা কারণ 'একটা ছিল বইকি—নিরুপমা আশা করেছিল নীলুদা ওর ভালবাসার মর্যাদা রাখবে। নিরুপমারা কায়েত হলেও বামুনের ছেলে নিলুদা স্বদেশী করতেন বলে ওঁর মধ্যে জাতিভেদ কোন বাধা হবে না—যেমন আমি মনে করতাম সমীরবাবু কায়েতের ছেলে হলেও আমি বামুনের মেয়ে বলে—বিয়েতে বাধা হবে না। আসলে ব্যাপারটা অন্যত্র। জাতিভেদের দরুনই বিয়ে হ'ল না এ কথা কোন ক্ষেত্রেই সত্যি নয়। সমীরবাবু হচ্ছেন সমাজকর্মী; বাউণ্ডুলে স্বভাবের মানুষ। ঘর সংসারে তার মন নেই। লোকে বলে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো। তাঁর তা-ও ছিল না। যার ঘরই নেই সে ঘরের খাবে কোত্থেকে? কিন্তু বনের মোষ তাড়ানোই তার ধর্ম। আর গান কবিতা ও-সবেও তার কোন আগ্রহ ছিল না—যা আমার আছে? সমীরবাবু বলতেন ওসব হচ্ছে এক জাতীয় বিলাস। উল্টোদিকে নিরুপমা কবিতা-গান-সাহিত্যচর্চা এ-সব বালাই ওর নেই। ও জানে ভাল খাওয়া, ভাল পরা। বাড়ি-গাড়ি-শাড়ি—যাকে বলে ঘোর সংসারী। আর নিলুদা ঠিক উলটো। অথচ নিরুপমা আমার চেয়ে সুন্দরী। ওর কাকার অঢেল পয়সা। তবু সে প্রত্যাশা করেছিল নিলুদাকে? এক সময় তো 'প্রমিজ' করেই বসল। এ বিয়ে না হলে সে জীবনে আর বিয়েই করবে না। "ফার্স্ট ইয়ার" থেকে সেকেণ্ড ইয়ারে উঠতে লাগল দু' বছর। বিয়ে পাশ করল তিন বারে। তবে ধৈর্য আছে বলতে হবে। কিন্তু প্রেম তো চিরকাল তামা-তুলসী হাতে নিয়ে বসে থাকে না—তার সঙ্গে যখন ক্ষুধাটাও যুক্ত থাকে। তাই নিলুদার বিয়ের সাত বছর পর বিয়ে করেছে ও। যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে তাঁরও অঢেল পয়সা। কলকাতা শহরে তিনখানি বাড়ি। শ্বশুরবাড়ি পুরোপুরি বনেদী বেনে।' বলে অনুরাধা হাসল। ঠিক এ সময়ই মামণি এসে খবর দিল—'মা' মাছওয়ালী এসেছে। মাছ রাখবে?'

—'বল রাখবে।' বলে উঠে গেলুম।

অনুরাধার সঙ্গে কথা বলে আমার স্বামীর অতীত জীবনের যে ছবিটি এতদিন অস্পষ্ট ছিল তা' স্পষ্ট হয়ে গেল। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম নিরুপমা ধনীর দুলালী ও রূপসী হয়েও নীলাঞ্জন চৌধুরীর মনে গভীর কোন দাগ কাটতে পারেনি। যেটুকু ঘটেছিল যৌবনসুলভ ব্যাপার ছাড়া কিছুই নয়। নিরুপমা মুগ্ধ হয়েছিল নীলাঞ্জনবাবুর রূপে। এবং তাঁর সহজ সবল যুক্তিবাদী বচনভঙ্গীতে। আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের পরিসরে যেটুকু দেখেছি তাঁর প্রতি প্রায় সব বয়সের মেয়েরাই অতি সহজে আকৃষ্ট হয়ে পড়ত। সেই ফ্ল্যাটবাড়িতে গীতামাসী বলে যে মহিলা তার মেয়েকে নিয়ে আসতেন কবিতা আবৃত্তি শেখাতে, সেই পঁয়ত্রিশ বছরের বুড়িও তার চৌদ্দ বছরের মেয়ের মতো চোখ দিয়ে লেহন করত তাঁকে। সুযোগ পেলে গা ঘেঁষে গিয়ে বসতো। কিন্তু আমার স্বামী সলজ্জ সম্ভ্রমে কথা বলতেন; পাত্তা দিত না এতটুকু। আরেকজন আসতেন তিনিও মাসী। তিনি নাকি শাশুড়ীর বন্ধু ছিলেন। এই বিধবা মহিলার দৈহিক গঠন এমন সুন্দর ছিল যে তাঁর বয়স পঞ্চান্ন পার হয়েছে—এটা বিশ্বাস হত না। তিনি তাঁর আদরের বোনপোকে আদরযত্নের ত্রুটী রাখতেন না। নিজে বামুনের বিধবা হলে কি হবে, আমিষ হেঁসেলে গিয়ে প্রায়ই আমার ওপর খবরদারী করতেন। তাঁর বোনপো কোনটা খেতে ভালবাসেন—কোনটা খান না, তা' তিনি দাঁড়িয়ে থেকে তর্জনী তুলে দেখিয়ে দিতেন। আসতেনই তিনি গান-বাজনা-সাহিত্য-কবিতার আসর ভেঙ্গে গেলে। বলতে গেলে খাওয়ার একটু আগে। আর যেতেন তাঁর আদরের বোনপোকে ঘুম পাড়িয়ে। স্বামীবাবু তো এমনি-ই আরাম প্রিয়! কেউ তার মাথায় হাত বুলালে গা টিপে দিলে সঙ্গে সঙ্গে ঘুম। আমার দুর্ভাগ্য যে এমন সুযোগ আমার কোনদিনই হ'ত না। ফ্ল্যাট বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করতে করতে জীবন যেত—তাঁকে সেবা করব কখন! মাঝে মাঝে পর্দার ফাঁকে দেখতুম মাসী যেন তাঁর বোনপো'র মাখনের মতো কোমল ও ডিমের কুসুমের রঙের মতো নরম দেহটাকে খামচিয়ে খামচিয়ে খান খান করচেন। আমি বুঝতাম মাসী তার গা-টেপা পা-টেপার মধ্যেই তাঁর অতৃপ্ত যৌন ক্ষুধা মেটান। ভাগ্যিস আমার স্বামী অযাচিত যৌবন বিলোতে মোটেই আগ্রহী ছিল না। স্বামীর বক্তব্য ছিল—মনের সম্পর্ক না ঘটলে দেহের সম্পর্কটা পাশবিক। যা—তিনি ঘৃণা করেন। তাঁর এই সিদ্ধান্তটা ছিল আমার নির্ভরতার মূল। যমুনার যুবতী হিসেবে অনেক ত্রুটী ছিল; কিন্তু মানবী হিসেবে অনেক গুণও ছিল। নারী হিসেবে ছিল শিল্প-সচেতনা—যা আমার স্বামীর একান্ত কাম্য। যা তিনি নিরুপমার মধ্যে পাননি; আমার মধ্যেও। যমুনার এই দুঃসহ মর্মান্তিক পরিণতি তাই তাঁকে এত বড় আঘাত দিয়েছে।

তাঁকে নাকি যমুনা বলেছিল—'সব দিতে পারি মন দিতে পারি না—এ কথা জেনেও তিনি তাঁর প্রতি এত আকৃষ্ট ছিলেন কেন?' এ কথার জবাব যমুনা দেয়নি। সে অতীতে কাউকে তার মন দিয়েছিল কিনা জানা নেই। সম্ভবত স্বামীও জানতেন না। জানার চেষ্টা করেছেন এ কথাও জানি না। যমুনার বক্তব্য ছিল—'স্ত্রী হিসেবে

স্বীকৃতিই মানুষের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করে—সেখানেই মন দেয়া-নেয়া সত্য ও সার্থক।

অনুরাধারা চলে যাওয়ার সময় আমি অনুরাধা ও নিরুপমাকে হাতে ধরে আরেকদিন আসার অনুরোধ করে বিদেয় দিয়েছিলুম। উত্তরে ওরা বলেছিল, কবির জন্মদিনে ওরা আবার আসবে। নিরুপমা বলেছিল—'উনি তো একেবারে ভেঙে পড়েছেন। আমার মনে হয় ডাক্তার দেখালে ভাল হত।'

—'সেকথা আমি অনেক বলেছি। গ্রাহ্যই করেন না। কি করব ভাই। সমীরবাবু যদি কলকাতায় থাকতেন—তাঁর কথা উনি না শুনে পারতেন না।' আমার এ কথার জবাবে ওরা দুজনেই বললে—'সে কথা ঠিক।'

আমি আবার বললুম—'তোমাদের যদি ঠিকানা জানা থাকে তবে তাঁকে একটিবার চিঠি দিয়ে খবরটা জানাতে পার।' অনুরাধা বললে—'সমীরদা এখন থাকেন বেনারসে। খবর পেলে আসতে পারেন। আচ্ছা খবর দেব' বলে ওরা চলে গেল। তবু বলতে পারলুম না ওঁর ঠিকানাটা আমাকে দিয়ে যাও। কেমন একটা বাধো বাধো লজ্জা এসে মুখটা চেপে ধরল। নিরুপমা এতক্ষণ ধরে তার বহু আকাঙ্ক্ষিত মানুষটির সঙ্গে কী কথা বলেছিল—সে ছাপ তার চোখে মুখে ছিল না। আমার অবশ্য তা জানার বড় একটা আগ্রহও ছিল না। যে ভালবাসা পড়ে যায় তাকে আবার জাগানো যায় কিনা—আমার জানা নেই। বিশেষত যে ভালবাসা মূলতই দেহভিত্তিক। অনুরাধার সঙ্গে তাঁর মন দেয়া-নেয়ার ঘটনা ঘটেনি কিন্তু অনুরাধা তাঁর কাব্য-প্রতিভার প্রতি অনুরক্ত। অনুরাধা আসে তার নিজের কবিতা শোনাতে ও তাঁর কবিতা শুনতে। এখানে উভয়ের শিল্পসম্পর্ক পবিত্রতায় সুনির্মল।

সমীরবাবুর দেওয়া হিসেব ও চিঠি এক সময় খুলে পড়লাম। পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রির ভাগে পাওয়া গেছিল—একুশ হাজার টাকা। জমি খরিদ রেজেস্ট্রারিসহ সাত হাজার টাকা। বাড়ি তৈরীর খরচ পড়েছে চোদ্দ হাজার তিনশ ছাপ্পান্ন টাকা। ফেরৎ নগদ একশ চুয়াল্লিশ টাকা—মোট একুশ হাজার পাঁচশ টাকা। কিন্তু হার বিক্রির কথা উল্লেখ নেই। বাড়তি পাঁচশ টাকা কোন সূত্রে পাওয়া গেল তাও উল্লেখ নেই। হিসেবের শেষে একটু লেখা—নিলু যদি কলকাতা আসি, হিসেবের গরমিলটুকু বুঝিয়ে দেব। তোর কথামত বাড়ির মালিক হলেন বৌদি। ভাল আছিস? ভাল থাকিস। ব্যস, আর কিছু নেই। ইতি—সমীর

সংসারের নিরাসক্ত এই লোকটার কথা মনে পড়তেই কেন যে মনটা উদাস হয়ে যায় তা কিছুতেই বুঝি না। নিঃস্বার্থভাবে নাম যশের কথা সযত্নে এড়িয়ে মানুষের আপদে বিপদে কর্তব্য সম্পাদন করতে এমন মানুষ সংসারে কমই দেখা যায়। সংসারের কোন প্রলোভনই তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। যমুনার কাছে শুনেছিলুম —যেবার দেশে দুর্ভিক্ষ হয়—সেই তেরশ পঞ্চাশ সালে যখন মানুষ বৌ ছেলে-মেয়ে

ফেলে রেখে তাদের মুখে অন্ন দেওয়ার ভয়ে পালিয়ে যেত। কেউ কখনো বা বৌ ছেলে-মেয়েকে বিক্রি করে দিয়ে টাকা নিয়ে ভিনরাজ্যে পালিয়ে যেত। যখন কলকাতায়ই নয় বাংলার শহরে শহরে কাতারে কাতারে মানুষ একখানি রুটি বা একবাটি ফেন দাও বলে গেরস্থের দুয়ারে দুয়ারে মাথা কুটে মরেছে,—সেই সময় এই সমীরবাবু নাকি চিনুদির নির্দেশে কয়েকটি ছেলেকে নিয়ে একটি অন্নসত্র খুলেছিলেন ঐ কালীঘাটেই। ওরা নাকি নিজেরা রান্না করে রোজ চারশ লোককে একবেলা খাওয়াত। চারশ লোকের চাল-ডাল-তরিতরকারি নিজেরাই সংগ্রহ করে আনত। এজন্য কোন সরকারী সাহায্যই পেত না। ডা. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীও নাকি এসব অন্নসত্রগুলোকে মাঝে মাঝে সাহায্য করতেন। সেই সময় অনুরাধাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না। পরিচয় হয়েছিল আরো পরে। তখন অনুরাধারা একান্তই ছোট। যখন দুর্ভিক্ষে পঞ্চাশ লাখ লোক না খেতে পেয়ে পথেঘাটে মরে থাকত, ডেড্‌বডি সরাবার কোন ব্যবস্থা ছিল না, তখন নাকি ওরাই ওই পচা গলা মানুষদের লাশ তুলে এনে কালীগঙ্গার পারে দাহ করত। এসব শোনা কথা। কত আর বয়স তখন! উনিশ কুড়ি বয়সের বেশী হবে না। দুর্ভিক্ষের ঝড় বয়ে গেলে এলো মড়কের পালা। সরকারী লঙ্গরখানায় যারা খেত, তারা পেটের রোগে দুতিন দিনের মধ্যেই মরত। শেষে এমন হল সরকারী লঙ্গরখানায় এই মৃত্যুমুখী মানুষগুলিও নাকি ভয়ে খেতে যেত না। কমিউনিস্ট পার্টির লোকেরা, পুলিসের লোকেরা লোককে জোর করে গাড়িতে তুলে নিয়ে লঙ্গরখানায় বজরাসেদ্ধ খাওয়াত। বাঙালী চাষী মজুরদের পেটে এসব সহ্য হত না। কাজেই মানুষ না খেয়ে যেমন মরেছে, তেমনি খেয়েও মরেছে লাখে লাখে। চিনুদিরা শুধু খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখেননি, মানুষকে চিকিৎসাও করতেন। তখনই তৈরী হয় ওই আশ্রম বাড়িটা। তখনই শুরু হয় মানুষ তৈরীর চেষ্টা। চিনুদি নাকি ইংরেজদের কথা বলতেন—'ওরা মানুষের শরীরে ঘা করে দেবে, আমরা মলম লাগাব—এটা হতে পারে না। আমরা এর প্রতিবাদ করব। প্রতিবাদে ফল না হলে প্রতিকারের পথ বেছে নিতে হবে।' সেজন্যই তিনি মানুষ তৈরীর প্রোগ্রাম নেন। স্বভাবতই পুলিসের নজর পড়ে আশ্রমের উপর। দু'একটা ধরপাকড়ও হয়। কিন্তু চিনুদি ঘাবড়ে যাননি। পুলিসের চোখে ধুলো দিয়েই কাজ করতেন। কৌশল করে আশ্রমের বাইরের দিকে শুরু হল ব্যায়াম-খেলাধুলা-গানবাজনা সাহিত্য-কবিতা-পাঠের আসর। তার কিছু আগে থেকেই পরিচয় হয় অনুরাধাদের সঙ্গে। তারপর ঘনিষ্ঠতা। কিন্তু কী আশ্চর্য—সমীরবাবুরা ওদের বাড়িতে যেতেন—অনুরাধার মা তাকে কোনদিন একটু সামান্য কিছুও খাওয়াতে পারেননি। আমি কি পেরেছি? আমার এমন পোড়া-কপাল যে, অতি তুচ্ছ একটা ঘটনার রসিকতা নিয়ে দুই বন্ধুর সান্নিধ্যটা ক্রমেই এমন দূরত্বে গিয়ে পেঁীছেছে যে তা আর কাছাকাছি ফিরিয়ে আনার কোন পথই যেন ছিল না। কিন্তু এই মুহূর্তে যদি তিনি তাঁর বন্ধুর অসুস্থতার খবর পান তাহ'লে হয়তো অতীতের ভ্রান্ত ধারণাটা দূর হয়ে যেতেও পারে—এমন একটা বিশ্বাস অনুরাধার

কথায় হয়েছিল আমার। ছেলেবেলায় রামসুন্দর বসাকের বাল্যশিক্ষায় পড়েছিলাম বিপদে বন্ধুর পরীক্ষা হয়। সে পরীক্ষাটা যদি হয়েই যায়—তাহ'লেও কি আমার স্বামীর মনে এমন একটা বাজে সন্দেহ থেকেই যাবে ?

আমরা আমাদের মেয়েদের মনই বুঝতে পারি না—পুরুষের মন বুঝব কী করে বলুন তো ? অনুরাধা যে দু'একদিনের মধ্যেই চিঠি দেবে তাতে আমার সন্দেহ নেই। কেন না—ওর তো ও'কে দেখতে ইচ্ছে করে ?

অনুরাধারা চলে যাওয়ার পর ক'দিন ধরেই এসব চিন্তাভাবনা আমাকে পেয়ে বসেছিল। এদিকে তাঁর অবস্থা ক্রমেই আরো খারাপ হতে লাগল। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। বুকের ব্যথা তাঁর বাড়তে লাগল। তার পর আবার খাওয়া-দাওয়া বলতে গেলে বন্ধই একরকম। সব সময়ই গায়ে জ্বর। যমুনা মারা যাওয়ার পর চুলদাড়ি যেমন কাটেন না, তেমনি মাছ-মাংস-ডিম, পেঁয়াজ-রসুনও ছোঁন না। কী হয়েছে কিছু বলেনও না। ডাক্তারের কথা বললে বলেন—যখন প্রয়োজন হবে বলব। আমি কিন্তু বসে থাকতে পারলুম না। চক্রবর্তীর মেজো ছেলে সুদীপকে ডেকে এনে বললুম, তোমার দাদা তো জ্বরে কোঁকাচ্ছে—বেশ কদিন যাবৎ বুকে পিঠে ব্যথা—একজন ডাক্তার ডেকে দেবে ভাই !

'হ্যাঁ দেব' বলে মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললে—'আপনার যে একটি বোন ছিলেন—তিনি কোথায় বৌদি ?'

আপনি বিশ্বাস করবেন না—আমার মুখ দিয়ে নিঃসঙ্কোচে একটা মিথ্যে কথা বেরিয়ে এল—ও বাড়ি চলে গেছে। বিয়ে ঠিক হয়েছে কিনা। আর আসবে না। সুদীপ 'ও' বলে চলে গেল। যে মিথ্যে কথাটা ওকে বললাম--ভবিষ্যতে যদি কোনদিন সত্যিটা জানাজানি হয়ে যায়—তাহলে ঐ ছেলেটার কাছেও লজ্জা পেতে হবে। ছিঃ, একেই বলে স্ত্রীবুদ্ধি ! মনটা ছোট হয়ে গেল। যারা যমুনাকে দেখেছে রেলেকাটা ছবিটা দেখলেই চিনতে পারবে এ—যমুনা। ভাগ্যিস চক্রবর্তীরা কাগজ রাখেন না।

ডাক্তার এলেন, দেখে বিরাট এক ফর্দ দিলেন—মল-মূত্র-রক্ত পরীক্ষা ও ফটো করাতে হবে, তবেই সঠিক চিকিৎসা করা যাবে। এবং আপাতত একটা ওষুধ এনে খাওয়াতে হবে।

ওষুধ আর ডাক্তারের ফি দিয়ে—মুদি দোকানের টাকার আদ্ধেকটাও দেয়া যাবে না।

উৎকণ্ঠায় দিন কাটছে—বেনারসের কোন খবর নেই। এদিকে হাতের টাকা ফুরিয়ে এসেছে। দুধ-কয়লা-মুদি ! আমার মাথা খারাপ হওয়ার মতো হয়ে এল। চিন্তা করে দেখলুম—যমুনার আংটি বিক্রী করেও সমস্যার সমাধান হবে না। তাই বুদ্ধি মাথায় এল—তিনটে বড় গল্পের পাণ্ডুলিপি নিয়ে একদিন হাজির হলুম—হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে—অভিজিৎবাবুর কাছে। তিনি নিয়ে গেলেন কলেজ রো-তে তাঁর এক বন্ধুর কাছে। তিনি সাদরে বসিয়ে বললেন—'এগুলো পড়ে—আপনাকে

জানাব চলবে কি না।' আমি বললুম—'আপনারা অভিজ্ঞ লোক, একপলক দেখলেই বুঝতে পারবেন চলবে কি চলবে না। অভিজিৎবাবু আমার পক্ষেই বললেন—'আমি পড়েছি, লেখার স্টাইল ভাল, বিষয়বস্তুও ভাল—তবে কি আমার ভালতে তো হবে না—যারা নেবেন তাদের কাছে ভাল হতে হবে।'

'ঠিক আছে দু'দিন পড়ে জানাব—আপনি না হয় সামনের শনিবারই আসুন।' বললেন—অভিজিৎবাবুর বন্ধু। অগত্যা চলে এলুম নমস্কার জানিয়ে।

শনিবারেই গেলুম—অভিজিৎবাবু এলেন না, একাই গেলুম—কলেজ রো-তে। কলিকাতা শহরটা কত বড় এবং শহরে কোথায় কী আছে তার সব কিছুই আমি জানিনে চিনিনে। ইচ্ছে ছিল অভিজিৎবাবুকে বলি—কালীঘাটের ঠিকানাটা কি এবং কত দূরে, কিভাবে যাওয়া যায়? কলেজ স্ট্রীট থেকে যাওয়া যায় কিনা—এসব খুঁটিনাটি সব জেনে নেব। কিন্তু হল না। অভিজিৎবাবু আমাকে পত্রপাঠ বিদেয় দিলেন। সম্ভবত দোকানের ঐ পাশে একটা সেগুন কাঠের টেবিল-চেয়ারে যিনি বসে আছেন—তিনি তাঁর মালিক। মালিককে ভয় পায় সবাই। অভিজিৎবাবুর অমন ডাকসাইটে গলা আর হাসি কোথায় যেন তখন হারিয়ে গেছে। বেড়ালের বাচ্চার মত মি-ই-উ মি-ই-উ গলা। গলা দিয়ে শব্দ বের হয় না। কাজেই বলতে পারলাম না। তারপরই এলাম কলেজ রো-তে। একবার এমন কথাও মনে হয়েছিল অভিজিৎবাবুর বন্ধুকে জিজ্ঞেস করি। কিন্তু অজ্ঞতার দোদুল্যতায় তা আর বলা হল না।

তিনি বললেন—'বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়ে এসেছেন তো?' ভদ্রলোকের কথা শুনে বুকের ভেতর অকারণেই একটা কাঁপন অনুভব করলাম। কার লেখা কে বিক্রি করে। এই পাণ্ডুলিপিগুলো বিক্রি করা নিয়েই তো এত কাণ্ড হয়ে গেল। স্বত্বহীন-ভাবে বিক্রি না করার জন্যই তো যমুনার বাড়ি বিক্রির প্রস্তাব আসে। সে প্রস্তাব ব্যর্থ হলে, সে এক সাংঘাতিক পথে পা বাড়ায়। তারপর! তারপর আর ভাবতে পারি না। ডাকাতি করা, খুন করার চেয়েও যেন এক কঠিন কাজ করতে এসেছি। যাঁর লেখা—তিনি তাঁর পাণ্ডুলিপি বিক্রি করবে না বলে দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত হয়েও বিক্রি না করার সিদ্ধান্তে অটল। তিলে তিলে মৃত্যুর কবলে আত্মাহুতি দেবেন তবুও 'না'।—'কি হল চুপ করে রইলেন যে?' ভদ্রলোকের প্রশ্নে চমকে উঠলুম।

—'ও—হ্যাঁ!' মুখ দিয়ে অস্পষ্ট আওয়াজ। নিজের কানেই বিশ্রী লাগছিল। তারপর একটু সহজ হয়ে প্রশ্ন করলুম—'লেখকের নাম থাকবে তো?' ভদ্রলোক হো হো করে হেসে উঠলেন। আমি যেন শিশু বা পাগলের মত কথা বলেছি। হাসি থামিয়ে গম্ভীরভাবে তারপর বললেন—'না, না, কারো নাম টাম থাকবে না। আপনার লেখককে চেনে কে? প্রতিষ্ঠিত লেখকের নামে বই বেরুবে। আপনি স্রেফ বিক্রি করে দিয়ে যাবেন। কোন দাবী আপনার, মানে লেখকের থাকবে না।' 'কেন এসব কথা অভিজিৎবাবু আপনাকে বলেননি?'

ভদ্রলোকের কথা শুনে আমার গলা শুকিয়ে যেন কাঠ হয়ে গিয়েছিল। কথার

উত্তর দিতে পারছিলুম না। অনেক কষ্টে জিহ্বা ভিজিয়ে নিয়ে বললাম—তিনি বলেছিলেন—'সত্ব থাকবে না।'

—'না, না—কোন স্বত্ব টত্বের কথা নয়—ছাপা বইয়ে আপনাদের কোন নামধামের চিহ্ন থাকবে না।' বলে ভদ্রলোক পাণ্ডুলিপি তিনটি আমার দিকে ঠেলে দিলেন। আমি কুণ্ঠিত হয়ে ওগুলো তুলে নিয়ে উঠে চলে আসার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বললুম—'আপনার কথায় যদি রাজি হই, কত দেবেন?' মনে মনে ভাবলাম—লেখকের পারিশ্রমিকটি কত জেনেই যাই। উনি সুযোগ পেয়ে গেলেন—একটু তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বললেন—'আর কত টত শুনে কি হবে। আগে মতামত জেনে আসুন—তারপর কত টত শুনবেন।'

—'মতামতের মধ্যে এটাও তো একটা কথা! টাকার অংকটা জিজ্ঞেস করলে কি বলব?'

—যেন সত্যি আমি লেখকের মতামত নিতে যাচ্ছি। আবার সেই একই ভঙ্গিতে সেই ভদ্রলোক বললেন—'কত আর হবে, তিনটেতে তিনশ।' আমি অবাক হয়ে গেলুম।—'মাত্র তিনশ!' মনে মনে ভাবলাম, এত পরিশ্রমের মূল্য মাত্র 'তিনশ'। কথা শুনে আমার পিত্ত জ্বলে গেল। এসব গৃধ্নীরাই সাহিত্য প্রকাশক। ভদ্রলোক এবার একটু হাসলেন, বললেন—'বসুন বসুন। আপনি তো অবাক হচ্ছেন—আসল কথা কি জানেন! যে লেখকের নামে বইটি প্রকাশ হবে—তাকে প্রতিটির জন্যে আমাদের মোটা টাকা দিতে হবে। আপনি যত ভালোই লিখুন—কোন মূল্য নেই নতুন লিখিয়েদের। প্রতিষ্ঠিত লেখকরাই—'

—'আমাদের সুবিধে রয়েলটি দিলেই হয়। ভাল বিক্রী হলেই লোকসানের হাত থেকে বেঁচে-বর্তে দু'পয়সা পেতে পারি। আপনি রাগ করছেন খামাখা!' ভদ্রলোক বেশ মোলায়েম সুরে কথা ক'টি বললেন। আমি যে ভেতরে ভেতরে ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম ভদ্রলোক তা বুঝেছিলেন; কিন্তু আমার লেখক সম্পর্কে তাঁর ভ্রান্ত ধারণাটা ভেঙে দেওয়া দরকার। বললুম—'আপনি বলছেন নতুন লেখিয়ে কিন্তু ইনি নতুন লেখিয়ে নন। অনেক পত্র-পত্রিকার উপর লেখা বের হয়েছে। বলেন তো তা এনে দেখাতে পারি।' আমার দৃঢ়তা দেখে ভদ্রলোক ভরকিয়ে গেলেন না—একটু মচকালেন। বললেন—'না, না—ওসব দেখাতে হবে না। দেখুন আমার বয়স হয়েছে। আমার অভিজ্ঞতায় বলছি মনে কিছু করবেন না। ওই সব ম্যাগাজিনে যারা লেখেন তারা নিজেরা হয় চাঁদা দিয়ে ওই কাগজের মেম্বর হন,—নয় লেখা ছাপার জন্য টাকা দেন। না দিলে ওইসব ম্যাগাজিন ছাপা হবে কি দিয়ে। ছাপতে, কাগজ কিনতে টাকা লাগে—অথচ বিক্রি হয় না—বিলি করতে হয়—কাজেই ওসব দেখে কি হবে? এ আমার তিরিশ বছরের অভিজ্ঞতা। যতদিন না কোনও লেখক পাঠকের কাছে আদৃত হবে ততদিন ওই ভাবেই চলতে হবে। লেখা বিক্রি করে বাঁচা যায় না। তার চেয়ে বরং পাঠ্য বই-টই লিখুন। এ্যাডুকেশন ডিপার্টমেণ্টে মোটা দক্ষিণা দিয়ে অনুমোদন করিয়ে আসুন।

তারপর ইস্কুলে ইস্কুলে ঘুরে ঘুরে পাঠ্য করার জন্য মাস্টারমশাইদের উচ্চ কমিশন দিন। প্রকাশক নিজের স্বার্থেই বইয়ের পাবলিসিটি দেবে। বিক্রি হলেই আপনি রয়েলিটি পাবেন—যতদিন বই পাঠ্য হবে।' ভদ্রলোকের সদুপদেশ শুনলুম কিন্তু মন দিয়ে শুনতে পারিনি—তাই তাঁর কোন কথা বাদও যেতে পারে।' আমার মন ছিল—মলমূত্র-রক্ত পরীক্ষা ও এক্‌সরের কথায়। তিনশ টাকা হয়ত ওতেই খরচ হয়ে যাবে। তারপর চিকিৎসা হবে কি দিয়ে? মুদি-দোকানি, দুধওয়ালা, কয়লা—এসবই মাথায় কিলবিল করছিল। জাতও দেব—পেটও ভরবে না—এমন কাজ না করাই ভাল। উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার জানিয়ে আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নামছি। ভদ্রলোক ডাকলেন—'শুনুন—শুনুন!' সিঁড়ি থেকে ফিরে তাকালুম—'আমাকে বলছেন?'

—'হ্যাঁ। আপনাকে ছাড়া কাকে বলব—আমার অফিসের এ-ঘরে অন্য কেউ নেই। শুনুন,—একটা বুদ্ধি দিই আপনাকে!' ভদ্রলোক নিঃশব্দে একটু হাসলেন। বুদ্ধির কথা শুনে ফিরে এলুম। বুদ্ধিমানদের প্যাচানো বুদ্ধির জন্যেই তো পৃথিবীটা বনবন করে ঘুরছে। নইলে সূর্যটাই তো ঘুরত।

—'একটু চা খান। এই টু-ফিফটি!' দোতলার অন্য ঘর থেকে একটি বছর আঠারোর ছেলে এসে দাঁড়াতেই—'দু'কাপ চা দিয়ে যাও' বলে ভদ্রলোক আমাকে হাত নেড়ে বসতে ইঙ্গিত করলেন। আমি বসে বললাম—'কি বুদ্ধি বলছিলেন, বলুন।'

—'লেখক আপনার স্বামী?' আমি মাথা নেড়ে জানালুম, হ্যাঁ।

—'তিনি কি করেন এখন—আর কি কি লেখা আছে?'

—'তিনি খুব অসুস্থ।' বলেই চুপ করে রইলাম। চা এল। সঙ্গে অবশ্য দু'পিস করে টোস্ট। চা খাওয়ার ফাঁকেই বললুম—'বলুন কি বলছিলেন বুদ্ধির কথা।'

—'টাকা পয়সা না থাকলে কিছু লেখা বিক্রী করে দিন এবং সেই পয়সা দিয়ে বাকী লেখা নিজেরা ছাপুন। আমরা কিছু বিক্রী করে দেব।' নাকে একটিপ নস্যি নিয়ে ভদ্রলোক আমার সঙ্গে রসিকতা করলেন। আমি সে কথার জবাব না দিয়ে প্রশ্ন করলুম—'আপনি যে বলছিলেন প্রতিষ্ঠার কথা। একজন লেখক কি করে প্রতিষ্ঠিত হন?' তিনি আমার প্রশ্ন শুনে উচ্চস্বরে হাসলেন। পরে হাসি থামিয়ে বললেন—'এ ধরনের প্রশ্ন কেউ করে না, তাই হাসলুম। মনে কিছু করবেন না। লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে—তিনটে গুণ অবশ্যই থাকতে হবে। এক—কোন না কোন প্রতিষ্ঠিত লেখকের অনুগ্রহভাজন হতে হবে। দুই—কোন না কোন বিশেষ স্বীকৃত সাহিত্য সংস্থা থেকে নিজের টাকা খরচ করে এবং নিয়মিত তেল মাখিয়ে সাহিত্য পুরস্কার পেতে হবে। তিন—নিজের লেখায় সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গি ও লেখায় ধার থাকতে হবে।' ভদ্রলোকের বুদ্ধি ও উপদেশ শুনে উঠে দাঁড়িয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম—আমার স্বামীর তিন নম্বর গুণটি ছাড়া আর কোন গুণ নেই। বলে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলুম। বাজে সময় নষ্ট হল বলে অনুশোচনা হতে লাগল। আড়াইটেয় এসেছি চারটে বাজে। এক্ষুনিই তো চা খাওয়ার জন্য ছট্‌ফট্‌ করবে।

বাস ধরার জন্য তাড়াতাড়ি চলছি ঠিক সেই মুহূর্তেই ভদ্রলোকের ঐ টু-ফিফটি ছেলেটি দৌড়ে এসে বললে—'ও দিদি আপনাকে ডাকচেন বাবু।'

'আজ সময় নেই—কাল আসব' বলে চলে এলুম।

শনিবার রাত্রি ও রবিবার দিন রাত্রি এবং সোমবার দুটো পর্যন্ত ভাববার সময় পেলাম। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় যা বুঝলুম—প্রতিভাদীপ্ত লেখক হলেও বিশেষ কোন ব্যক্তিত্বের আনুকুল্য না পেলে তার বিকাশ অসম্ভব। কলেজ রো-এর সেই ভদ্রলোকের তিন সূত্রের ফরমুলা বিদ্রূপাত্মক হলেও একেবারে তুচ্ছ নয়। আমার স্বামীর মুখেই শুনেছিলাম—বিখ্যাত দার্শনিক ও সাহিত্যিক বার্ণাড শ'কেও লণ্ডনের প্রকাশকরা নবাগত অপ্রতিষ্ঠিত লেখক বলে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। আমাদের দেশের তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রবাসীর রমানন্দ চট্টোপাধ্যায় তারাশঙ্করের গল্প দেড় বছরেও পড়ার সময় না পেয়ে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু অপ্রতিষ্ঠিত লেখকের লেখা কিনে প্রতিষ্ঠিত লেখকের নামে বাজারে ছাড়া আমার মনে হয়—বুদ্ধিজীবীদের এ এক জঘন্য সামাজিক অপরাধ। আপনি কি বলেন? তাই না। ব্যাপারটা এমনভাবে ঘটতে যাচ্ছে—টিকি ধরার কোন উপায় নেই। ভদ্রলোকের নাম জানি না,—তাঁর ফার্মের নাম জানি না। লেনদেনটা হবে ডান-হাত বাঁ-হাত। কোন সাক্ষী সাবুদও থাকবে না। আর থাকলেই বা কি। যারা পেটের জ্বালায় নিজের সৃষ্টিকে অপরের কুৎসিত লালসার কাছে স্বেচ্ছায় সঁপে দেয় তারা কী করবে? নিজের মনেই হাসলাম। কিন্তু পরক্ষণেই মুখের হাসি মিলিয়ে গেল—'মল-মূত্র, রক্ত পরীক্ষা, এক্সরে'—এই পাঁচটি শব্দ যেন আমার পেছনে বিভীষিকার মতো লেগে রয়েছে। কোন উপায় নেই। আত্মসমর্পণ ছাড়া কোন উপায় নেই। এ যেন সেই অর্থের বিনিময়ে বৃদ্ধ লম্পটের কাছে কুমারীত্ব বিসর্জন দেওয়া। ওঃ!

একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় বুকের ভেতরটা টন-টন করছিল। একটা ভারী নিঃশ্বাস ফেলে স্থির করে ফেললুম—'বাঁচার জন্যই ভ্রষ্টা হব। এই মুহূর্তে মনে হল যমুনার দেহদানের সঙ্গে আমার এ-কাজের পার্থক্য নেই। বরং যমুনা আরো মহৎ। সে নিজের জন্য এ-কাজ করেনি,—তার মাস্টারমশাইয়ের উপর—স্বামী হিসেবে বৈধ অধিকার না পেয়েও শুধুমাত্র তার ভালবাসার পাত্রকে জগতের সামনে তুলে ধরার জন্য ধূপের মতো নিজেকে পুড়িয়েছে। দীপের মতো প্রতিদিন জ্বলেছে। সেদিন ওর আলোকচিত্র দেখে কুলটা বলে কত গাল দিয়েছি, কত থু' দিয়েছি ওকে! একবারও ভেবে দেখিনি যে নরপশুরা তার মাংসল দেহটাকে নিয়ে ছিনিমিনি করলেও তার মনুষ্যত্বকে তাঁরা এতটুকু আঁচড় কাটতে পারেনি। সে যা করেছে তা কারো প্ররোচনায় করেনি। তার প্রিয় মানুষের মুখ উজ্জ্বল করার জন্যেই করেছে। এ কথাও চূড়ান্ত সত্য নয়—কারণ একজন কবি, একজন সাহিত্যিক বা একজন শিল্পী নিজের তৃপ্তির জন্যেই সৃষ্টি করেননি,—করেন মানুষের কল্যাণের জন্য। যমুনা সেজন্যই যে, দেহদান করেনি—সেকথা কে বলবে? হয়ত একথা ভেবেই তার ভালবাসার মানুষটি আজ সেই আত্মগ্লানিতেই অর্ধমৃত হয়ে পড়েছেন?

এমন একটা মানসিক দ্বন্দ্বের যখন ইতি টানলাম—তখন মনে হল বুকের যন্ত্রণাটাই কমে গিয়েছে। কিন্তু তবু যে-সব প্রকাশক এ ধরনের অপরাধ করে যাচ্ছেন এবং যেসব প্রতিষ্ঠিত লেখক ঐ অপরাধের শরিক হয়ে টাকা নিতে এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করেন না—তাদের প্রতি আমার ঘৃণা কিন্তু তিলমাত্রও কমল না।

কলেজ স্ট্রীট বেরুবার আগে স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম—তিনি একেবারে নেতিয়ে পড়েছেন। ভালোভাবে কথা বলতেও যেন পারছেন না। আমি মুখের কাছে গিয়ে ঝুঁকে বললুম—'তুমি অত ভেঙে পড়ছ,—আমি থাকি কী করে?' তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে কি বললেন—বুঝতে পারিনি। কণ্ঠ এত ক্ষীণ যে এত কাছে থেকেও সব শুনতে পাইনি। কান্নায় আমার চোখ ঝাপসা হয়ে এল। হঠাৎ মনে হল বড় দেরী হয়ে যাচ্ছে। প্রথমে পরীক্ষা তারপর চিকিৎসা। যা হোক আজই সবটা হেস্ত-নেস্ত করে আসব। বাঁহাতে চোখ মুছে আরো কাছে মুখ নামিয়ে বললুম—'কি বলছ?' তিনি স্পষ্ট করার চেষ্টা করে সেই ক্ষীণ কণ্ঠেই বললেন—'টিউশানির কিছু হল?' প্রবোধ দেয়ার জন্যে মিথ্যা বললুম—'আজকে জানতে পারব। গিন্নী কর্তার সঙ্গে কথা বলে আজই জানিয়ে দেবেন। আড়াইটার পর গেলে আবার দেখা হবে না। সিনেমায় চলে যাবেন।' ওঃ, একটা মিথ্যে ঢাকতে কতগুলো মিথ্যে বলতে হচ্ছে! মনে মনে ভগবানকে ডাকলুম—আমার অপরাধ নিও না ঠাকুর। 'এক্ষুণি যাব—নইলে দেখা পাব না'—বলে তাঁর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে মায়ের নাম করে বের হয়ে পড়লাম। হাতে সময় কম থাকা সত্ত্বেও অভিজিৎবাবুর সঙ্গে দেখা করে সেদিনের ঘটনা আদ্যোপান্ত বললুম। তিনি জানালেন—তাঁকে নাকি ভদ্রলোক ফোন করেছিলেন এবং তার প্রস্তাবের কথাও বলেছিলেন। জবাবে অভিজিৎ-বাবু নাকি কিছু দাম বাড়াতে অনুরোধ করেছিলেন। তারপর অভিজিৎবাবু হঠাৎ কণ্ঠ নামিয়ে বললেন—'একটা কথা বলব।' আমি ঘাড় কাত করে জানালুম—বলুন। তিনি পূর্ববৎ নীচু কণ্ঠে বললেন—'কাগজে দেখলাম—....' তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে থামিয়ে দিয়ে বললুম—'ঠিক দেখেছেন। এক্সিডেন্ট!'

—'আঃ, বড়ো ভালো মেয়ে ছিল! আপনাদের জন্যে তিনি—খুব চেষ্টা করতেন। নিলুবাবুকে তো উনি মাথায় রাখতেন। আমি তো দেখে হতাশ্ভত।' আমার চোখের পাতা ভারী হয়ে আসছিল। তাই চেয়ার ছেড়ে উঠে বললুম—'আপনার বন্ধুর শরীরটা ভাল নয়, তাই তাড়াতাড়ি। 'আচ্ছা, আচ্ছা' বলে তিনি আমাকে প্রতি নমস্কার জানিয়ে বিদেয় দিলেন।

শনিবারের মতো তাঁর আড়ষ্টভাব না থাকায় বুঝলাম আমার অনুমান সত্যি। মালিকের সামনে এরা ভিজে বেড়ালটি সেজে থাকে। প্রভুত্বের কি দাপট। কিন্তু তিনি বলেছিলেন চাকরি করেন না। ইচ্ছে হচ্ছিল সেকথাটা বলি। সময়াভাবে বলিনি সেদিন। কলেজ রো-তে এসে পাঁচশটাকায় তিনটে বড় গল্প দিয়ে চলে এলাম।

পাপের পথে যখন হেঁটে চলেছি—তখন পাপ পুণ্যের বিচার করার শক্তিটা যে

হারিয়ে যায় একথা আমি স্বীকার করি না। বরং একথাই সত্যি বলে মনে হয় যে,—স্বার্থবোধই সেই বিচারশক্তিকে প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রিত করে। চোর যখন চুরি করে—তখন নিশ্চয়ই সে চুরি করার পেছনে একটা যুক্তি খাড়া করে। এবং সেইটাই যে সঠিক এই বিশ্বাসেই সে চুরি করতে নামে। চুরির বিরুদ্ধে প্রচলিত বিধানগুলি যে বিত্তবানদের স্বার্থেই রচিত, সে বিশ্বাসও তার বদ্ধমূল থাকে। তোমার এত আছে, আমি চাইলে তুমি দেবে না! তোমার এত হল কি করে? তুমি কি অন্যকে ঠকিয়ে অতোকিছু সম্পদ বাড়াওনি? একদিন তো সবকিছুর ওপর সবার সমান অধিকার ছিল। তোমাদের কারো কারো গায়ের জোর বেশী ছিল বলে আমাদেরটা কেড়ে নিয়ে বলেছ এই সবই তোমার। আমার পাওনাটা আমি নিতে আসি—এই ভয়ে পাহারাদার বসিয়েছ, আইন করেছ। আমাকে চোর ডাকাত হারমাদ যা খুশী বলেছ। তাই তোমার অজ্ঞাতে নিতে এসেছি—জানি ধরতে পেলে আমার হাত কেটে দেবে, পা ভেঙে দেবে বা অন্ধ কুঠরীতে রেখে দেবে। এসব জেনেও এসেছি, কারণ পেটের ক্ষুধা বড় জ্বালা। বিকল্প পথ থাকলে আসতুম না। যদি কোনদিন পারি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করেই আমার ভাগ আমি ছিনিয়ে নিতুম।

এমন সব যুক্তি একজন সাধারণ চোরের পক্ষে ভাবা হয়ত সম্ভব। আমার পক্ষে? আমি যে, যাঁর জিনিস তাঁরই জন্যে চুরি করছি—সেটাও কি ঐ একই মাপকাঠিতে বিচার হবে?

সত্যি কথা কি এভাবে তাঁর লেখা বিক্রী করতে আমি চাইছিলাম না। যমুনা তো পর। সে তো এ পথে পা বাড়ায় নি? সে নিজের রূপ-যৌবন বিক্রি করেছে। যমুনা বলেছিল দেহটা যাকে তাকে দিতে পারি, মনটা নয়। মনটাই তো মানুষের আসল। মনের হুকুমেই তো দেহটা চলে। সেই মনটাকেও তো আমি বিয়ের আসরে সকলের সামনে দেবতা ও ব্রাহ্মণ সাক্ষী রেখে—স্বামীকে অর্পণ করে বসে আছি। নান্য পন্থা। কাজেই সেই অপকর্ম ছাড়া আর কোন পথ নেই। এমন একটা মানসিক অবস্থা নিয়ে আমি যখন বিব্রত। তখন হঠাৎ মাথার মধ্যে একটা দুর্বুদ্ধি খেলেছিল।

তাঁর আলমারীর নীচের তাকে একটি পিসবোর্ডের বাক্সে অনেকগুলো ছবি দেখেছিলুম একদিন। সন্তর্পণে গিয়ে সেই বাকসটি নিয়ে এলুম এঘরে। ছবিগুলির রং এখনো ঔজ্জ্বল্য হারায়নি। একটি একটি করে দেখলুম, সবগুলি। ছবিগুলির উলটো পিঠে কোন প্রদর্শনীর রবার স্ট্যাম্পের ছাপ। আর প্রত্যেকটির কোণে তাঁর নিজের হাতের সুন্দর স্বাক্ষর রয়েছে। এগুলো কি বিক্রি হয় না? হয়তো বা হয়। কোথায় হয়? আবার একদিন গিয়েছিলুম। তিন-চারখানি ভাল ছবি নিয়ে—অভিজিৎবাবুর কাছে। তিনি দেখে হেসে উঠলেন, বললেন—'পাগল হয়ে গেলেন নাকি।'

—'কেন। পাগল হওয়ার কী দেখলেন।' তিনি তেমনি হাসতে হাসতে বললেন—'আপনি রাগ করবেন—জানি বৌদি। এসব বিক্রি হয় না।'

—'আমি শুনেছি হয়।'

—'ঠিকই শুনেছেন—সে খরিদ্দার আপনার আমার ছবি নেবে না। তারা বিদেশী তকমা মারা—ছাপ্পর মারা আর্টিস্টদের ছবি কেনেন, তাই হাসছিলাম। যান এগুলো নষ্ট করবেন না, ঘরের সৌন্দর্য বর্ধন করবে। বাঁধিয়ে রাখতে পারলে স্মৃতি হিসেবে থাকবে বহুকাল। রুচিবিহীন মানুষের অযাচিত উপদেশ অনেক সময় ক্লেশকর হলে 'হুঁ-হ্যাঁ' বলে ঢিটো মেরে গলাধঃকরণ করতে হয়। প্রত্যাশা একটাই. তাঁর কাছ থেকে যদি কোন চিত্র সমঝদার মানুষের ঠিকানা পাওয়া যায়—তা'হলে আমি নিজেই যাব কারো সুপারিশ ছাড়াই। তাঁর উপদেশ শোনার পরও যখন এমন কোন সমঝদারের নাম জানার জন্য আমি পীড়াপীড়ি করতে লাগলুম তখন তিনি অভিজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় গম্ভীর হয়ে বললেন—'হ্যাঁ মনে পড়েছে। আমার এক ক্লাশমেট—মানে বাল্যবন্ধু রথীন পুরকায়েত—সে ছবি কেনাবেচা করে। তাকে লিখলে হযতো একটা বিহিত হতে পারে।' সাগ্রহে প্রশ্ন করলুম—'দয়া করে তার ঠিকানাটা যদি বলেন তা'হলে'···কথা শেষ করতে না করতেই তিনি বললেন—'আরে না না। রথীন এখন এদেশে থাকে না। থাকে প্যারিসে। প্যারিস মানে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস।' আমি নিঃশব্দ হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইলাম। বোধ হয় আমার অবস্থা অনুমান করতে পেরেছিলেন। বললে—'শুনেছি ঠাকুরবাড়ির দৌলতে বাংলার—মানে বাঙালির ছবির কিছু চাহিদা আছে। বলছেন যখন তাকে আমি একটা চিঠি দিয়ে দেখতে পারি।'

অভিজিৎবাবুর কাছ থেকে আশ্বাস নিয়ে এসে মাসখানেক বাদে জেনেছিলুম—অক্টোবরে রথীনবাবু কলকাতা আসবেন, তখন দেখবেন। পছন্দ হলে নগদ টাকায় কিনে নেবেন। কাজেই আপাতত কোন সুরাহার সম্ভাবনা নেই।

বাড়ি এসে ছবিগুলো আবার ভালো করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলুম। দুটো ছবি আমার কাছে ভারি সুন্দর মনে হল। ছবি দুটো যেন একটি ঘটনারই প্রকাশ।

একটা বকুল গাছের তলায় অজস্র বকুল ফুল পড়ে রয়েছে। একটি ফুটফুটে সুন্দরী ফ্রক পরা মেয়ে ফুল কুড়িয়ে কোচরে তুলছে। পাশে তারই মতো—হয়ত একটু বড় হবে একটি বুট-প্যাণ্ট-শার্ট পরা দাম্ভিক ছেলে পা' দিয়ে দলে দিচ্ছে তার ফুলগুলি। মেয়েটা বেদনার্ত চোখে চেয়ে আছে ছেলেটার দিকে। বকুল গাছটার পেছনে কোন মন্দিরের কিছু অংশ।

অন্যটি প্রায় একই। কেবল পাত্র-পাত্রীর আচরণ অন্যরকম। মেয়েটি দু'হাতে একটি মালা পরাতে যাচ্ছে ছেলেটাকে—ছেলেটি মালাটি ছিঁড়ে দিচ্ছে দু'হাতে। আরেকটি ছবি আছে—যেটাকে খুঁটে খুঁটে দেখলে মনে হয় একটি বালিকা দু'হাতে চোখ মুখ থেকে যেন ভয়ংকর কিছু থেকে বাঁচতে চাইছে। বালিকার মুখমণ্ডল, চুল দাঁড়ানোর ভঙ্গি সবটাই যেন নিরুপমার সঙ্গে মিলে যায়। এমনি খানকয়েক আমার পছন্দ ছবি আলদা করে আমার কাছে শাড়ির তাকে শাড়ির নিচে রেখে দিলুম। যদি সময় আসে জিজ্ঞেস করব—অন্তর্নিহিত অর্থ কি।

ক্যানভাসের কয়েকটি এমনি ও'র ঘরে মুড়ানো ছিল আর কিছু আর্ট পেপার। সেগুলো যত্ন করে রেখেছিলুম। তার ঘরে দেওয়ালে টাঙানো রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, নজরুল, অবনীন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতন এবং আমার শ্বশুরের ছবিগুলো তারই হাতে আঁকা। পূর্বে এগুলিকে কোন মূল্যই দিইনি। কিন্তু এগুলোও যে মহামূল্যবান সেকথা বুঝেছি পরে।

অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার খাঁই মেটাতে ও কিছুটা ধার-দেনা শোধ করতেই প্রায় ফাঁকা হয়ে গেলুম। দিনাতিপাতের ভবিষ্যৎ দিনগুলির বিকৃত চেহারা সামনে ভেসে উঠতেই শিউরে উঠলাম। একটা কিছু না হলে কি করে চলবে? কিন্তু পাপ এমনই পাপ, তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া বড়ই কঠিন। আঘাত না পেলে তার থেকে পরিশুদ্ধ নতুন চেতনা জন্ম নেবে না। প্রথম যেদিন তার তিনটি বড় গল্প চুরি করে বিক্রি করেছিলুম, বোধহয় সেদিনই আমার ভাগ্যে সেই কঠিন আঘাত নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

এক্সরে ইত্যাদি করেও আমার ডাক্তার কোন সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে পারলেন না। তবুও মাসাধিক চেষ্টা করে দেখার কথা বলে পাঁচদিনে একশ টাকা নিয়ে গেলেন শুধু তাঁর দর্শনী বাবদ। কিছুই হচ্ছে না দেখে সুদীপকে বললুম—'একজন আরো ভাল ডাক্তার কেউ তোমার জানা আছে?' সে বললে—'আছে। আমার সঙ্গে জানা নেই—বাবার সঙ্গে চেনাশোনা আছে—কিন্তু তাতে কি হবে? তাই বলে ভিজিট কমাবে না। ডাক্তাররা হলো'—সে একটা বিচ্ছিরী কথা বলতে গিয়ে থেমে গেল। 'থাক্। কত ভিজিট নেন?' প্রশ্ন করতেই সে বললে—'খুব কম। তিন মাইলের মধ্যে ষাট টাকা। বেশী হলে মাইল পিছু আরো কুড়ি টাকা—প্লাস গাড়ি খরচ মাইল পিছু দশ টাকা। তবে প্রথমবার তিন মাইলে গাড়ি খরচ দশ টাকাই নেন এই যা দয়া। মনে মনে হিসেব করলুম, সত্তর টাকা খরচ হবে। হোক। বললুম—'নিয়ে এস তুমি।' সুদীপ হাসল—'না বৌদি, অত সহজ নয়। আগের ডাক্তারের প্রেসক্রিপসানসহ অর্ধেক টাকা আগাম জমা দিয়ে আসতে হবে। পনের মিনিট বাদে বলে দেবেন কখন গিয়ে তাঁকে নিয়ে আসতে হবে। এতো ডাঁট পি, দত্তের আমি দ্বিরুক্তি না করে টাকা ও প্রেসক্রিপসন ওর হাতে দিয়ে বললুম—'তাই হোক নিয়ে এস।' সুদীপ ঘন্টাখানেক বাদে এসে জানাল—'কাল এগারোটায় গিয়ে নিয়ে আসতে হবে।' একটু থেমে বললে—'পি দত্তের এত ডাঁট কেন জানেন বৌদি? উনি শুধু বিলেত ফেরৎই নয় আমেরিকা ফেরৎ যে। ওদেশে নাকি টাকার পাহাড়। ওই সব ছেড়ে তিনি দেশে এসেছেন শুধু গরীবদের চিকিৎসার জন্য। তাই এই সামান্য ভিজিট নেন তিনি। পি, দত্ত গরীবদের চিকিৎসার জন্যে দেশে এসেছেন কিনা জানি না—কিন্তু একবার রোগী দেখেই বাইরে এসে বলেছিলেন—'হি ইজ এ্যাফেকটেড বাই মেন্টেল শকড্, নাথিং অ্যানাদার।' বলে সুদীপকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন এবং সত্তের

টাকার ওষুধ ও পথ্যের চার্ট লিখে বলে দিলেন রোগীকে ন্যাচারেল ওয়াকে' উদ্বুদ্ধ করতে।

বলা বাহুল্য—পি. দত্তের ওষুধ পথ্যের ব্যবস্থা করতে আবার আমি দুটি পাণ্ডুলিপি বিক্রি করি। ঐ ভদ্রলোক বলছিলেন—লেখাগুলো যদি ফেয়ার করে দিতে পারেন তা' হলো আবো দুটো পয়সা বেশী দেওয়া যায়। নইলে প্রেসে পাঠানোর আগে আমাদের ফেয়ার করতে, খরচ করতে হয় কিনা।' সোজা ও স্পষ্ট কথা বললেন ভদ্রলোক। কাজেই আমি সময় পেলেই কপি করতে লেগে যেতাম। বলাবাহুল্য এসব কাজ চলত স্বামীর অজ্ঞাতে। একদিন তিনি বললেন—'টিউশানি কি ছেড়ে দিয়েছ?' মিথ্যেই বলতে হল—'না। তোমাব শবীর খারাপ বলে ছুটি নিয়েছিলুম অনেক বলে কয়ে।' এই মিথ্যেটুকু না বললে অর্থাৎ 'টিউশানি-ই করি না' বললে ডাক্তার-ওষুধ-পথ্য-সংসাব চলছে কি করে—এই প্রশ্ন আসবেই। মনে মনে তখনই ঠিক করে ফেললুম টিউশানি একটা করতেই হবে, পড়াশোনাও চালিয়ে যেতে হবে। সুদীপকে বললুম—'আমাকে একটু সাহায্য করবে ভাই।' সুদীপ হাসি মুখে বললে একটু কেন, কখনো তো না করিনি বৌদি। কী কাজ বলো।' বললাম—'কাজটা সামান্য নয়—বেশ কঠিন। অর্থাৎ নিয়মিত করাব কাজ কিনা।' সুদীপ যেন ধৈর্য হারিয়ে ফেলল—'বলোই না কি কঠিন কাজ।' তবুও ইতস্তত করছিলুম—'তোমার মা-বাবা যদি কিছু বলেন।'

—'কেন? কোন অন্যায় কাজ?'

—'না, না—অন্যায় কাজ করতে বলব কেন। আমি কি তোমাকে তা বলতে পারি? আর তোমাকে কেন কাউকেই বলতে পারি না।'

'তবে এত হ্যাজিটেড্ করছ কেন? কোন অন্যায় কাজ না হলে মা-বাবা কখনো কিছু বলবেন না। আমার মা-বাবাকে তুমি চেন না বৌদি। মা বলেন—এমন বৌ পেয়েছিল বলেই নীলাঞ্জনবাবু এবার বেঁচে উঠলেন।' সুদীপের মুখে আমার প্রশংসায় তার মায়ের কথা শুনে মুহূর্তে আমি যেন অন্য জগতে চলে গিয়েছিলাম। আমায় চুপ করে থাকতে দেখে সুদীপ—'কি হল—বল না কেন বৌদি' বলে তাগাদা দিল। বললুম—ভেবেছিলুম এবাব প্রাইভেটে পরীক্ষাটা দিয়ে দেব। কিন্তু ভাগ্য বাদ সাধল। যমুনা চলে গেল, তিনি কঠিন অসুখে পড়লেন। কাজেই প্রস্তুতিতেই ব্যাঘাত। তাছাড়া তিনি যে আর কয়েক মাসের পর আমাকে পড়াতে পারবেন এমন সম্ভবনাও নেই। তাই ভাবছি আগামী বছরের জন্য তৈরী হব—তুমি একটু আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করবে?'

—'এই কথা। এই কথা বলতে তুমি রামায়ণ মহাভারত শোনালে? কবে থেকে শুরু করবে শুনি?' বলে সুদীপ আমার দিকে তাকিয়ে স্বগত উক্তির মত বললে—'পা-র-ব! হ্যাঁ পারব'—হেসে ওকে বললুম 'কী বলছ পাগলের মত। ভার্নকুলারে আর হিস্‌টরীতে স্টার পেয়েছ—পারবে না মানে?' সুদীপ একটু অন্যমনস্ক হয়ে

থেকে পুনরায় যেন বাস্তবে ফিরে এসে বললে—সত্যি বৌদি তুমি যদি পাশ কর তা হলে কী মজা হবে জান।' বলে সুদীপ আনন্দে নাচতে নাচতে ছুটে চলে গেল।

এতদিন এ পাড়াতে রয়েছি—আমাদের সম্পর্কে প্রতিবেশীদের কী ধারণা জানতুম না। কারণ আমার স্বামী নিজেই কারো সঙ্গে বড় একটা মিশতেন না। নিজেকে নিয়ে নিজেই বিব্রত থাকতেন। সে জন্যে তাঁর আসরগুলোতে পাড়া-প্রতিবেশী ছেলে বুড়ো কারোর উপস্থিতি ছিল না। যমুনা না আসতে—যখন বাজার করার সমস্যা দেখা দিত—তখন যারা আমাদের টিউবওয়েল থেকে জল নিতে আসত তাদেরই ধরে তাদের ছেলে-ছোকরা দিয়ে হাট-বাজার করাতুম। সেটুকুই ছিল আমার পরিচিতির সূত্র। যমুনা আসার পর সে বালাইও রইল না। ও-ই সব করত। কাজেই প্রতিবেশীদের মনোভাব জানার কোন সুযোগই ছিল না। তা' ছাড়া আমাদের বাড়িটা এখনো প্রায় বিচ্ছিন্ন। এখনো লাগোয়া বাড়িগুলো হয়ে ওঠেনি, না লোক আসেনি। অথচ তিন চারটে খালি প্লটের পর এ গলির মাথায় চক্রবর্তীদের গিন্নীর মুখে আমার প্রশংসার কথা শুনে মনটা সত্যি খুশীতে ভরে গিয়েছিল। সুদীপের উৎফুল্লতায় আমি যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলাম।

জীবনটাকে আমি ছকে বেঁধে ফেললুম। প্রাত্যহিক সংসারের কাজ সেরে, স্বামীকে খাইয়ে দাইয়ে শিশুর মতো ঘুম পাড়িয়ে টিউশানি থেকে ফিরে এসে আমার স্বামীর কাছে এসে তার পরিচর্যায় কিছুক্ষণ কাটিয়ে আবার সংসার। মাঝে মাঝে ও-ঘরে যাওয়া। সন্ধের পর মেয়েকে নিয়ে নিজের পড়া। সুদীপের কাছে নিত্যদিনের পাঠ দেওয়া—এবং তারই ফাঁকে ফাঁকে ও-ঘরে গিয়ে দেখে আসা। সুদীপ চলে গেলে রাতের খাওয়া ইত্যাদির পর তাঁর লেখা পাণ্ডুলিপি কপি করা—এই হল প্রাত্যহিক জীবন।

মামণির মাসীর বদলে সুদীপকে পেয়ে মাসী মাসী বলে কান্নাটা ভুলে গেল।

একদিন সুদীপ বললে, 'ডাক্তারের কাছে গেছলুম।'

—'কি বললেন তিনি?' সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলাম। যেন আমিই বলেছিলাম ওকে যেতে।

সে বললে—'আমি সব বললুম, রোগীর বিশেষ অগ্রগতি হচ্ছে না। শুনে ডাক্তারবাবু আমার কাছে দাদার অতীতের হাবি টবি জানতে চাইল বৌদি! আমি কী আর জানি। যা জানি তাই বললুম।'

'কি বললে?' উৎকণ্ঠা নিয়ে প্রশ্ন করলাম ওকে। মদ খাওয়া টাওয়া ব্যাপারটা তো অনেকেই জানে। সেটাই বলেছে কিনা—তাই নিয়েই উৎকণ্ঠা ছিল। সে বললে—'বললাম—কবিতা টবিতা লিখতেন আর ছাত্র পড়াতেন—তাই না বৌদি?' বাঁচলুম—উলটো পালটা কিছু বলেনি। 'তারপর কি বললেন ডাক্তারবাবু!' প্রশ্ন করলাম সুদীপকে। সে বললে—'ডাক্তারবাবু সাইকোলজিক্যাল সাজেস্ট কিনা। তাই বললেন—যতক্ষণ না রোগী আগের মত কবিতা লিখছেন বা এ জাতীয় যা করতেন তা' করছেন—ততক্ষণ তিনি সুস্থ হচ্ছেন বলা চলে না। নজরুল ইসলামের কথা শোনেননি। বরং

বিপজ্জনকভাবে খারাপের দিকে চলে যাবে।' সুদীপের মুখে ডাক্তারের কথা শুনে আমার সুন্দর মনটা ভেঙে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। আমার মুখ বোধ হয় বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। সুদীপ বিস্ময় প্রকাশ করল—'কী হল বৌদি ? তুমি এমন নিঃশব্দ হয়ে গেলে কেন ? সুদীপের কণ্ঠে ব্যাকুলতা। আমি চমকে উঠেছিলাম—আমার মনে হয়েছিল সে আমার নিঃস্তব্ধতা সহ্য করতে পারছিল না।

'কী হল বল না। তুমি এমন করে থেকো না। আমার ভাল লাগে না। ওঃ তুমি কাঁদছ কেন—দাদার কথা বলায় ?' বলে সে আমার আঁচল দিয়েই আমার চোখ মুছিয়ে কপট শাসনের সুরে বললে—'একদম কাঁদবে না। আমি সব ঠিক করে দেব। কিছু ভেব না।' তারপর একটা চাপা শ্বাস ধীরে ধীরে ফেলে বললে—'আমি কি ঠিক করেছি জান ?'

শ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠে জবাব দিলুম, 'কী ?'

'রোজ কিছুক্ষণ দাদাকে দাদার কবিতা পড়ে, গান গেয়ে শোনাব—দেখবে ঠিক ভাল হয়ে যাবেন দাদা !'

ডাঃ পি দত্তের কথা—সঙ্গীতে কবিতায় মুখর কবি নজরুলের অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার উপমা শুনে আমার ভেতরে ভেতরে কখন থেকে একটা প্রচণ্ড উৎকণ্ঠা আমার সমস্ত স্নায়ুতে হানা দিয়ে সমস্ত উলট পালট করে দিচ্ছিল তা' সঠিক বুঝতে না পারলেও এটা যেন অনায়াসেই বুঝে ফেলেছিলুম—যমুনার প্রত্যাঘাতে যদি সেই সর্বনাশই ঘটে যায়, তা হ'লে আমার সমুখে মহাশূন্যতা ছাড়া আর কিছুই থাকবে না—এমন একটা অস্পষ্ট বোধ আমাকে যখন প্রায় আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল তখনই সুদীপের কণ্ঠে এক তরুণ যুবকের অভয়বাণী আমাকে প্রবলভাবে নির্ভরতায় উজ্জীবিত করে তুলেছিল। আমি আবেগে তাকে আমার বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলেছিলুম—'সত্যি সুদীপ, সত্যি বলছো ? তোমার দাদা ভাল হয়ে যাবে ?'

রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবছিলুম—সুদীপকে আমি ছোট ভাইয়ের মত ভাবলেও—সে তো আর সত্যি সত্যি ভাই নয়—এমনকি সত্যি সত্যি দেওরও নয়। প্রতিবেশী ঠাকুরপো। সে আমার থেকে পাঁচ ছ বছরের ছোট হলেও সে তো তরুণ যুবক। তার রক্তে তো যৌবনের দাপাদাপি নিশ্চয়ই আছে। তার মাথাটা আমার ঢেউ তোলা বুকের মাঝখানে চেপে ধরায় সে কি লজ্জা পেয়েছিল ? বুকের উত্তাপে—তার রক্তে কি ঢেউ উঠেছিল ? সে কি আমার মত অতৃপ্ত কামনা-বাসনা-আকুলিত কোন রমণীর এমনভাবে বুকের পরশ পেয়েছিল ? তাকে বুকে চেপে ধরার সময় আমার মধ্যে কি কোন প্রত্যাশা উঁকিঝুঁকি দিয়েছিল, যাতে সে বুঝেছিল—আমি স্নেহময়ী বৌদি ছাড়াও অন্য কিছু হতে চাই ? যৌন বাসনার কাছে কি বয়স কিছু সমস্যা ? নইলে সেই বিকেলের পর সে এল না কেন ?—এমনি সব অভাব্য ভাবনায় অনেকক্ষণ জেগে ছিলুম। যতক্ষণ জেগে ছিলুম ততক্ষণ শুধু সুদীপের সেই শুভ্রকান্তি

তারুণ্যের দ্যুতি যেন আমাকে আপ্লুত করে রেখেছিল। অন্য কারো কথা—কোন কিছুর কথাই ধারে কাছে ছিল না। শুধু তার টানা টানা চোখ বসানো পূর্ণিমা চাঁদের মত ঢল ঢল একখানি মুখ। যা দেখলেই ভালবাসতে ইচ্ছে হয়। ইচ্ছে হয় বুকের মধ্যে চেপে ধরে চুমু খাই। ইচ্ছে হয় তার আলতো কোকরানো চুলগুলো কপাল থেকে সরিয়ে দিয়ে তার মুখটাকে—শিল্পী যেমন তার সৃষ্ট মূর্তিকে ঘাড় মাথা কাত করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে, তেমনি করে দেখতে ইচ্ছে হয়।

কিন্তু কী আশ্চর্য সুদীপকে নিয়ে এভাবে ভাবতে আমার একবার একথা মনে হল না যে এমন করে ভাবা আর যারই সাজে সাজুক আমার সাজে না। একবারও মনে হল না—এমন ভাবনা যুবতী রমণীর মনে এলেও—মাতৃতুল্যা রমণীর মনে আসতে পারে না। আমি তো তার মাতৃতুল্যাই! অথবা জ্যেষ্ঠা ভগ্নী তুল্যা।

পরদিনই সুদীপ এসে হাসতে হাসতে বললে 'একটা সুখবর নিয়ে এসেছি বৌদি!' আমি হাতের কাজ ফেলে রেখে ওকে নিয়ে ঘরে এসে বললুম, 'কি খবর? কাল এলে না কেন?'

—'আসবো কি করে। কাল তোমার অবস্থা দেখে আমার বড় দুশ্চিন্তা হয়ে গেছিল। তাই বাগবাজারে চলে গেলাম মামাতো বোনকে আনতে। অবশ্য মাকে জানিয়েই আনতে গিয়েছিলুম। মা-ই বললে নিয়ে আয় গিয়ে। জানো বৌদি, সঞ্চিতা যেমন গাইতে জানে তেমনি আবৃত্তি করতে পারে। আর মামী-মাও জুটেছে বেশ। উনিও তদ্রূপ।'

সুদীপের অনুপস্থিতির কারণ জেনে গত রাত্রের ভাবনা-চিন্তার কথা মনে করে নিজের কাছেই নিজে লজ্জা পেলুম। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললাম—'তা সঞ্চিতা এসেছে?'

—'না মামীমাকে নিয়ে ও দু'চারদিন বাদেই আসবে। তুমি বরং এক কাজ কর। ভাল ভাল কবিতাগুলো—যেগুলো আবৃত্তি করা যাবে—বাছাই করে রাখ। আমি সেগুলো আগেই দিয়ে আসব ওকে!' সুদীপের আগ্রহ দেখে অনেকটাই নিশ্চিন্ত হয়েছি।

দুপুরে তিনি ঘুমিয়ে পড়লে ওই ঘরে গিয়ে আলমারি খুলে বেশ কয়েকটা কবিতার ডাইরি বই নিয়ে এলুম—ওই সঙ্গে নিয়ে এলুম আপনার পুরনো একখণ্ড 'মালঞ্চ'। সাধারণত আমি তাঁর কাছে আসা মাসিক, ত্রৈমাসিক, সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকাগুলো পাড় না। সেদিন মালঞ্চের প্রচ্ছদ দেখে কী একটা আকর্ষণ অনুভব করলাম। এ ঘরে এসে খুলে দেখি মালঞ্চের প্রথম কবিতাটি আমার স্বামীর। বার কয়েক পড়লাম। কবিতা পড়ে আমার হৃদয় তন্ত্রীতে ঝঙ্কার উঠল। মনে হল এ যেন এক অপূর্ব আস্বাদ।

টিউশ্যানি করে ফিরে এসে আবার পড়লাম—পড়ে পড়ে মুগ্ধ হয়ে গেল। স্বামীর কাছে গেলাম। তিনি চোখ বুজে বিছানায় শুয়ে ছিলেন। ঘুমিয়ে কি জেগে রয়েছেন

জানি না। পায়ের কাছে বসে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলাম। অনুচ্চ স্বরে তাঁর কবিতাটি আবৃত্তি করছিলাম—

আমি যে দেখেছি তারে
হারানো নদীর পাড়ে
ঢেউ ঢেউ ধান সিঁড়ি কল কল ভাষ—
কে যেন বলেছিল, সময়ের আকাশ।
জলপরীরা পাল তুলে
নীল আকাশের কোলে
সীমানা হারায়।
আমি যে দেখেছি তারে—
বারে বারে নক্ষত্রের দেশে—
যেন সে রূপসীর চোখ
দূর থেকে আমাকে দেখে—
হাত নাড়ে ইশারায়।
হাজার বছর আগে,
সে নাকি চিনেছিল আমায়॥
আমি নাকি—সেই কবি—
বিরহের স্বরলিপি আঁক
পদ্মপত্র হৃদয়ে তার,—
অনুসূয়া বলেছিল বারংবার
বসন্ত গেলেও আসিবে আবার॥
প্রিয়ংবদা বলেছিল নাকি
কালিদাসের কালে,
আহা রে! কী রাগ ঢেলেছিল
অধর বদলে, কপোলে তার
পদ্মভ্রমে ওষ্ঠ মূলে
খুঁজে ভ্রমর আহার।

'আবৃত্তি শেষ হলে তিনি চোখ মেলে নীরবে আমার মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন, সে চোখে যেন কোনও ভাষা নেই, অর্থ নেই, আশা নেই। মহাশূন্যে যেন তাঁর চোখ নিবদ্ধ। আমি ভয় পেয়ে কেঁদে ফেললাম। উঠে কাছে গেলুম, কী হল কথা কও! কথা কও! চুপ করে এমন চেয়ে থেকো না। কান্নায় আমি তার কোলের ওপর ভেঙে পড়লাম।

এমনি করেই আমার হারানো নিধিকে নিজের কাছে ফিরে পেতে আকুল হয়ে উঠেছিলুম। যমুনা কি করে তাঁকে মুগ্ধ করে রেখেছিল জানি না। তিনি যেন

দিনের পর দিন নিজেকে হারিয়ে ফেলতে লাগলেন। আমি কান্নায় ভেঙে পড়লেও তিনি হাত তুলে আমার গায়ে মাথায় হাত রাখলেন না। ভগবান এ কি বিপদে ফেললে তুমি। আমি হতাশায় মুষড়ে পড়লাম। রাত্রে সুদীপকে বললাম দুপুরের কথা। সুদীপ পরদিন ডাক্তারের কাছে গিয়ে ওষুধ পালটে আনলে। বললেন, পরিবর্তন না হলে, আবার রোগী দেখবেন। আমার মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল—আবার এক কাঁড়ি টাকা! নিরুপায় হয়ে আবার পাপের পথে পা বাড়ালুম। আরেকটি কাব্য-গ্রন্থের ও ছোট গল্পের পাণ্ডুলিপি নিয়ে গেলাম সেই ভদ্রলোকের কাছে। তিনি কবিতাগুলো নিলেন না। শুধু গল্পটি নিলেন। অনেক অনুনয় বিনয়ের পর দিলেন দু'শো টাকা। ডাক্তার এলেন, রোগী দেখে চলে যাওয়ার সময় আমাকে বাইরে এসে বললেন, 'রোগী আগে যা করতেন সেইসব পুরনো অভ্যেস বা ক্রিয়াগুলো পুনরায় করান, নইলে স্মৃতিশক্তি বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। যদি পারেন কিছুদিন বাইরে ঘুরিয়ে আনুন। প্রচণ্ড মানসিক আঘাতে স্নায়ুতন্ত্রীগুলো দুমড়ে গেছে। পাহাড় এলাকায় গেলেই ভাল হয়। ওষুধ চলবে। অবনতিটা খুব দ্রুত হচ্ছে, কাজেই বিলম্ব করবেন না।' ডাক্তার এই হুঁশিয়ারী দিয়ে চলে গেলেন।

আমার কপাল কেমনভাবে পুড়েছে এবার বুঝতে পারছেন সম্পাদক মশাই?

আগে যা-ও দু'একটা কথা বলতেন এখন তা-ও বলেন না। 'হুঁ-হ্যাঁ' ছাড়া আর কিছু না। শুয়ে থাকা, বসে থাকা। কখনো নিঃশব্দ হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই উন্নতি দেখছি না। ভবিষ্যৎ বিভীষিকার কল্পনায় আমি আতঙ্কিত হয়ে দিন কাটাচ্ছিলুম। নিরুপায় হয়ে আবার একটা উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি নিয়ে বিক্রী করতে গেলুম, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য। ভদ্রলোক বললেন, 'আগের গল্প তিনটি বাজারে ছাড়া হলে কেমন বিক্রি হয় দেখে কিনবেন!' প্রচণ্ড হতাশা নিয়ে ফিরে এলুম অভিজিৎবাবুর কাছে। তিনি বললেন, 'অপেক্ষা করুন কিছুদিন। ওরাই খবর দেবে'খন। চুপটি মেরে বসে থাকুন গিয়ে।'

কিন্তু আমি কি 'চুপটি মেরে' বসে থাকতে পারি? টাকা আমার ভীষণ দরকার। অনুরাধা কি করল জানি না। অনেকদিন তো কেটে গেল একটা খবরও সে দিলে না। মা কালীর ফটোর কাছে দাঁড়িয়ে কাঁদলুম। শেষের দুশো টাকার দশ টাকাও আর নেই। অথচ—না, আর ভাবতে পারি না। একটা ক্ষীণ আশা নিয়ে আপনার মালঞ্চের ঠিকানায় আমার স্বামীর একটি 'শ্রোতা' নামের কবিতা পাঠালুম। কবিতাটি আমিই কপি করেছিলুম। কিন্তু কবিতার আগে পিছে কারো নাম ছিল না। সঙ্গের চিঠিটিতে আমার যে নাম লেখা ছিল আপনি কবিতার লেখিকা হিসেবে সেই নামই ছাপালেন। আসলে পঙ্কজা নামটি আমার ছদ্ম নামও নয়—এ নাম ঠাকুমার দেয়া। তিনিই শুধু পঙ্কজা নামে ডাকতেন। আর সবাই গঙ্গা নামে ডাকতেন। গঙ্গা নাম যে বাপের বাড়ির নাম একথা শ্বশুরবাড়ির সবাই জানে। কিন্তু নামটা নাকি সেকেলে সেকেলে,—সেজন্য আমার স্বামী ও তাঁর অকৃত্রিম বন্ধু সমীরবাবু

মিলে নাম দিলেন লিপিকা। কেন? লিপিকা নাকি খুব কাব্যিক নাম। শ্বশুর-বাড়ি এসে এটাই হল আমার সরকারী নাম। রেশন কার্ডও এই নামে। পঙ্কজা নামের কথা কেউ জানে না। কাজেই এটাকে আপনি ছদ্ম নামও বলতে পারেন। স্বামীর ভয়েই চিঠিতে আমি পঙ্কজা নাম ব্যবহার করি। পঙ্কজা নামের গূঢ় রহস্য কি জানেন! ঠাকুরমার মতে আমার মা ছিলেন কাদামাটি। তাতেই পদ্মের মত রূপ নিয়ে জন্মেছি বলে তিনি নাম রাখলেন পঙ্কজা। ঠাকুমার খুব রসবোধ ছিল না? আপনি তো আমাকে দেখেননি। দেখলে হয়ত বুঝতে পারতেন কার নামের সঙ্গে আমার মিল খুব বেশী। কিন্তু থাক এসব কথা। আসল কথায় আসি। তারপর আপনি টাকা পাঠালেন পঙ্কজা নামেই। সে কি আমার আনন্দ! আপনাকে লিখে বোঝাতে পারব না। শুধু আনন্দই নয়—ভবিষ্যতের আর্থিক দুর্গতি মোচনের ইঙ্গিত যেন পেলাম। আনন্দের আরো একটা কারণ ছিল। পাণ্ডুলিপি বিক্রির যে সর্বনাশা পথ নিয়েছিলুম—তা থেকেও মুক্তি পাব বলে আশা জেগেছিল।

মালঞ্চ আমাকে বাঁচার পথ দেখালেও এবং বাঁচিয়ে রাখলেও অন্যান্য কাগজেও কবিতা পাঠাতে লাগলুম। মালঞ্চের চিঠিপত্রের স্তম্ভে পাঠকের অভিনন্দন আমাকে উদ্দিপ্ত করে তুললো। পরের সংখ্যায় মালঞ্চ প্রকাশ করলো গল্প—'ছন্দপতন'। আবার অভিনন্দন, আবার টাকা। আপনার মালঞ্চ বর্তমান যুগের অন্যতম সাহিত্য পত্রিকা। আমার চেনা-জানা লোকদের বাড়িতে অনেকেই মালঞ্চ রাখেন। আমি যাদের বাড়িতে মেয়ে পড়াতুম সে বাড়িতেও আপনার মালঞ্চ। কাজেই আমার বুঝতে অসুবিধে হয়নি যে, আপনার মালঞ্চ বহুল প্রচারিতও। কোথাও কোথাও পঙ্কজা লেখা নিয়েও আলোচনা হতো। তখন আমার খুব আনন্দ হতো; কিন্তু বলতে পারতুম না—এ আমার স্বামীর লেখা বা আমার লেখা। এটাও কি কম দুর্ভাগ্য?

তাঁর লেখা ছিল অনেক। যাকে স্তূপ বলা হয়—তাই। এক আলমারী ভর্তি। তাই আমি সঙ্গোপনে কপি করে ছাপাতে লাগলুম। টাকা আসতে লাগলো। ওনাকে ওষুধ পথ্য ও পরিচর্যা দিয়ে সুস্থ করার চেষ্টার ত্রুটি রাখিনি। একটা কথা আপনাকে লিখতে ভুলে গেছলুম—সুদীপের মামাতো বোন সঞ্চিতা এসেছিল সুদীপের মামাকে নিয়ে। সে এক কাণ্ড। সুদীপের মামীমা যে অনুরাধা—আমাদের পরিচিত—তা তো সে জানতো না। যখন জানলে তখন আনন্দের সীমা রইলো না। অনুরাধার কাছে শুনলাম সমীরবাবু কাশীতে নেই। কোথায় আছেন কাশীর লোকেরা জানে না।

অনুরাধা কবিতা আবৃত্তি করল; সঞ্চিতাও আবৃত্তি ও গান দুই-ই করল। তিনি ওদের সঙ্গে দু'একটি মৃদুস্বরে কথাও বললেন। কিন্তু সঞ্চিতা বেশ খাতির জমিয়ে কথা বললে। বলল, 'কবি তুমি সিগেরেট খাও বলে আমি সিগেরেট এনেছি। খাবে না?' তিনি নিঃশব্দে হাসলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'খাবো?'

আমি তো অবাক। আমার কাছে অনুমতি! যেন অভয় দিয়ে বললুম, 'হ্যাঁ খাও।' ডাক্তার খেতে তো বারণ করেননি—বেশী খেতে বারণ করেছে। সঞ্চিতা দেওয়াল থেকে তার একটা ফটো এনে বললে, 'ইস্ কি মসৃণ মুখখানি গোঁপ-দাড়ি দিয়ে ঢেকে রেখেছেন কেন?' তিনি জবাব দিলেন না, শুধু ওর দিকে চেয়ে রইলেন—যেন ওকে চিনতে চেষ্টা করছিলেন। সঞ্চিতা ওর কাছে গিয়ে দু'হাতের চেটোতে ওঁর মুখখানি ধরে পাঁচ বছরের শিশুকে যেমন আদর করে তেমনি আদর করে নিজের বুকে চেপে ধরে সোহাগ জানাল। তিনি তার মুখের পানে তেমনি তাকিয়েই রইলেন।

'কী, আমাকে কী দেখছ কবি! চেনা চেনা মনে হচ্ছে না?' আশ্চর্য, তিনি মাথা নেড়ে জানালেন, 'হ্যাঁ।'

সঞ্চিতা হেসে বললে, 'ঠিক বলেছো—আমি তোমার ছায়া। আমি তোমার লেখা ভীষণ ভালোবাসি। তুমি লিখছ না কেন এখন? আব্দারের সুরে অভিযোগ করল সঞ্চিতা। স্বামী আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওকে মিষ্টি দাও, ও মিষ্টি খেতে ভালবাসে খুউব।'

আমরা তো অবাক। কয়েক মিনিটেই ওদের মধ্যে প্রেম জমে উঠেছে। অনুরাধার আনা মিষ্টিই দিলুম সবাইকে। উনি বললেন, 'ও সবার ছোট, ওকে বেশী দাও।' এরপর কে আর হাসি চেপে রাখতে পারে বলুন।

এমনি এক আনন্দঘন সন্ধ্যাকে মুখর করে দিয়ে ওরা চলে গিয়েছিল। সঞ্চিতার অভিনয়টা অপূর্ব হয়েছিল। এর সম্পূর্ণ কৃতিত্ব কিন্তু সুদীপের। অবশ্য ষোল বছরের শহুরে মেয়ে সঞ্চিতাও কম যায় না। আমার স্বামীর মনে যেন সে দাগ বসিয়ে দিতে পেরেছিল। আসলে আপনারা পুরুষরা মেয়েদের কাছে একেবারে বোকা। কোনটা সত্যি, কোনটা নকল বোঝেন না। কোন মেয়ে যদি মনে করে—মানে ইচ্ছে করে, আপনাকে নাচাবে আপনি নাচতে বাধ্য। তবুও আমরা দূরে দূরে থাকি কেন? আমরা আসলে স্বার্থপর। ন্যাচারেলিই সিরিয়াস। পুরুষরা যে খেয়ালী একথা সবাই জানে। তাই তারা স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবার ভয়ে দূরে দূরে থাকে না। যখন বুঝবে আপনার দ্বারা স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে না তখন সে দিলখোলা বাতাসের মতো হাল্কা।

ওরা চলে গেলে ক'দিন বাদে তিনি সুদীপকেই বললেন তোর বোনকে আর একদিন নিয়ে আয়না—বেশ ভাল লাগছিল মেয়েটাকে। মনস্তাত্বিক ডাক্তারের নির্দেশ মতো তার পরিচর্যা চলছিল বলে তিনি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে আসছিলেন। কিন্তু তিনি তার চুলদাড়ি কাটতে কিছুতেই রাজি হলেন না! ডাক্তার বলেছিলেন, পূর্বের অভ্যেস যতদিন না ফিরে আসছে ততদিন তাকে স্বাভাবিক মনে করার কোনও কারণ নেই। তাঁর সামনে দুঃখজনক কোনো ঘটনা যেন না ঘটে সে সম্বন্ধে সতর্ক থাকতেও বলেছিলেন। সতর্কই ছিলুম; তবুও যদি দুর্ঘটনা ঘটে তা হ'লে কী করতে পারি বলুন। ভাগ্যকে দোষ দেয়া ছাড়া আর কান্নায় বুক ভাসানো ছাড়া আর কি উপায় আছে আমাদের!

ফাল্গুনের প্রথম সপ্তাহেই রাজগীর বা ঘাটশিলা যাব ঠিক করেছি। অনুরাধাকে চিঠি লিখে ওদেরও মত করিয়েছি। একসঙ্গে যাওয়ার জন্যে অনুরাধা ও অনুরাধার

বর আর তার ভাসুর-ঝি—সঞ্চিতা হবে ওদের সঙ্গী। আমাদের সঙ্গে যাবে সুদীপ। দিন দশেকের প্রোগ্রাম। সেই মত আপনাকেও চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলাম। নিশ্চয়ই মনে আছে আপনার। কিন্তু যাওয়া হলো না। রওয়ানা দেওয়ার আগের দিন হঠাৎ সমীরবাবু এসে হাজির। সমীরবাবু তাঁর বন্ধুর এ অবস্থা দেখে খুব দুঃখ করলেও বন্ধু কিন্তু খুশীই হলেন। বললেন, 'ভেবেছিলুম গেরুয়া পরে সন্ন্যাসী যখন হয়েছিস তখন আর কি এই সব দুর্ভাগাদের কথা মনে থাকবে তোর ?'

'কেন! যখন তোদের বাড়ি তৈরীর হিসেব আর টাকা পাঠিয়েছিলুম তখনই তো জানিয়েছিলুম—হিসেবের গরমিলটা শুধরে দিয়ে যাব।'

স্বামী বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন—'কই না তো। তেমন কথা আমাকে তো কেউ বলেনি ?' জানেন আমার মাথায় বাজ ভেঙ্গে পড়ল! তবুও সাহস করে তাঁর সন্দেহ গাঢ় না হতেই বললুম -'হ্যাঁ হ্যাঁ, তিনি সে কথা চিঠিতে লিখেছিলেন।'

—'চিঠিতে ?' বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন স্বামী। ওফ্ কী সাংঘাতিক কথা! এক্ষুনি সেকথা প্রমাণ করতে না পারলে আমার প্রতি সন্দেহের বশবর্তী হয়ে অব্যক্ত ক্রোধে নজরুলের মত নির্বাকই হয়ে যান যদি। আমি নিরুপায় হয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে এ-ঘরে এসে আলমারী থেকে বাড়ির দলিল, খরচের হিসেব, চিঠি, সব নিয়ে এসে বললুম, 'এগুলো আর শ'দেড়েক টাকা অনুরাধা তোমার হাতে দেয়নি ? তুমি না পড়েই আমাকে দিলে তুলে রাখতে। মনে নেই, ভুলে গেছ ?' তিনি শুধু 'কবে' বলে আবার বিছানায় গা এলিয়ে দিলেন। আমি হতভম্ব সমীরবাবুকে বসতে বলে, ওর কাছে এগিয়ে গিয়ে তার মনে হওয়ার জন্যে বললুম—'সেই যে অনুর বন্ধু নিরুপমাকে নিয়ে এসেছিল, তখনই তো অনুরাধা ওগুলো তোমার হাতে গুঁজে দিয়েছিল, একটুও মনে পড়ছে না ?' আকুল হয়ে তাঁর মুখের 'পরে ঝুঁকে কথা কয়টি বললুম। তিনি এবারও মাথা নেড়ে জানালেন—'না মনে পড়ছে না।' বলুন তো কী সমস্যা ? এ যেন আমার প্রতি দুর্বাসার অভিশাপ। এত বড় জাজ্বল্যমান সত্যিটাকে তিনি বিশ্বাস করছেন না। হায় ভগবান!

আমি ছুটে গিয়ে সুদীপকে ডেকে এনে একটা ছোট্ট চিঠি লিখে অনুরাধাকে ডেকে আনতে পাঠালুম বাগবাজারে। কিন্তু অনুরাধা এল না। শ্বশুর বাড়ি। ইচ্ছে করলেই যখন তখন মেয়েরা আসতে পারে না। আমি চিরকুট মার্কা চিঠিতে সমীরবাবুর কথাও লিখেছিলুম—সে জবাবে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে লিখেছে—তার দুর্ভাগ্য, শত চেষ্টা করলেও তার আজ আসা সম্ভব নয়। সমীরবাবু যেন আজ থাকেন, কাল তো বিকেলে দেখা হবেই। নইলে হাওড়া স্টেশনে যেন থাকেন। অনুরাধার চিঠিখানি সমীরবাবুকে দেখালুম। তিনি হাসলেন। পরে বললেন, তাঁর থাকার উপায় নেই। তিনি বরং হাওড়া স্টেশনে কাল হাজির থাকার চেষ্টা করবেন—' বলে তাঁর ঝুলনা থেকে আমার হারছড়া বের করে দিয়ে পুনরায় বললেন, 'এটা চিনুদির স্মৃতি, নষ্ট করতে মন চাইল না। তোমার জিনিস তোমাকে দিতে পেরে আমি নিশ্চিন্ত হলুম।'

—'তা হ'ল, বাড়তি টাকাটা কে দিয়েছে একথা তো উল্লেখ করতে হয় হিসেবে।

নইলে তাই নিয়ে আবার আরেক দফা জট পাকাবে না?' বললুম সমীরবাবুকে। সমীরবাবু যে আজ হঠাৎ স্বামীর সামনেই আমাকে 'তুমি' বললেন—এজন্যে আমার মনের মধ্যে বিস্ময় জেগেছিল। সেকথা বাইরে প্রকাশ যাতে না হয় তার জন্যই তড়িঘড়ি হিসেবের কথা তুলে ওটাকে ঢাকতে চাইলুম। তা ছাড়া আমার শংকাই ছিল—এই হিসেব নিয়ে আবার সন্দেহের মেঘ ঘনিভূত হতে পারে। বাড়তি টাকাটা যে চিনুদির নয় এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। তা'হলে চিনুদির নামেই জমা থাকত। আর সমীরবাবুর নিজের কোন টাকা নেই। তিনি নির্লিপ্ত ভবঘুরে দায়হীন মানুষ। তাঁর টাকা জমা রাখার কোন কারণ নেই। কাজেই যে টাকাটা, খরচ হয়ে গেল তা এলো কোত্থেকে,—এ প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছে। সমীরবাবু আমার কাছ থেকে হিসেবের খাতাটা তুলে নিয়ে জমার ঘরে তাঁর নিজের নাম বসিয়ে দিলেন। আমি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলুম—'আপনি?'

—'কেন? আমি দিতে পারি না? বন্ধুর বিয়েতে আমি কোন যৌতুকই তো দিইনি। আজ যখন সুযোগ পেলাম—সে সুযোগ সদ্‌ব্যবহার করলাম মাত্র।' হাসতে হাসতে কথাগুলো বলেছিলেন সমীরবাবু। সমীরবাবু তো জানেন না—আট বছর বাদে যৌতুক দিতে আসায় কী ভয়ানক ঘটনা ঘটতে পারে? আমি তাঁর কথাটাকে হালকা করার জন্যে হেসেই জবাব দিয়েছিলুম—'আট বছর বাদে কেউ যৌতুক দেয় নাকি?' কথাটা বলে চোখ ফিরিয়ে দেখি স্বামী আমার পানে স্থির চোখে চেয়ে আছেন—যেন আমার কথাটার কতটা যৌক্তিকতা আছে তাই বিচার করছিলেন।' সমীরবাবু অবশ্য সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই বললেন—'দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে আমি যখন নাথব্যাংকে চাকরি করতুম তখন এক বন্ধু আমার কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়েছিলেন। তারপর নাথব্যাংক লিকুইডেসনে উঠে গেল। আমার সঙ্গে ঐ বন্ধুর আর দেখা নেই প্রায় দুই যুগ। আমার মনেও ছিল না। তোমাদের বাড়ি যখন তৈরী হচ্ছিল তখন হঠাৎ একদিন দেখা হল কেওড়াতলা শ্মশানে আমাদের এক বিপ্লবী নেতার শবদাহ করতে গিয়ে। বন্ধুটিই আমাকে নাম ধরে ডেকে বললেন—'আমাকে চিনতে পারছ বলে মনে হচ্ছে না।' আমি তো অবাক। চিনব কি করে? সেকি আর সেই শিশুরঞ্জন শিশু আছে নাকি—ইয়া মোটা আর ইয়া লম্বা পাহাড় হয়ে গেছে শিশুরঞ্জন। তারপর আমাদের আশ্রমে একদিন এল সে। বললে, তার বড়লোক হওয়ার ইতিহাস। মিলিটারীতে কী একটা মাল সাপ্লাই করে অনেক টাকা পেয়েছিল। তা দিয়েই বিরাট ব্যবসা ফেঁদে বসেছে। সে-ই বললে, 'তোমার মনে না থাকবারই কথা—কারণ পাওনাদাররা অনেকেই তার পাওনার কথা ভুলে যায়—কিন্তু দেনাদার ভোলে না। দেওয়ার ক্ষমতা না থাকলে সে পালিয়ে বেড়ায় বটে আর যখন দেনা শোধের ক্ষমতা হয় তখন গায়ে পড়েই নিজে এসে দেনা শোধ করে।' বলে সমীর-বাবু খুব হেসেছিলেন। তারপর একটু থেমে বললেন, 'চিনুদি নেই। আশ্রমে যে কটা মানুষ ছিলুম খুব কষ্টে চলছিলুম। শিশুর তিন হাজার টাকা পেয়ে কিছু লাঘব হল। ঐ সুযোগে বন্ধুর বিয়ের যৌতুক হিসেবে শ'টের টাকাটাও জমা করেছিলুম'—বলে আবার হাসলেন। স্বামীর দিকে যখন চোখ পড়ল—দেখলাম

তিনি তেমনি সমীরের মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁকে বললাম—'এবার বুঝেছ ব্যাপারটা কি হয়েছিল?' স্বামী হ্যাঁ-না কিছুই বললেন না। তাঁর চোখ দেখে মনে হচ্ছিল তিনি যেন ব্যাপারটা মোটেই বিশ্বাস করেননি। তবুও তাঁর সন্দেহের ভাবটাকে পরে বোঝাপড়া করা যাবে মনে করে সমীরবাবুকেই বললাম—'চা খাবেন তো?' আমাকে অবাক করে দিয়ে সমীরবাবু বললেন—'চা কেন, সময় থাকলে ভাতও খেতুম।' আমি খুশী হয়ে বললাম—'বাঃ, এ ত আমার পরম সৌভাগ্য। বসুন সন্ধের মধ্যেই খাইয়ে দিতে পারব।' বলে ও-ঘর থেকে চলে আসছিলুম—পেছন থেকে সমীরবাবুর ডাক শুনে ফিরে যেতেই, বললেন—'আজ নয় বৌদি। একদম সময় নেই। এক্ষুনি চলে যেতে হবে। যদি বেঁচে থাকি আর একদিন আসব। সেদিন তোমার হাতের রান্না খেয়ে পারি তো সুখ্যাতি করব'—বলে নিজেই হাসলেন। তারপর তাঁর বন্ধুবরের দিকে হাত বাড়িয়ে করমর্দনের জন্যে এগিয়ে দিয়ে বললেন—'দ্যাখ্ মনটাকে আমার মত খোলামেলা রাখ। দেখবি অসুখ-বিসুখ কিছু থাকবে না।' কিন্তু বন্ধু হাত বাড়াল না। আমি বললাম—'এখন কোথায় আপনার আস্তানা?' 'ভারত সেবাশ্রম; হরিদ্বার' বলে দ্রুত বের হয়ে গেলেন। কিন্তু পরক্ষণেই ফিরে এসে ঝুলনা থেকে কতগুলো খেলনা ও চকলেটের বাক্স বার করে বললেন—'কী অবস্থা দেখছ। আসল কাজটাই ভুলে গেছিলুম। কোথায় তোমার মেয়ে কী নাম রেখেছ?'

আমি সবিস্ময়ে খেলনাগুলো হাতিয়ে দেখতে দেখতে বললুম—'মা-মণি বলে ডাকি। ইস্কুল থেকে এল বলে। একটু বসুন।' তিনি বসলেন না, চলে গেলেন। যাবার সময় প্রথা অনুযায়ী তাঁকে এগিয়ে দিতে গেটের কাছে এসে ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'সত্যি যদি কোনোদিন আমাকে প্রয়োজন মনে কর, তবে এই ঠিকানায় চিঠি দিও'—বলে একখানি ছোট্ট কার্ড আমাকে দিয়ে হন্‌হন্‌ করে বেরিয়ে গেলেন। যতক্ষণ তাঁকে দেখা যায় ততক্ষণ-ই আমি তাকিয়ে ছিলুম। সেই মুহূর্তেই হঠাৎ আমার মনে হয়েছিল—তাঁর সন্ন্যাস জীবনের জন্যে কি আমিই দায়ী? আমাকে কেন্দ্র করে যদি দুই বন্ধুর অন্তর্দ্বন্দ্বের দানা না বাঁধত তা হলে হয় তো নীলাঞ্জনবাবুই সমীর-অনুরাধার মিলন ঘটাত।

* * *

পরদিন ঘাটশিলা যাবার প্রোগ্রাম তিনি খারিজ করে দিলেন। তিনি জেদ ধরলেন—'সমীরবাবুর আসার কথা, হারের কথা, টাকার কথা এসব তার কাছে গোপন করলাম কেন—বলতে হবে।' বলুন তো কি বিপদ? অবুঝ শিশুর মত জেদ ধরে বললেন—'গোপনীয়তার কি কারণ, না বললে যাবেন তো না-ই, এমন কি ওষুধ পথ্যও খাবেন না। আমি অনেক করে বোঝাতে চেষ্টা করলুম কিন্তু তাঁর মনের সন্দেহ দূর করতে পারলুম না। তীরের কাছে নৌকা এসে ডোবার মত অবস্থা। নিজের প্রতি ঘেন্না এল। এত করে বেশখানিকটা সুস্থ করে তুলেছিলাম—এখন যদি আবার সন্দেহ রোগে পেয়ে বসে তাহলে আবার···। আর ভাবতে পারছিলাম না। আমি হাতের শাখা ছুঁয়ে, নোয়া ছুঁয়ে শপথ করে বললুম—'তোমার কাছে কিছু গোপন করিনি—এসব তো তোমার নিরুপমাও জানে, অনুরাধাও জানে। নিরুপমার

কাছেই তো কাগজপত্র, দেড়শ টাকা, চিঠি সব দিয়ে গেছলেন সমীরবাবু। নিরুপমা আমাদের বাড়ি চেনে না বলে সে অনুরাধাকে নিয়ে এসে এসব দিয়ে গেল—এই সেদিনের কথা ভুলে গেলে? আমি যদি নিরুপমার বাড়ির ঠিকানা জানতুম, তাহ'লে ওকে ধরে নিয়ে এসে প্রমাণ করে দিতুম। বিশ্বাস কর, কিছু গোপন করিনি?' কাঁদতে কাঁদতে এসব কথা তাঁকে বলেছিলাম। তিনি নির্বিকার চিত্তে স্থিতধীর মত অনড় হয়ে বসে রইলেন।

বেলা বাড়তেই সুদীপ এল আমাদের প্রস্তুতি কতটা হল জানতে। তাকে আর ও-ঘরে নিয়ে গেলুম না। আমাদের কুৎসিত ব্যাপারটা, ও জানুক আমি তা চাই না। শত হলেও ও ছেলেমানুষ। ওর মনে কি প্রতিক্রিয়া হবে, কে জানে? বললুম—'আমার যাওয়া হবে না, টিকেট ফেরৎ দিয়ে দিও। তোমার মামীরা যাক্। তাদের বলবে ওনার শরীর হঠাৎ খারাপ হয়ে পড়ায় যাওয়া হল না। তুমি যদি যাও, ওদের সঙ্গে চলে যেও। সুদীপ বললে—'তা-কি হয় বৌদি, আমি হচ্ছি তোমার লোক। তোমরা না গেলে আমিও যাবো না। 'শরীর সুস্থ হোক, পরে যাওয়া যাবে' বলে সে চলে গেল।

বারোটা বাজতেই নিজেই চান করতে গেলেন তিনি। অন্যদিন আমি ধরে নিয়ে গিয়ে চানের ঘরে ঢুকিয়ে দিতুম—আবার নিয়ে আসতুম।

খেতে দিতে গিয়ে দেখি তিনি চিরুনি হাতে জানলার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন। বললাম—'কি হল এখনো চুল আঁচড়াওনি। ভাত তো ঠাণ্ডা হয়ে যাবে' বলে টেবিলে ভাত রেখে ডিস্ চাপা দিয়ে মাথা আঁচড়ে দিতে এলুম। তিনি হঠাৎ ফিরে বললেন,'ওরা কি চলে গেছে?' কি সুন্দর সুস্থ লোকের কথা। আনন্দে সকালবেলার কান্নাকাটি নিরানন্দ ধুয়ে-মুছে চলে গেল। বললুম—'বোধ হয় সুদীপ এখনো যায়নি। ট্রেন তো রাত সাতটায়। খবর দেব?'

খেতে বসে বললেন, 'না থাক। আমি তো যাবো না।' 'খবর নিয়ে কি হবে তা'হলে?'—জিজ্ঞেস করলুম। তিনি খেতে বসে আস্তে আস্তে—টেনে টেনে জবাব দিলেন, 'না ভেবেছিলুম তুমি ওদের সঙ্গে স্টেশনে একবার গেলে পারতে।'

—'কেন? কি হতো গিয়ে? আমরা যখন যাচ্ছি না'—আমার কথায় বাধা দিয়ে বললেন—'তোমার একটা কৃতজ্ঞতা থাকা উচিত।' তিনি কি বলছেন আমি বিন্দু বিসর্গও বুঝতে না পেরে বললুম—

—'মানে?'

তিনি দু গ্রাস খেয়ে পুনরায় বললেন—'মানে বোঝনি? এতো কিছু বোঝ আর এটা বোঝোনি?' আমি তীক্ষ্ণ হয়ে জবাব দিলুম—'না কিছুই বুঝলাম না। তোমার হেঁয়ালী বোঝার সাধ্য আমার নেই।'

তিনি হাত তুলে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—'হেঁয়ালীর কী আছে। সমীর চলে যাবে। তাকে একবার শেষবারের মতো দেখে আসবে না?' 'ও—তাই।'—বলে আমি হেসে ভেঙে পড়লাম। 'এই সামান্য কথাটা বোঝাতে এতক্ষণ লাগল তোমার—এ জন্যেই ছাত্ররা পয়সা দেয় না। পড়ে পড়ে সব চলে যায়'—হাসতে হাসতে খুঁচিয়ে

দিলুম ওঁকে। রান্নাঘরে দুধ নিতে এসে মনে হল—আমাকে অভিযুক্ত করে উনি বেশ চাঙা হয়ে উঠেছেন। সংসারে বোধ হয় এক ধরনের মানুষ আছে—যারা হেরে গেলেই মরে যান—জিতে গেলে বেঁচে ওঠেন। যমুনার কাছে এবং প্রকারান্তরে আমার কাছেও তিনি হেরে গিয়েছিলেন। তাই এমন ভেঙে পড়েছিলেন। কাল সমীরবাবুর ব্যাপারটা নিয়ে আমাকে অপরাধী সাব্যস্ত করে, আবার সহজেই চাঙ্গা হয়ে, সরব হয়ে উঠেছেন। বিচিত্র বটে।

হাওড়া স্টেশনে সমীরবাবুকে দেখতে যাওয়ার খোঁচাটায় আমি ক্রুদ্ধ না হয়ে হেসে উড়িয়ে দিয়ে বুদ্ধিমতীর কাজই করেছি। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো সমীরবাবুকে ও আমাকে জড়িয়ে এ অপবাদ দেওয়ার মধ্যে তাঁর যত বড় আত্মতৃপ্তিই থাক না কেন, এ ভয়ানক অন্যায়। সমীরবাবুকে হাওড়া স্টেশনে যেতে বলেছিলাম সেই হতভাগিনীর জন্য। যে হতভাগিনী সারা জীবন তপস্যা করেও যাকে ইচ্ছেমতো দেখতেও পায়নি,—তাকে এক পলক চোখের দেখা দেখার জন্য। আমিও তো নারী। আমি জানি ভালোবাসার মানুষকে কাছে পেয়ে দেখা কি জিনিস। নারীর এই পাওনা যুগ-যুগান্ত ধরেই দুর্লভ হয়ে আছে। ইচ্ছে থাকা সত্বেও অনুরাধা কাল আসতে পারল না। তাই তার অনুরোধ ছিল যেন সমীরবাবু স্টেশনে যায়। অথচ আমার স্বামী উলটো ধারণা করেই বসে আছেন। হায় ভগবান! বাইরে যাব বলে টিউশানি বাড়ি থেকে ছুটি নিয়েছিলুম। খাওয়া-দাওয়ার পর কখনো তার গল্প পড়ে, কখনো কবিতা পড়ে, কখনো কপি করে, কখনো নিজের পড়া পড়ে কাটছিল। তিনি যে আমাকে ও সমীরবাবুকে নিয়ে এত বড় খোঁচা দিলেন তা নিয়ে তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে গেলুম না। হোক তাঁর জিত তবুও যদি তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে ওঠেন, সেই আমার ভাল। অক্ষমতাকে প্রবোধ দিলাম—থাক্—সেই ভাল বলে। কিন্তু কপালে যখন দুঃখ লেখা থাকে—তাকে কে খণ্ডাবে বলুন। এই সন্দেহবাতিক মানুষটা সম্পর্কে আমি সর্বক্ষণ সতর্ক-ই ছিলুম—তবু দুর্ঘটনা ঘটলো আর একদিন।

সেদিন ছিল চৈত্রের মধ্যাহ্ন। স্বামীকে খাইয়ে রান্নাঘরে খেতে বসেছি। হঠাৎ তিনি বড়ঘরে অর্থাৎ আমার ঘরে ঢুকলেন। রান্নাঘরের কপাট খোলা থাকলে—ঘরে কে এলো-গেল, দেখা যায়। ওঁকে এ সময় এ-ঘরে ঢুকতে দেখতে পেয়ে আমি বিস্মিত ও শংকিত হলুম। শংকার কারণ হলো তাঁর কবিতার ডাইরি বইগুলির একটা আমার টেবিলে ছিল। সঙ্গেই ছিল কপি করার খাতা। সে খাতায় কয়েকটি কবিতা আমার হাতে কপি করাও ছিল। কিন্তু তিনি টেবিলে নজর দিলেন না। দিলেন আমার আলমারীর দিকে। যেটায় আমাদের পরিবারের কাচা কাপড়-জামা ও কিছু সাজের জিনিস থাকে। সেই আলমারীরই-নীচের তাকে যেখানটায় কাঁচের বদলে কাঠের কপাট, সেখানেই রয়েছে আমার গুপ্ত সম্পদ। অর্থাৎ পঙ্কজা নামে যত রচনা যত পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে—সে সব পত্র-পত্রিকা। আর কিছু গল্পের ও একটি উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি। পত্র-পত্রিকাগুলির উপরেই রয়েছে আপনার সুদৃশ্য প্রচ্ছদের মালঞ্চ। ওঁকে আলমারীর সামনে দাঁড়িয়ে কাঁচের ভেতর দিয়ে উঁকি মারতে দেখে আমি এঁটো মুখেই উঠে এলুম। বললাম—'কি খুঁজছো?' তিনি বললেন—

'যমুনার কি কি জিনিস আছে বের করে দাও তো।' সহজ শান্ত কণ্ঠে বললেন। আমার আঁচলেই চাবির গোছা বাঁধা ছিল। বাঁ হাতে আঁচল তুলে চাবির গোছায় আলমারীর চাবিটা দেখিয়ে বললুম—'এইটে'। আলমারী খুললে, বাঁ হাতের তর্জনি তুলে দেখিয়ে বললুম—'এই তাকে যা আছে সব তার। আর এই তাকের এই অর্ধেকটাই ওর সাজের জিনিস।' একটু থেমে গলার স্বর নামিয়ে বললুম, 'কেন—কেউ নিতে এসেছে বাড়ি থেকে?' তিনি গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, 'না। এগুলি আমি আমার ঘরে নিয়ে যাবো—আমার চোখের সামনে রাখব।' আমি অবাক হয়ে থাকলেও কিছু বলার ছিল না। এটাও যে এক ধরনের বিকৃতি এ আমার বুঝতে বাকী বইলো না। বললাম, 'দাঁড়াও আমি হাত ধুয়ে আসি'—বলে ছুটে গিয়ে হাত ধুয়ে এসে যমুনার সব কাপড়-জামা আমার বিছানায় রাখলাম। একবারে এতসব নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয—তাছাড়া এতসব ওই ঘরে রাখবেনই বা কোথায়—তা হ'লে তার বইয়ের আলমারীর এক তাক বই সরিয়ে দিতে হয়। কিন্তু সে প্রশ্ন তাঁকে না করে—কাপড়-জামা নামাতে লাগলুম। তিনি হঠাৎ বললেন—'ওর একটা আংটি ছিল?' হ্যাঁ দিচ্ছি বলে স্যাকরার দেওয়া বাক্স সমেত আংটিও দিলুম। তারপর আবার বললেন—'ও যে খাতায় হিসেব লিখতো 'সেটা কোথায়, সেটা দাও।' আমি প্রমাদ গুনলাম। সত্যি সে খাতাটা যে কোথায়—তা আমার খেয়ালও নেই। খোঁজ রাখার প্রয়োজনও মনে করিনি। এদিক সেদিক খুঁজলাম, পেলাম না। হাঠাৎ মনে হল ওটা ব্যেধ হয় নীচের তাকেই রেখেছে—কিন্তু এখন বের করি কী করে। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বের হয় যদি? বললুম—'পরে খুঁজে দেব'—তিনি তাতে সন্তুষ্ট নন, তাঁর এখনই চাই।

—এখন অসুবিধে কি?

—আমি খাইনি হাত ধুয়ে এসেছি।

—ও আচ্ছা। যাও। আমি দেখছি।

—'না তোমায় দেখতে হবে না—তুমি ওলট পালট করে দেখবে।' বলে বাধা দিলুম। কিন্তু উনি সে কথা শুনলেন না। নিজেই প্রতিটি তাক তন্ন তন্ন করে দেখতে লাগলেন। আমি সরে এলাম। কেন জানিনে—আমার হাত পা কাঁপছিল। তিনি আলমারীর নীচের তাক থেকে যমুনার হিসেবের খাতা ও খানকয়েক মালপত্র নিয়ে চলে গেলেন। আমি ঢাকা ভাত নিয়ে খেতে বসেছিলাম,- কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর ক্ষিপ্ত কণ্ঠের ডাক শুনে আবার ঐ এঁটো হাতেই ছুটে গেলুম তার ঘরে। আমাকে দেখে ক্রোধে ফেটে পড়লেন—'আমার কবিতা চুরি করে কাকে দিয়েছ ছাপতে? কে সে পঙ্কজা?' ভয় আমার আগেই ছিল কিন্তু তার এই জাতীয় ক্রোধের সাক্ষাৎ আমার জীবনে এই প্রথম। চোখ দুটো যেন ক্রুদ্ধ বাঘের মতো। আগুনে চোখ বাইরে ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল। ওষ্ঠসহ সমস্ত মুখমণ্ডলে যেন ভূ-কম্পন চলছিল। যেন কোন কথা আর মুখ দিয়ে সরছিল না। আমি ভয়ে বিহ্বল। অমন প্রচণ্ড ক্রোধের মুখে আমার যেন সমস্ত শক্তি নিঃশোষিত। জবাব দেওয়ার মতো শব্দ আমার মুখ থেকে কোথায় হারিয়ে গেছিল, যেন নিঃস্পন্দ হয়ে গেছিলাম। শুধু ভীত চোখে ক্রোধের অসীম শক্তি দেখছিলুম।

এ ভাবে কতটা সময় গিয়েছিল জানি না—হঠাৎ তাঁর ঠোঁট ফাঁক হয়ে বজ্রের মতো শব্দ বার হ'ল, 'জবাব দাও—নইলে'—

নইলে কী হবে, কী ঘটতে পারে আমি অনুমান করতে পারি না। আমার বুকের কাঁপুনিটা সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়েছিল।

আহত সিংহের ক্ষতস্থান শুকিয়ে সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে উঠতে না উঠতেই আমার এই মূর্খামির আঘাত যে এত নির্মম হয়ে তাঁকে এত ক্ষিপ্ত করে তুলবে এ কল্পনায়ও আসেনি।

আমি জবাব দিতে পারলাম না। গোড়া কাটা গাছের মতো তাঁর পায়ের উপর পড়ে গেলুম—'অন্যায় করেছি, ক্ষমা করো।'

কে পঙ্কজা সে কথাও জানতে চাইলেন না। তড়িৎ বেগে পা টেনে নিয়ে বিছানা উলটে—তলায় চাবি খুঁজতে গিয়ে না পেয়ে হুঙ্কার দিয়ে চাবি কোথায় জানতে চাইলেন। আমি আঁচল থেকে নিঃশব্দে চাবি খুলে দিয়ে তাকিয়ে রইলাম। তিনি আলমারি থেকে সমস্ত পাণ্ডুলিপি বার করে মেঝেতে স্তূপীকৃত করে পাগলের মতো তন্ন তন্ন করে কি খুঁজতে লাগলেন। আমি দৌড়ে কবিতার ডাইরি তিনটে এনে দিলুম। কিন্তু তবু তাঁর খোঁজা বন্ধ হ'ল না। আমি রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে ছিলুম। মুখ তুলে বললেন, আমার 'দিন-রাত্রির কথা', 'ললিত পাল', 'কলমীফুলে গন্ধ'—গল্পগুলি কোথায়? আমার উপন্যাস—'রাজনর্তকী', 'বন্দনা'?

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম—স-সংকোচে মৃদু স্বরে বললুম—'আমি নিয়েছি।'

—'তুমি নিয়েছ?' দু'চোখে তাঁর প্রশ্নের সঙ্গে সর্বস্ব খোয়ানোর আতংক।

'দাও! শিগ্‌গির দাও!!' বলে হাত বাড়ালেন। এক্ষুনি দিতে হবে তাঁকে। কিন্তু কোথা থেকে দেব! নির্বাক হয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিলুম। কী বলবো,—কোন কথা মুখে আসছিল না। হঠাৎ মনে হ'ল—গলাটা যেন শুকিয়ে গেছে। না ভিজলে গলা দিয়ে কথা বের হবে না। জিভ দিয়ে ভেজাতে চেষ্টা করলুম। জিভও শুকনো। একটু আঠা আঠাও করতে পারলুম না। কোথা থেকে আসবে। সে পাণ্ডুলিপিগুলো হয়তো নানা পথ ঘুরে ছাপাখানায় চলে গেছে। অন্যের নামে ছাপা হচ্ছে। বার দুই প্রশ্নের পরও যখন আমার মুখ থেকে একটা কথাও বার করতে পারলেন না--তখন হঠাৎ আরো ক্রোধে জ্বলে উঠে এসে আমার গালে ঠাস্ করে একটি চড় বসিয়ে বললেন—'কথা বলছ না যে?'

ব্যথা পেয়েছিলাম কিনা মনে নেই—তবে মুখটা ঘুরে গিয়ে যে কপাটের গায়ে আছড়ে পড়েছিল তা মনে আছে। সঙ্গে সঙ্গে চোখ দিয়ে জলের ধারা নেমে আসেনি সে কথাও মনে আছে। বেশ খানিক বাদে আবার যখন ধমক খেলুম—'বলবে না?' অর্থাৎ আবার বজ্রাঘাতের ভয়ে আমার অজান্তেই যেন মুখ থেকে গোপন কথাটি বের হয়ে গেল—'আমি বেচে দিয়েছি।' তড়িতাহত কণ্ঠে আর্তনাদের মতো চেঁচিয়ে উঠলেন, 'বেচে দি-য়ে-ছো? আমার বুকের পাঁজর বেচে দিয়েছ? বেচে দি-য়ে-ছো।' কথা কয়টি বলতে বলতে তিনি যেন অনিশ্চিত অন্ধকারের অতল তলে ডুবে গেলেন। তাঁর সমস্ত তেজ, সমস্ত তীক্ষ্ণতা, তাঁর সমস্ত ক্রোধ যেন নিমিষে লুপ্ত হয়ে গেল।

আমার ভয় হ'ল। নজরুলের বাকরুদ্ধের কথা মনে পড়ল। একটু বাদে আস্তে আস্তে আপন মনে বলতে লাগলেন—'তুমি আমার শিল্পকে—সাধনাকে—সৃষ্টিকে বেচে দিয়েছ। আমার সমস্ত জীবনের সাধনাকে—উহ্'—

আমি আর এই মর্মান্তিক বেদনার চিত্র দেখতে পারলুম না। চলে এলুম। বিছানায় পড়ে বালিশ চেপে ধরে অঝোরে কাঁদলুম। কী হবে কে জানে। ভগবান কোন্ মূঢ়বুদ্ধি পেয়েছিল আমাকে—কৃত পাপের অনুতাপে দগ্ধ হতে লাগলাম।

অভাব অনটন সবারই হয়। সবারই থাকে। তাই বলে কি সে তার সন্তান বিক্রি করে দেয়—ঠগের হাতে, জহ্লাদের হাতে, বেইমানদের হাতে? যারা মুনাফার লোভে লেখকের নাম পর্যন্ত মুছে দেয়—আমার এই পাপের ফলে যদি তিনি ভগবান না করুন কিছু হয়ে যান! জানেন তখন আর নিজেকে নিজে অপরাধী করেও আত্মগ্লানীতে জর্জরিত হয়েও থাকতে পারছিলুম না। উঠে টেবিলে কাগজ চাপা পাথরটা নিয়ে কপালের হাড় ভেঙে ফেলতে বারকয়েক প্রচণ্ড জোরে আঘাত করেও নিষ্কৃতি পাচ্ছিলাম না।

হঠাং শোঁ-শোঁ শব্দে বাইরে তাকিয়ে দেখি উঠোনে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। আমি কিছু বোঝার আগেই শ্মশানের চণ্ডাল হরিশ্চন্দ্রের মত আমার স্বামী তাঁর শেষ সৃষ্টিটুকু ছবির বাক্সটাও ওই রাক্ষুসী আগুনে নিক্ষেপ করে হাতের লাঠি দিয়ে মৃতদেহকে চিতায় যেমন তুলে দেয়, তেমনি অর্ধদগ্ধ কাগজগুলো আগুনের লেলিহান জিভে ঠেলে ঠেলে দিচ্ছেন।

আমার শুধু এইটুকুই মনে আছে চিৎকার করে আমি যেন কিছু বলতে চাইছিলাম। তারপর আর মনে নেই।

* * * * *

চৈত্রের খরতাপের অসহনীয় তীক্ষ্ণতাকে হার মানিয়ে বৈশ্বানরের উত্তাপ ও লেলিহান জিহ্বা বোধহয় 'আগুন- আগুন' বলে একটা কোলাহলও সৃষ্টি করেছিল।

আমার যখন জ্ঞান হ'ল,—আমার চারিদিকে চেনা-অচেনা মানুষের ভিড় দেখে তাই মনে হয়েছিল। তবে তখন আর দুপুর ছিল না। চারিদিকের গাছের ছায়া আমার চারপাশের মানুষগুলির চোখ মুখের বিষাদমাখা রূপকে যেন আতঙ্কিতও করে তুলেছিল। এবং কী যে একটা সাংঘাতিক ঘটনা ইতিপূর্বে ঘটে গিয়েছিল—সেই মুহূর্তে আমি তা' কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না। চোখ মেলে তাকালেও কিছু বলতে পারছিলুম না। গলা জিভ শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। আমার মাথার কাছে ডান পাশে সুদীপের মায়ের কোলে মা-মণি ভীত চোখে তাকিয়ে ছিল। ওর চোখে জল নেই, কিন্তু জলের দাগ গাল বয়ে নিচে নেমে গেছে। বেদনায় বিমর্ষ সুদীপ দু'হাত আড়াআড়ি করে দুই কনুইয়ে ছুঁইয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে আছে। আমার মনে হয়েছিল একটু আগে আমার বুকে চাপা দেওয়া প্রকাণ্ড পাথরটা যেন এইমাত্র কেউ সরিয়ে দিয়েছে। আমি যেন এখন একটু একটু নিঃশ্বাস নিতে ও ফেলতে পারছি। জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে দেখালুম—'একটু জল দাও' সুদীপের মা, মামণিকে কোল থেকে নামিয়ে বাঁ-হাতে একটি ভাঙা এ্যম্পুল সহ

ইনজ্যাকশানের গরম জলের বাটিটা সরিয়ে আমার আরো কাছে সরে এসে একটি মেয়ের হাত থেকে একটি গেলাস এনে আমার মুখে একটু একটু করে কয়েক ফোঁটা জল দিলেন।

আমি তাকিয়ে ছিলুম। বোধ হয় চোখের কোণ বয়ে জল আসছিল—তিনি আঁচলে চোখ মুছিয়ে দিলেন। তারপর দুধের গেলাস মুখের কাছে এনে বললেন—'এটুকু খেয়ে নাও বৌ।' আমার ভীষণ খিধে পেয়েছিল বুঝিনি। মাথা নেড়ে আপত্তি জানাতেই তিনি কপট ধমকের মত বললেন, 'না বললে আমি শুনব কেন। ডাক্তার বলে গেছেন খেতেই হবে। খেলে তবে তো উঠতে পারবে।'

'কেন—আমার কি হয়েছে?' আমার একথার জবাব তিনি দিলেন না। দুধের গেলাস মুখে আস্তে আস্তে ঢেলে দিলেন। আমি সবটা দুধই খেয়েছিলুম। এতটুকু বিস্বাদ লাগেনি। ভাল লেগেছিল। আরো দিলে আরো খেতে পারতুম হয়ত। এতক্ষণে আমার মেয়ে মামণি কাঁদো কাঁদো গলায় কথা বলল—'মা-মা, বাবা চলে গেছে!' ওর কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আবার উঠোনের দিকে মাথা তুলে তাকালুম কয়েক লহমা। কিচ্ছু নেই, সব শেষ হয়ে গিয়েছে। কালো কালো ছাই। চৈত্রের বাতাসে মাঝে মাঝে উড়ে যাচ্ছে। বুকের ভেতরে একটা অসহ্য যন্ত্রণায় 'ওহ' বলে চোখ বুজে পড়ে রইলুম। ধীরে ধীরে—প্রতিভার আত্মহননের নিষ্ঠুর প্রক্রিয়ার লেলিহান শিখা যেন আমাকেও দগ্ধ করছে। মামণি চিৎকার করে মা মা বলে আমার বুকের 'পরে লুটিয়ে পড়ল। ওর কান্না থামাতে উঠে বসলাম। অবিন্যস্ত ভিজে কাপড় ঠিক করতে করতে সুদীপের দিকে তাকিয়ে বললুম—'চলে গেছে?' সুদীপ এগিয়ে এসে আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বোঝাল, দাদা কোথায় গেছেন আবার আসবেন। মামণি দৃঢ় স্বরে বললে, না 'বাবা বলে গেছে আর আসবে না।'

হ্যাঁ তিনি আর আসেননি। বহু দিন বহু সন্ধান করেছি। খবরের কাগজে দিয়েছি। থানা পুলিশ লালবাজারে মিসিং স্কোয়াডে জানিয়েছি। তিনি আসেননি।

এখন বুঝতে পারছেন, আমার—আপনাদের পঙ্কজার—সব শেষ হয়ে গেছে। আমার ছদ্মনাম পঙ্কজার মৃত্যু হয়েছে। সেই পাপিষ্ঠা পঙ্কজার অপমৃত্যুর মধ্য দিয়েই আমার লেখিকা জীবনের সমাপ্তি ঘটল। আপনাকে সবিনয়ে এই শেষ অনুরোধ, আপনি দয়া করে আমার অগণিত আগ্রহী পাঠক-পাঠিকাকে জানাবেন পঙ্কজার মৃত্যু হয়েছে। পরিশেষে আপনাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলছি, আপনিই প্রথম আমাকে কবি বলে, সাহিত্যিক বলে, গল্পাকারিণী বলে জগতের কাছে পরিচিত করিয়েছিলেন। একজন সামান্য নারীর প্রতিভার প্রতি আপনার যে দরদ তার তুলনা নাই। আপনার মত দরদী প্রকাশক যদি আরো থাকত তাহ'লে বোধ হয় এই মর্মান্তিক ঘটনা কখনও ঘটত না। নতুন লেখক লেখিকার প্রতি আপনার এই অসামান্য মমত্ববোধের জন্য আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়েও এই কথা অকপটে স্বীকার করছি যে, আমার দুঃখ রাখার আর একটুকু জায়গা রইল না যে, আপনার মত একজন সজ্জনের কাছেও আমি মিথ্যে পরিচয় দিয়ে লেখিকা সেজেছিলাম।

আজ আমার বড় দুঃখ, যদি আমি সত্যি লেখিকা হতে পারতুম—তা'হলে আপনার প্রয়াসও সার্থক হত।

———